তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

প্রথম খণ্ড

ঃ প্রণীত ঃ

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী-আলক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ সতরশীর

তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

প্রথম খণ্ড

প্রণীত

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী-আল্‌ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর।

প্রকাশনায় ❑ রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদ
১৮৯, ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪২৪৮১

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ❑ ম্যাকপ্রিন্ট

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় ❑ আল ঈমান প্রিন্টিং প্রেস
মোক্তারপাড়া নেত্রকোনা

শুভেচ্ছা বিনিময় ❑ ১২০.০০ টাকা

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলীহিল কারীম।
ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি আজমাঈন্।

আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানূহুর অশেষ হাম্‌দ্ এবং আল্লাহ্‌র হাবীব ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে অসংখ্য অগণিত দরূদ ও ছালাম নিবেদন পূর্বক মহীয়ান আল্লাহ্‌র চিরগরীয়ান কিতাব কোরআনুল কারীমের তাফছীর 'তাফ্‌ছীরে রেজভিয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া' নামে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক ছুন্নী ভ্রাতৃবৃন্দের হস্তে তুলিয়া দিলাম। বহু আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টার বিনিময়ে। কেননা, বহুদিন ধরিয়া বাংলা ভাষায় এ ধরনের একখানি বিশদ বিশ্লেষণমূলক, সহজবোধ্য ও নির্ভরযোগ্য তাফছীর গ্রন্থের অভাব অনুভূত হইতেছিল।

রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন কাদীম বা অবিনশ্বর তাঁহার কালামুল্লা শরীফও তদ্রুপ অবিনশ্বর। মানবীয় জ্ঞান দ্বারা উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা দান সম্পূর্ণই অসম্ভব। উপরন্তু, কালামে মজীদ আল্লাহর মাহবুব ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার অনুপম ও শ্রেষ্ঠতম মোজেজাহ্। অবিনশ্বর বাণী পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা ও জ্ঞানবলে একমাত্র তিনিই সম্যক অবগত। সুতরাং তাঁহারই শিক্ষাদানের ফলে ছাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন ও ছল্‌ফে-ছালেহীনগণের পদ্ধতি অনুসরণে উহার ব্যাখ্যা প্রদান একান্তই সংগত ও অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, এ মূলনীতি অনুসরণ ব্যতীত কিংবা উপেক্ষা করতঃ যাহারাই এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে অতল সমুদ্রগর্ভে তাহারাই নিমজ্জিত হইয়াছে অথবা উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পবিত্র ইসলাম হইতে বিচ্যুৎ হইয়াছে। ফলে, 'তাফ্‌ছীর বির রায়' বা মনগড়া ব্যাখ্যার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সৃষ্টি হইয়াছে বাতিল ফেরকা ও বাতিল মতাদর্শের। আকায়েদ বা ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে বিভিন্ন ঘৃণিত ও জঘন্য ভাবধারার। বাতিল মতাদর্শের ধ্বজাধারীরা কোরআনে কারীমের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম তথা ছল্‌ফে-ছালেহীনগণের ভুল ধরিয়াছে। তাদের দৃষ্টিতে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ নিষ্পাপ নহেন, হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম গোনাহ্‌গার। হজরত ঈসা

আলাইহিচ্ছালাম বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। এমন কি, হুজুর ছাইয়েদুল মুরছালীন যিনি সৃষ্টিকূলের মূল নূরে মুজাচ্ছাম আল্লাহ্‌র জাতি নূরের জ্যোতি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার শানেও কটু উক্তি করতে দ্বিধাবোধ করে নাই; বরং ইসলামের আদি ও চিরাচরিত বিশ্বাস যে, রাছুলে কারীম হায়াতুন্নবী, শেষ নবী, সারাবিশ্বে হাজির ও নাজির, গায়েবের খবরদাতা ইত্যাদি আজকাল বাতিলপন্থীদের মধ্যে অস্বীকারের তুমুল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কুখ্যাত কাদিয়ানী ও দেওবন্দী ফেরকার কথাই উল্লেখ করা যায়। ইহারা 'খাতামান্নাবিঈন' পদের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা 'খতমে নবুওয়তকে' অস্বীকার ছাড়াও 'ইম্‌কানে কিজ্‌ব্‌' ও 'ইম্‌কানে নজীর'-এর ন্যায় আজগুবী মাছআলা আবিষ্কার করতঃ যথাক্রমে স্বয়ং খোদা তায়ালার শানে আজমতের মাঝে মিথ্যার অপবাদ দিয়াছে; এবং রাছুলে খোদার সম্ভাবনাময় সমকক্ষতার দাবী তুলিয়াছে। ইহাদের মত ঈমান নাশক ও ইসলাম ধ্বংসকারী আরও কতিপয় বাতিল ফেরকা হইতেছে ওহাবী, চকড়ালুবী, বাহাঈ, নেচারী, পারভেজী, মওদুদী ও ইলিয়াছি তাবলীগী ফেরকা। ইহাদের নেতাব্যক্তিরা কেহ খোদার উপর খোদ্‌কারী করিয়াছে, কেহ কেহ জালনবী, আবার কেহবা নিজেকে নবীর সমতুল্য হইবার দাবী করিয়াছে।

অতএব, বাতিল পন্থীদের দূরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা ও ইহাদের খপ্পর হইতে সরল ও নিরীহ মুসলমানের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতকল্পে রাছুলে খোদার অনুসৃত পথে এবং ছলফে-ছালেহীন তথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ইমামে আহ্‌লে ছুন্নত শায়খ আহমদ রেজা খাঁ বেরিলুভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মছলক অনুযায়ী দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতের আঞ্জাম দিতে আত্মনিয়োগ করিলাম।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের আলেম হইবার জন্যে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন ছাড়াও আরও বহুবিষয়ে পর্যাপ্ত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ একান্ত দরকার। কোরআন নাযিল হইবার দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান লাভ করিয়া কিংবা কোরআনের তরজমা পাঠ করিয়াই মোফাচ্ছের হইবার দাবী অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই প্রসঙ্গে হুজুরে পাকের একটি সতর্কবাণী খুবই স্মরণীয়– 'যে ব্যক্তি ইল্‌ম্‌ ব্যতীত কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে সে যেন জাহান্নামে নিজের

বাসস্থান করিয়া নিল'– (আবু দাউদ শরীফ)।

তাফছীর জগতের উৎকৃষ্ট তাফছীর 'তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফ' 'তাফছীরে ইব্‌নে জারীর' ও 'তাফছীরে কাবীর'। আর তরজমার জগতে শ্রেষ্ঠতম তরজমা আলা হজরত ফাজেলে বেরিলুভী রাদিয়াল্লাহু আনুহুর তরজমা–কান্‌যুল ঈমান। উর্দূ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম তাফছীর তাজদারে আহ্‌লে ছুন্নত আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে-এর 'তাফছীরে খাজায়েনুল এরফান' এবং হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফ্‌তী আহ্‌মদ এয়ার খাঁন বাদায়ুনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে-এর 'তাফছীরে নাঈমীয়া'। উক্ত তাফছীর গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া অত্র 'তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরিয়া' প্রণয়ন করিলাম। কোরআনে কারীমের নির্দ্দেশানুযায়ী 'ছিরাতুল মোস্তাকীম' বা সরল-সঠিক পূর্ণ পথে জিন্দেগী যাপন করিতে এবং আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমাতের অনুসৃত আদর্শে সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে এ গ্রন্থ পথ-নির্দেশ করিবে ইন্‌শা আল্লাহ্ তায়ালা।

পরিশেষে রহমানুর রাহীমের দরবারে ইহাকে এ গোনাহ্‌গারের নাযাতের ওছিলাস্বরূপ কুবুলিয়তের জন্যে এবং পরবর্তী খন্ডসমূহ প্রণয়নের তওফীক কামনাসহ আবেদন জানাইতেছি। আমীন ইয়া রাব্বাল্ আলামীন। বিহুরমাতে ছাইয়্যেদিল্ মুরছালীন।

আহ্‌কার
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আলক্বাদেরী

রেজভীয়া দরবার শরীফ
সতরশীর।

রেজভীয়া প্রকাশনা পরিষদের বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু অনুসাল্লিআলা রাসুলিহিল কারীম।

শোকরিয়া মহান আল্লাহ্‌পাকের দরবারে। অগণিত দরুদ ও সালাম তাঁর উপর যাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, যিনি সৃষ্টির মূল আক্বা ও মাওলা নূরে মোজাচ্ছম, নূরে খোদা ইমামুল আম্বিয়া রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন সাইয়্যেদেনা রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উপর অগনিত দরুদ ও সালাম।

বর্তমান শতসহস্র ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্যোগময় মুহূর্তে মোমেনের উপর বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ মহান মূল্যবান ধর্ম গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে করীমের অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুবই দুর্লভ। সুন্নি মোমিন মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ, আশেকে রাসুল, পীরে কামেল, মুর্শিদে বরহক, মোনাজেরে আজম প্রক্ষাত দার্শনিক হযরাতুল আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নি আল কাদেরী সাহেব হুজুরে কেবলার নির্ভুল অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে সহজ সরল বাংলা ভাষায় লিখিত তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া ১ম খন্ড আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি। রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদের তত্বাবধানে হুজুর কেবলার লিখিত তাফসির প্রকাশিত হলো।

পর্যায়ক্রমে সমগ্র কোরআনে কারীমের তাফসির ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আল্লাহ রাসুল আমাদের এ সাধ যেন পূর্ণ করে। শুধু তাই নয় হুজুর কেবলার লিখিত অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ ও পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে।

স্বল্প সময়ে মহামূল্যবান এ গ্রন্থটি প্রকাশনার এ দুরহ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানোর জন্য যত্ন সহকারে ফ্রুপ রিডিং সম্পন্ন করতে যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি।

এজন্য আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন জনাব কে এম জাহিদ হোসেন এবং মাওলানা রুহুল আমিন রেজভী। তবুও ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর এজন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে তাঁর হাবীব আমাদের আক্বাও মাওলা নূর ময় সত্ত্বা রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচিলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ্ যেন ক্ষমা করেন।

সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট করজোরে অনুরোধ করছি অনিচ্ছাকৃত কোনরূপ ভুলত্রুটি আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো। ইনশাআল্লাহ্।

প্রকাশনা পরিষদে যারা আছেন– তারা হলেন সর্বজনাব আবু সাঈদ ভূঁইয়া সভাপতি, শফিকুর রহমান সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ আবু হানিফ সহ-সম্পাদক, সৈয়দ আবু নাঈম রেজভী কোষাধ্যক্ষকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারক বাদ জ্ঞাপন করছি।

মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশনায় যাঁরা আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন সর্বজনাব আব্দুল কুদ্দুস শরীফ (ঢাকা) মোহাম্মদ ইলিয়াস (ঢাকা) শ্রদ্ধেয়া মা বেগম রাজিয়া বারিক ভূঁইয়া, (মধ্যম তলা) আয়েশা বেগম (ঢাকা) আবুল ফয়েজ (কেমতলী) ছাড়াও অন্যান্য যারা সাহায্য করেছেন তাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মন বাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি আল্লাহ্ যেন আমাদের এ প্রায়াসকে কুবল করেন। আমাদের সার্বিক কল্যাণ এবং তা যেন হয় সকল মুমিন মুসলমানের নাজাতের উচিলা। আমিন। সুম্মা আমিন। বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

৫ফাল্গুন ১৪০৬ বাংলা
১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০০
ধলপুর, ঢাকা।

রেজভী মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া
সম্পাদক
রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদ
ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা

১। ছুরায়ে বাকারার ফাযায়েল
২। ছুরায়ে বাকারার ফায়দাসমূহ
৩। আয়াতে মোতাশাবেহাতের আলোচনা
৪। কোরআন পাকের নামকরণের তাৎপর্য
৫। কোরআন পাকের সত্যতার প্রমাণ
৬। তাক্বওয়ার দরজা, ফাওয়ায়েদ ও প্রকারভেদ
৭। গায়েবের অর্থ, সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
৮। ঈমান আমলের মূল কেন
৯। নামাজের ফাযায়েল ও ভেদতত্ত্ব
১০। পাঞ্জেগানা নামাজের রহস্য
১১। ছুন্নতের গুরুত্ব
১২। জাকাতের রহস্য ও ফায়দাসমূহ
১৩। ইয়াক্বীনের শ্রেণীভেদ
১৪। ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি
১৫। মানুষকে ইনছান বলার তাৎপর্য
১৬। মুনাফিকের অর্থ ও উহার তবকা
১৭। ইউখাদেউনার লক্ষ্য রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম
১৮। অন্তরের রোগসমূহ
১৯। মিথ্যার অনিষ্টতা
২০। হজরত ইব্রাহীম ও হজরত সিদ্দিকে আকবরের হেকমত
২১। ভ্রান্ত সংগঠনের নিদর্শন
২২। তকলীদ না করা ও মুসলমানদিগকে খারাপ বলা মুনাফেকী
২৩। বাদল, বৃষ্টি, কুয়াশা, গর্জন ও বিজলীর হাকীকত
২৪। মাছায়েলে ইম্‌কানে কিজবের আলোচনা
২৫। মাছায়েলে ইম্‌কানে নজীরের বিশদ আলোচনা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম।

ছুরায়ে বাকারার নামকরণ

কোন ছুরার নামকরণ কতিপয় বিষয়বস্তু প্রভৃতির কারণে হইয়া থাকে। কাজেই ছুরায়ে বাকারার নামকরণও উহার একটি বিষয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। বাকারা শব্দের অর্থ গরু। এই সুরায় গরু জহাব করা এবং ইহার দ্বারা এক নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার বর্ণনা রহিয়াছে। এই জন্যে ইহার নাম ছুরায়ে বাকারা রাখা হইয়াছে। যদিও উহাতে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট বিষয় বিদ্যমান ছিল; কিন্তু গো-কোরবাণী সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক কাহিনী কেবল এই ছুরাতেই রহিয়াছে। অন্য ছুরায় নাই। উপরন্তু এই আজব কাহিনীতে হাজার হাজার উপকারিতাও রহিয়াছে। ইহার কিছু বর্ণনা এই স্থানে করা হইবে।

শানে নযুল

ছুরায়ে বাকারার শানে নযুল দুই প্রকার ঃ (১) এজমালী শানে-নযুল ও তাফসীলি শানে-নযুল। তাফসীলি শানে-নযুল ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের সহিত করা হইবে। এজমালী বা সংক্ষিপ্ত শানে-নযুল এই যে, ইসলামের প্রবর্তক নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফে ছিলেন তখন কেবল ভুত-পূজক ও মুশরেকদিগের সহিত মোকাবেলা করিতে হইত। কিন্তু মদীনা শরীফে যখন তশরীফ নিয়া গেলেন তখন মদীনা শরীফ শুধু ইহুদী ও নাছারাদের বাসভূমিরূপে পরিণত ছিল। মদীনা শরীফে তখন ইহুদীদের খুবই প্রভাব ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল তাদের নেতা। যখন ইসলাম রবি মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনার আকাশে আবির্ভুত হইলেন তখন সর্বপ্রথম হজরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর দৌলতখানাকে উজ্জ্বল করিলেন। অতঃপর কোরআনে কারীমের অমিয়বাণীর সুমধুর আওয়াজ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক দ্বীনদারলোক ব্যতীত বাকী সকলে হিংসা ও বিদ্বেষে মাতিয়া উঠিল। যেহেতু, ইহারা পূর্ব হইতে জ্ঞানবান ছিল এবং মদীনার সমগ্র অঞ্চলের লোকজন তাহাদিগকে সম্মান করিত এইহেতু, আরবের অধিকাংশ

জাহেল লোক তাহাদের সহিত মিলিয়া গেল। অপরদিকে, ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায় যাহাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই লাগিয়াই থাকিত; এক্ষণে ইসলামের বিরুদ্ধে তাহারা একত্রে মিশিয়া গেল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই ও তাহার সঙ্গীরা সম্পদ ও সম্মানের মোহ যাহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বাহ্যতঃ ইহারা মুসলমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা আন্তরিকভাবে কাফেরদের দলেই রহিয়া গেল। আর গোপনীয় সূত্রে ইহাঁরা ঐ দুশমনদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। মদীনা শরীফে আসিয়া মুসলমানদিগকে চারিটি ফেরকার মোকাবেলা করিতে হইল। ইহারা যথাক্রমে ঃ (১) ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেম (২) নাছারা সম্প্রদায়ের আলেম (৩) অজ্ঞ মুশরিকদল ও (৪) মুনাফিকসমাজ। উক্ত ফেরকাসমূহের লোকেরা গোপনে গোপনে কষ্ট প্রদান ছাড়াও বহু অনাচার ও অত্যাচারে লিপ্ত থাকিত। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দ্বারা দ্বিধা-সন্দেহের সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকিত। অতঃপর, আল্লাহ্‌পাকের এমন একটি ছুরাহ্ নাযিল করিবার অভিপ্রায় হইল যাহা দ্বারা এই চারিটি ফেরকারই মস্তক অবনত করিতে সহজসাধ্য হইয়া যায়। ইহাদের সন্দেহের ধুম্রজালকে দূরীভূত করা যায়। এই কারণেই মদীনায়ে তাইয়্যেবায় পৌঁছিবামাত্রই নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই ছুরা নাযিল হইতে শুরু হইল। ইহাই ছুরাহ্ বাকারার নাযিল হইবার কারণ।

ছুরায়ে বাকারার ফজিলতসমূহ

ছুরায়ে বাকারার অগণিত ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তম্মধ্যে কিছুমাত্র এখানে বয়ান করা হইতেছে (১) মুসলিম শরীফে হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ আমাদের মধ্যে যে কেহ ছুরায়ে বাকারা ও ছুরায়ে আল্ এমরান জানিত তাহার বড়ই সম্মান হইত। (২) মসনদে ইমাম আহ্‌মদ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কোরআনে কারীমে ছুরায়ে বাকারার স্থান উটের শরীরে কোহাঁর ন্যায়। অর্থাৎ, উটের পীঠের হাড্ডি যেমন উহার শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রুপ ছুরায়ে বাকারার দ্বারা কোরানে কারীমের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। মুসলিম শরীফে হজরত আবু ইমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, অমূল্য,

উজ্জ্বল ও নূরানী ছুরাসমূহ পাঠকরিও অর্থাৎ ছুরায়ে বাকারা ও ছুরাহ্ আল্ এমরান। কেননা, কিয়ামতের দিন এই উভয় ছুরাহ্ পাঠকারীর উপর মেঘের ছায়ার মতন ছায়া থাকিবে। এবং এই ছুরাহ্দ্বয় উহাদের পাঠকারীর জন্যে সুপারিশ করিবে। (৩) তফসীরে আজিজীর মধ্যে আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবার রাত্রিতে ছুরায়ে বাকারা এবং ছুরায়ে আল্ এমরান তেলাওয়াত করিবে সে এত ছওয়াব পাইবে যাহা দ্বারা বাঈদা হইতে আরুবা পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া যাইবে। বাঈদা জমীনের শেষ তবক বা সপ্তম জমীনকে বলে, আর আরুবা সপ্তম আকাশের নাম। অর্থাৎ ছুরাহ্ বাকারা ও আল্ এমরান পাঠকারীর ছওয়াব জমীনের শেষ তবক হইতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভরিয়া যাইবে। (৪) সাইয়্যেদেনা উম্মুদ্দার হইতে বর্ণিত আছে– একব্যক্তি কোরআনে পাক তেলাওয়াত করিতেন। একদা তাহার এক প্রতিবেশীকে খুন করিয়াছিল এবং পরদিন সকালে সেও গ্রেপ্তার হইয়া নিহত হইল। যখন তাহাকে দাফন করা হইল তখন কোরআনে পাকের সমস্ত ছুরাহ্ তাহার কবর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখা গেল। কিন্তু সুরায়ে বাকারা ও আল্ এমরান শুক্রবার পর্যন্ত রহিল। আর যখন শুক্রবার আসিল তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির আজাব বন্ধ হইয়া গেল। (৫) হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১২ বৎসরে এই ছুরাহ্ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমস্ত ভেদ-তত্ত্বসহকারে পাঠ করিয়াছেন। যেদিন খতম করিয়াছেন অর্থাৎ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন সেদিন উট জবাহ্ করিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ আরম্ভ করিবার সময় কিংবা পাঠ সমাপ্ত করিবার সময় শিরনী বন্টন করা এবং আনন্দ- উৎসব করা সুন্নতে সাহাবায়ে কেরাম।

আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য

(৬) কোরআন পাকে সবচেয়ে বড় ছুরাহ্ ইহাই। এই ছুরায় ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু, ৬১২১ শব্দ এবং ২৫৫০০ অক্ষর রহিয়াছে। (৭) কোরআনে কারীমের সবচেয়ে বড় আয়াত অর্থাৎ আয়াতে মাদানীয়া এই ছুরায়ে বাকারাতেই রহিয়াছে।

(৮) হজরত ইবনে আরাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন– ছুরায়ে বাকারায় এক হাজার আদেশ; একহাজার নিষেধ এবং একহাজার সংবাদ রহিয়াছে। অর্থাৎ কোরআনে কারীমের যত আহ্কাম এই ছুরায় রহিয়াছে অন্য কোন সুরায় তত নাই।

ফায়দা ঃ কোরআনে পাকের অপর একটি মুজেজা ইহাও যে, উহার ছুরাহ্ এবং আয়াত ছোট-বড় রহিয়াছে। যাহা দ্বারা আল্লাহ পাক ছোবহানাহু ওয়া তায়ালার অপরিসীম 'কুদ্রতে কামেলার প্রকাশ হয়। যেমন বড় ছুরার মধ্যে অগণিত ও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ছোট হইতে ছোট সুরার মধ্যেও অনুরূপ বিষয় স্থানলাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ ছুরাহ্ ছোট হউক আর বড়ই হউক প্রত্যেকটি কিন্তু কোরআনুল কারীমের মুজেজা। আর এই মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারীম আমাদের আক্বা ও মাওলা মাহবুবে খোদা নূরে মোজাচ্ছম-সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার একটি অনির্বচনীয় মু'জেজা। প্রিয় পাঠক! বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মনযোগসহ অনুধাবন করিবার বিষয় বটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হাতী এবং উটের দেহ খুবই বড় ও অস্বাভাবিক ধরনের মোটা। পক্ষান্তরে, পিপীলিকার দেহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের। কিন্তু হাতী এবং উটের শরীরে যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে, পিপীলিকার ক্ষুদ্রাকৃতির দেহের মধ্যে প্রায় ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই রহিয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ পাক ছোব্হানুহু ওয়া তায়ালার অসীম কুদ্রতে কামেলারই প্রকাশ হয়।

ছুরায়ে বাকারার ফায়দা

ছুরায়ে বাকারার অগণিত ফায়দা রহিয়াছে, যাহার কিছুমাত্র এই স্থানে উল্লেখ হইল। 'তফসীরে আজিজী' এবং 'তফসীরে খাজায়েনুল এরফান' হইতে নকল করা হইল। (১) যে ঘরে ছুরায়ে বাকারা পাঠ করা হইবে, ঐ ঘরে ৩দিন যাবৎ শয়তান প্রবেশ করিতে পারিবে না। (২) যে ব্যক্তি সর্বদা শুইবার সময় ছুরায়ে বাকারার ১০ আয়াত পাঠ করিবে সে কখনো কোরআনে পাক ভুলিবে না। দশ আয়াত এইরূপঃ প্রথম ৪(চারি) আয়াত মোফ্লেহুন পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী; আর দুই আয়াত আয়াতুল কুরসীর পর এবং এই ছুরার শেষ ৩ আয়াত (৩) যে সকল শিশু ছেলে-মেয়েদের গুটি বসন্ত দেখা দেয় তখন আড়াই পোয়া চাউলের ভাত পাক করিয়া উহাতে পরিমাণ মত দধি ও গুড় মিশ্রিতকরতঃ কোন ফকির-মিসকিনকে ডাকিয়া আনিয়া এই বলিয়া খাইতে দিবে– 'তুমি ইহা এইরূপ

সময় নিয়া ধীরে ধীরে খাইতে থাক যেন আমার এই ছুরা পাঠ এবং তোমার খাওয়া একই সময়ে শেষ হয়।' তৎপর, ফকির ঐ শিশুটির সামনে ভাত খাওয়া শুরু করিবে আর অপর ব্যক্তি ছুরায়ে বাকারা পাঠ আরম্ভ করিবে। ধীরে এবং সুন্দর আওয়াজে উত্তমরূপে পাঠ করিতে থাকিবে। এদিকে ছুরা পাঠ ও ফকিরের ভাত খাওয়া একই সঙ্গে শেষ হইবে। অপরদিকে, ইন্‌শাল্লাহ শিশুটিও বসন্ত মুক্ত হইবে। এই বৎসর এই বাড়ীতে আর বসন্ত হইবে না। এই আমল ভোরবেলায় করিতে হয়। ফকির ও ছুরাহ্ পাঠকারী উভয়েই কেবলামুখী হইতে হইবে। (৪) তিব্‌রানী ও বাইহাকী শরীফ হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর তাহার কবরে মাথার দিকে ছুরায়ে বাকারার প্রথম আয়াত মুফ্‌লেহুন পর্যন্ত এবং কবরের পায়ের দিকে সুরায়ে বাকারার শেষ রুকু পাঠ করা উত্তম। আল্লাহ্ চাহেন তো বাকী ফায়দাসমূহ এই ছুরার শেষভাগে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১নং আয়াত শরীফ –

الم ذالك الكتاب لاَ رَيْبَ ج فيه ج هد للمتقين ۰

আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিন

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

১নং আয়াত শরীফের অর্থ ঃ এই সেই কিতাব যাহার মধ্যে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদিগের জন্যে।

আলিফ-লাম-মিম।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সুরায়ে আল্‌হাম্‌দুর সহিত আরম্ভ করা হইয়াছে যার মর্ম এতদূর স্পষ্ট যে ছোট শিশুও বুঝিতে সক্ষম হয় এবং প্রত্যেক মানুষ শ্রবণমাত্র উহার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে, কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, ছুরায়ে বাকারার আরম্ভ হইয়াছে– 'আলিফ-লাম-মিম' দ্বারা। যাহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বড় বড় উলামা ও আওলিয়া পর্যন্ত হয়রান-পেরেশান হইয়া পড়েন। ইহাতে এই বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোরআনুল কারীম কতক অনুসারে খুবই সহজ আর কতিপয় বিষয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বড়ই কঠিন। উহার কতক জাহেরী অর্থ এতই সহজ যে, শ্রবণমাত্রই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, কতিপয় ভেদ-তত্ত্ব ও রহস্যপূর্ণ বিষয় এতই জটিল

যে, উহাদের মর্ম উপলব্ধি করতে বা রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে মানবিক জ্ঞান যথেষ্ট নহে । তাই প্রয়োজন হয় 'নক্বলী জ্ঞানের। অর্থাৎ, কোরআনুল কারীম বুঝিতে হইলে হাদীসে রাসুল প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ায় কতক জিনিস এতই সহজলব্ধ যে, সমস্ত মানুষ বিনা কষ্টে তাহা লাভ করিয়া থাকে। যেমন– বায়ু এবং পানি ইত্যাদি। আর কতক জিনিস পাওয়া বড়ই কঠিন। যেমন– হীরা, মনি-মুক্তা ইত্যাদি। অপরদিকে, কোরআনে কারীম যদি এতই সহজ হইত তবে কেহ কেহ ঠাট্টার ছলে প্রলাপোক্তি করিয়া বসিত 'কোরআন বুঝিবার মত ধীশক্তি আমার অবশ্যই অর্জিত হইয়াছে', অতএব, অনিবার্য কারণেই কোরআনের বাণী কিছু কিছু রহস্যের অন্তরালে আবৃত হইয়া স্বতঃস্ফুর্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেন, এ মহাবাণী শ্রবণমাত্রই যত বড় জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত হউক না কেন অবনত মস্তকে নিজের অপারগতা স্বীকার করতঃ এ উক্তি করিতে বাধ্য হয়– 'সুব্‌হানাকা লা-ইলমালানা' অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র! আমরা জানিনা তোমার ভেদ তুমিই জান'। এইহেতু সুরায়ে বাকারার প্রথম শব্দ বা বাক্য ঐ প্রকারের সন্নিবেশিত হয় যাহা শ্রবণমাত্রই মানুষ তাহার অপারগতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে।

তাফছীর ঃ একথা স্বীকার্য সত্য যে, আলিফ-লাম-মীম–এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য আল্লাহ্ পাক সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁহার মাহ্‌বুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহই জানে না। আমাদের পক্ষে অবশ্য করণীয় যে, এ সত্যের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং একথা স্বীকার করা যে, ইহার অর্থ আল্লাহ্ যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহা অবগত আছেন। তফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়– আলিফ লাম মীম ঐ কালাম সমূহের মধ্য হইতে যাহার মর্ম ওহী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল আমীনও অবগত নহে। যেমন– ডাকঘরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ হইতে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় তারবার্তা বা টেলিগ্রাম এই ধরনের শব্দ দ্বারা আসে যাহা স্বয়ং পোষ্ট মাষ্টারও বুঝেনা এবং ডাকপিয়নও বুঝেনা। কিন্তু যাহার নিকট ঐ টেলিগ্রাম আসে কেবল ঐ ব্যক্তিই উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার মাহবুব আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই অবগত করাইয়া এবং শিক্ষাদান করিয়া দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। নতুবা হুজুর আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এই মুতাশাবেহাতের অর্থ কখনো জানিতেন না; এবং কোরআন নাযিল অর্থহীন হইয়া যাইত স্বয়ং আল্লাহ্ পাক

নামাজ ও যাকাত প্রভৃতির সমস্ত বন্দেগীর হুকুম দিয়াছেন; কিন্তু কোন বন্দেগীর বিস্তারিত বর্ণনা করেন নাই। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, কি পরিমাণ মালের কতদূর যাকাত এবং কখন দিবে ও কাহাকে দিবে। বরং কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই ছাহাবায়ে কেরামকে কোঁরআনে কারীমের প্রতিটি আদেশ বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 'আলিফ-লাম-মীম' এই কলেমাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এলেম এবং আলেমরূপে পয়দা হওয়ার পরিচয় বহন করে। তদুপরি, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, যখন 'কাফ হা ইয়া আইন ছোয়াদ' হয় তখন জিবরাঈল আলাইহিচ্ছালাম আরজ করেন– 'কাফ,' তৎক্ষণাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আলেম্‌তু' অর্থাৎ 'আমি অবগত হইয়াছি'। তারপর জিবরাঈল আরজ করেন- 'হ্যা'; হুজুরে পাক ইরশাদ করেন– 'আমি জানিয়াছি' অতঃপর আরজ হইল– 'ইয়া'; হুজুরে পাক ইরশাদ করেন– 'আমি জানিয়াছি'। পুনরায় জিবরাঈল আমীন আরজ করেন– 'ছোয়াদ'; তৎক্ষণাৎ হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি জানিলাম।

অবশেষে জিবরাঈল আমীন আরজ করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি অবগত হইলেন বা জানিলেন; আমি তো কিছুই জানিতে পারিলাম না। কবির ভাষায় এ বিষয়টি কি সুন্দরই না ব্যক্ত হইয়াছে।

"মিয়ানে তালেব ও মাহ্‌বুবে রমজিছ্‌ত্‌
কেরামান কাতেবীন রাহাম খবর নিস্ত"

অর্থাৎ আশেক ও মাশুকের মধ্যে যে রহস্য নিহিত থাকে কেরামান কাতেবীন ফেরেশতা অবগত নহে। কিন্তু কতক উলামা তাবিলের অবস্থায় অর্থাৎ বিশদ বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ সমস্ত বর্ণ ও অক্ষরসমূহের মর্ম উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে তবে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে উহার প্রকৃত মর্মার্থ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। নিম্নে উক্ত তাবিলের কিছু নমুনা দেওয়া হইল– (১) 'আলিফ-লাম-মীম' কোরআনে পাকের নাম (২) আলিফ-লাম-মীম ছুরায়ে বাকারার নাম এই ধরনের বর্ণ বা অক্ষরমালা প্রথমে থাকিলে তাহা প্রধাণতঃ ছুরার নাম হিসাবেই পরিগণিত হয়। যেমন– হা-মীম অথবা আলিফ-লাম-রা ইত্যাদি। (৩) প্রতিটি বর্ণ আল্লাহ্ পাকের কতিপয় নামের প্রথম বর্ণ। অর্থাৎ আলিফ দ্বারা বুঝায় 'আল্লাহ্' লামের দ্বারা বুঝায় লতীফ আর মীমের দ্বারা 'মুয়িন' অথবা 'মজিদ' অথবা 'মান্নান'। (৪) 'আলিফে' বুঝায় আনা, লামে বুঝায় আল্লাহ্ এবং মীম দ্বারা বুঝায় اعلم 'আ'লামু অর্থাৎ 'আমি জানি'। (৫) এই বর্ণ

বা বর্ণমালা আল্লাহ্ এবং অন্য জাতের নামের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরও ধরিয়া নেওয়া যায়। যেমন আলিফ দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্ লাম দ্বারা জিবরাঈল মীম দ্বারা বুঝায় মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এক্ষণে, উদ্দেশ্য হইল ঃ যিনি কোরআনে কারীম নাযিল করিয়াছেন যিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ আলিফ লাম মীমের তাৎপর্য এই যে, এই কোরআনে কারীম আল্লাহ্ পাক নাযিল করিয়াছেন জিবরাঈল আমীন বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম গ্রহণ করিয়াছেন।

সারকথা এই যে, কোরআনে কারীমও এই সকল অক্ষর দ্বারাই গঠিত যাহা দ্বারা মানুষ তাহাদের কথা ও ভাষা রচনা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, কোরআনে কারীমের ভাষা এতদূর উচ্চাঙ্গের ও মহিমাপূর্ণ হওয়ায় 'কালামে ইলাহী বলিয়া উহা স্বয়ং প্রমাণিত।

কতিপয় প্রশ্নের উত্তর

১নং প্রশ্ন ঃ কোরআনে পাক তো আমলের উদ্দেশ্যেই নাযিল হইয়াছে, যদি তাহাই হয় এবং উহার মর্মার্থ এতই গোপনীয় হয় তবে উহা কোরআনে রাখা হইল কেন? যদি ভেদ ও তত্ত্বের কথাই হইত তবে ভেদ ও তত্ত্বের মধ্যেই রাখা যাইত।

উত্তর ঃ এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ও অমূলক। কোরআন শুধু আমলের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, উহার কতিপয় আয়াত কেবল জানার জন্যে নাযিল হইয়াছে। যথা– আল্লাহ্ পাকের জাত ও ছিফাতের প্রকাশক আয়াতসমূহ। কতক কেবল 'মানিবার জন্যে' অর্থাৎ শুধু এতটুকু মানিয়া লও যে ইহা আল্লাহর কালাম। কতক আয়াত ভয় প্রদর্শনের জন্যে অর্থাৎ আজাবের আয়াত। আর কতিপয় আয়াত সুসংবাদ আশা ভরসার প্রকাশমূলক। যথা– রহমতের আয়াতসমূহ। কাজেই ঐ 'মুতাশাবেহাত' কেবল মানিবার জন্যেই। এক্ষণে, তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, ঐ রহস্যপূর্ণ বিষয় কোরআনে কারীমে রাখার কারণই বা কী? ইহার উত্তর এই যে, উহাতে কয়েকটি হেকমত অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ঃ (১) উহাদের প্রতি ঈমান বা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, (২) উহাদের তেলাওয়াত করা। কেননা, কোরআনের একটি বর্ণ বা অক্ষর তেলওয়াতের ফলে দশটি করিয়া নেকি লাভ হয়। যদিও আলিফ লাম মীম এর স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় না তবু উহা তেলাওয়াতে ত্রিশটি নেকি পাওয়া যায় (৩) ইহাতে হুজুর সাহেবে কোরআন আলাইহিচ্ছালামের অনুপম শানের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র মহাজ্ঞানময় বাণী কোরআনুল কারীম ফেরেশতাগণও বুঝিতে সক্ষম নহে, (৪) আলেম তথা জ্ঞানীগণ তাহাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখিবে এবং তাহাদের অন্তকরণ হইতে অহংকার দূরীভূত হইবে। এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নিজ

নিজ দুর্বলতা স্বীকার করিবে। কেননা, আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয় জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন উক্ত অক্ষর বা শব্দসমূহের মর্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হইবে, তখন একথাই স্বীকার করিবে যে, 'আল্লাহ্‌র কালাম' আল্লাহ্‌ই জানেন (৫) উক্ত বিষয়াদি মানবীয় জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে অক্ষম হওয়ার কারণে কোরআনে পাক কালামে ইলাহী বলিয়া সহজে প্রমাণিত হয়। কেননা, মানবীয় জ্ঞান যেখানেই অপারগ হয়, সেখানেই বলিতে বাধ্য হয় যে, 'খোদার কালাম খোদাতায়ালাই ভাল অবগত আছেন।

২নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌পাক কোরআনে ফরমাইয়াছেন- 'ওয়ালাক্বাদ ইয়াচ্ছারনাল্ কোরআনা' অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক বলেন- আমি কোরআনকে সহজ করিয়া নাযিল করিয়াছি। কিন্তু তফছীরকার বা ব্যাখ্যাকারী বলেন যে, কোরআনের কতক অংশ খুবই কঠিন তবে ইহা কি কোরআনের খেলাফ উক্তি হয় নাই?

উত্তর ঃ প্রশ্নকারী সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করে নাই। সম্পূর্ণ আয়াত এই- ওয়ালাক্বাদ ইয়াচ্ছারনাল কোরআনা লিজজিক্‌রে ফাহাল মিন মুজাক্‌কির। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌পাক বলেন- আমি কোরআন মজীদকে মুখস্থ করিবার জন্যে অথবা উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করিয়া নাযিল করিয়াছি। অর্থাৎ, কোন আসমানী কিতাবকে কোন উম্মত মুখস্থ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু কোরআনে পাকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাকে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে-মেয়েরাও মুখস্থ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই, কোরআন মজীদ মুখস্থ করিবার জন্য, নসিহত গ্রহণের জন্য সহজ বটে, কিন্তু বুঝিবার জন্য সহজ নহে। তদ্রুপ, কোরআন শরীফ দ্বারা আল্লাহপাককে চেনা সহজ; সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার পরিচয় লাভ সহজ। কিন্তু কোরআন মজীদের প্রত্যেক আয়াতে কারীমার অন্তর্নিহিত ভেদ-তত্ত্ব বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। হে পাঠক! তুমি কি কোরআনে পাকে ঐ আয়াত শরীফ পাঠ কর নাই যাহাতে আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন?

'অমা ইয়ালামু তাবিলাহু ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ মুতাশাবেহাত' আয়াতসমূহের মর্ম ও তাৎপর্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানেনা। এক্ষণে, আমার এই উত্তর দ্বারা ওহাবী ও চকড়ালুভীদের শত শত প্রশ্ন ও প্রতিবাদের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। কেননা, তাহাদের বক্তব্য এই যে, কোরআনে কারীম 'নূর', কোরআনে কারীম দলীল্য কোরআনে কারীম 'হেদায়াত' কোরআনে কারীম 'শেফা' এবং কোরআনে করীম 'তাবলীগের' মাধ্যম ও কোরআন মজীদ 'কিতাবুম্ মুবীন' বা 'স্পষ্ট কিতাব'। কিন্তু কোরআনের অতিপয় আয়াত যদি একেবারে গোপনীয় বা কঠিন হইয়া থাকে তবে উহা না 'নূর' বলিয়া প্রমাণিত হয়, না 'হেদায়াত'রূপে পরিগণিত, না 'দলীল' রূপে স্বীকার করা যায়। বাতিল পন্থীদের এই সমস্ত আপত্তিকর উক্তির জওয়াব আমার পূর্ব উল্লিখিত জওয়াবের মধ্যেই রহিয়াছে। উপরোক্ত জওয়াবে ইহাও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, কোরআনে কারীমের

সমস্ত আয়াত আল্লাহ্পাককে চিনিবার দলীল বা নিদর্শন, ঈমান প্রদানকারী এবং উহা গ্রহণপূর্বক আগমনকারীর অনুগ্রহের জন্যে 'নূর' ইত্যাদি হইতেছে। এই জন্যে নহে যে, প্রত্যেক আয়াতের ভেদ ও তত্ত্ব বুঝিবার জন্যে সহজ।

৩নং প্রশ্ন ঃ কোরআনের 'মুতাশাবেহাতের' এলেম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকেও দেওয়া হয় নাই। কেবল আল্লাহ্ পাকই উহা জানেন। কোরআনে আছে 'লাইয়ালামু তাবিলাহু ইল্লাল্লাহ'।

উত্তর ঃ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যদি হুজুর সাহেবে কোরআন আলাইহিস্সালাতু ওয়াসাল্লামকে আয়াতে মুতাশাবেহাতের এলেম না দেওয়া যাইত, তবে উহার নাযিল হওয়াই অর্থহীন হইয়া যাইত। আল্লাহ্পাক রাব্বুল-এজ্জাত ইরশাদ করেন-

'আর্রাহ্মানু আল্লামাল কোরআন' অর্থাৎ আল্লাহ্পাক হুজুরকে সমগ্র কোরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সমগ্র কোরআন বলিতে আয়াতে মুতাশাবেহাতও শামিল রহিয়াছে। যদি ঐ 'মুতাশাবেহাতের' শিক্ষা না দেওয়া হইত, তবে সমগ্র কোরআনের পরিপূর্ণ শিক্ষাদানও হইত না। এবং প্রতিবাদকারীদের পেশকৃত আয়াত ইহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইত। বস্তুতঃ তাহা নহে। বাতীলপন্থীদের পেশকৃত উক্ত আয়াত শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্পাকের শিক্ষাদান ব্যতীত 'মুতাশাবেহাতের' অর্থ কেহই জানিতে পারেনা। এইস্থানে শুধু 'এলমে ছরফ্' 'এলমে নহু' বা ব্যাকরণগত ভাষা জ্ঞানই যথেষ্ট নহে।

ذلك الكتاب

'জালীকাল কিতাবু'

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ জালিকাল কিতাবু- ইহার সম্পর্ক প্রথমোক্ত বিষয়ের সহিত রহিয়াছে। তাহা এই যে, যদি আলিফ লাম মীম কোরআনে পাকের ছুরার নাম হইয়া থাকে তবে- আলিফ-লাম-মীম হইবে 'মবতেদা' বা উদ্দেশ্য এবং উহার 'খবর' বা বিধেয় হইবে 'জালীকাল কিতাবু'। কাজেই অর্থ হইবে- আলীফ-লাম-মীম ইহা এক কিতাব। আর যদি আলীফ-লাম-মীম মুতাশাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে উহা পৃথক জুমলা বা বাক্য হইবে। তাহা এইরূপ যে, 'জালীকা' 'মুবতেদা' এবং 'কিতাবু' হইবে 'খবর'। তখন অর্থ দাঁড়াইবে- এই কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব।

তফ্ছীর ঃ 'জালীকা' ইছ্মে ইশারা, যাহা দ্বারা আহলে কিতাব বুঝাইতে পারে। যদি আহলে কিতাব উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে অর্থ হইবে যে, ঐ জিনিস যাহার ওয়াদা তৌরিত ও ইঞ্জিল কিতাবে করা হইয়াছিল আখরী জামানায় একটি কিতাব নাযিল হইবে। হে ইহুদী ও নাছারাগণ! ইহা ঐ কিতাব যাহা অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের নবীগণ এবং তোমাদের কিতাবগুলিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ

করিয়াছে। যদি এই কিতাব অবতীর্ণ না হইত তবে তোমাদের কিতাবসমূহের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইত। এবং এই কিতাবকে অস্বীকার প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের নবীগণকে এবং তোমাদের কিতাবসমূহকে অস্বীকার করারই নামান্তর। পক্ষান্তরে, যদি মুসলমানদিগের প্রতি ইশারা হইয়া থাকে তবে জালীকা দ্বারা হয়ত ঐ দিকে ইশারা হইতেছে যাহা ছুরায়ে বাকারার পূর্বে নাযিল হইয়াছিল; অথবা যাহা ভবিষ্যতে নাযিল হইবার ছিল। অথবা ঐ দিকেও ইশারা হইতে পারে যাহা 'লওহে মাহ্ফুজে' সুরক্ষিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং পূর্বেই খবর এবং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতদিগকে উহার খবর দিয়াছিলেন। তাহা হইলে এক্ষণে অর্থ দাঁড়াইবে– ঐ ছুরাহ্ যাহা উহার পূর্বে নাযিল হইয়াছিল কিংবা যাহা লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই এই কিতাব। আবার ইহাও হইতে পারে যে, 'জালীকাল কিতাবু লা-রাইবা ফি' হুজুর সারোয়ারে কায়েনাতের প্রতি সম্বোধন। তাই, 'জালীকা-র' ইশারা 'লওহে মাহ্ফুজের' দিকে। অর্থাৎ হে মা'হবুব! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম! ইহা ঐ 'লওহে মাহ্ফুজের' কিতাব যাহা আপনি স্বচক্ষে স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন।

ذلك الكتاب 'জালিকাল্ কিতাব' 'মুবতেদা' এবং 'লা-রাইবা ফি' উহার 'খবর'। এমতাবস্থায় ইহার অর্থ হইবে ইহা ঐ কিতাব যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। 'আল্ কিতাব' 'কুতুব' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং ইহার কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে। যথা– (১) 'জমা' বা একত্রিভূত হওয়া। এইহেতু, 'লশ্করকে' 'কুতুবিয়া' বলা হয়; কেননা উহা বহু মানুষ একত্রিভূত হয়। (২) 'লাজেম' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক। যেমন- কোরআনে আছে–

كتب عليكم الصيام 'কুতিবা আলাইকুমুছ্ ছিয়ামু'– অর্থাৎ, 'তোমাদের প্রতি রোজাকে অত্যাবশ্যক করা হইল।' (৩) 'দলীল' এবং 'হুজ্জাত' বা নিদর্শন প্রমাণ। যেমন– 'ফাতুবিকিতাবিকুম'– তোমাদের দলীল প্রমাণ নিয়া হাজির হও। (৪) ওয়াদা অথবা সময়। যেমন– 'ওয়ালাহা কিতাবুম্ মা'লুমুন'। (৫) গোলামকে সম্বোধন করা অর্থাৎ গোলামকে একথা বলা যে, তুমি এই পরিমাণ অর্থ দিতে পারিলে তুমি আজাদ হইবে। যেমন– 'ওয়াল্লাজিনা ইয়াব্তাগুনাল্ কিতাব'। (৬) লেখা বা লিপিবদ্ধ করা অথবা লিখিত বিষয়। এইস্থানে কিতাবের হয়ত প্রথমোক্ত অর্থ হইবে অথবা শেষোক্ত অর্থ হইবে। যদি প্রথমোক্ত অর্থ বুঝায় তবে আয়াতের অর্থ হইবে- ইহা জমাকৃত বিষয়বস্তুর সমষ্টি। কেননা কোরানে কারীমে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমষ্টিগতভাবে জমাকৃত রহিয়াছে। এইহেতু, কোরআনে কারীম মহাজ্ঞানময় পরিপূর্ণ কিতাব। বলাবাহুল্য, সমস্ত এলেম বা জ্ঞান-বিজ্ঞান কোরআনে কারীমে রহিয়াছে। রাব্বুল ইজ্জাত ঘোষণা করেন–

تفصيل الكتاب

'তাফছিলুল কিতাব'। অন্যত্র ফরমান– و لاَ رَطْبٌ وَ لاَ يَابِسٍ

ওয়ালা রাতাবা ওয়ালা ইয়াবাছা------ এবং সমস্ত কোরআনে কারীম হুজুর সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এলেমের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন– 'আর্‌রাহমানু আল্লামাল্ কোর্‌আন। এক্ষণে, যে কেহ হুজুর পাকের এলেমকে অস্বীকার করে সে হয়ত কোরআনে সমস্ত এলেম রহিয়াছে বলিয়া মানেনা অথবা হুজুর পাককে সমস্ত কোরআনের আলেম বলিয়া মানে না। প্রথমাবস্থায়, আয়াতের বিপরীত দ্বিতীয় কথা। আর যদি শেষোক্ত অর্থ বুঝায় তবে মর্মার্থ এই হইবে যে, ইহা লিখিত জিনিস বা লেখায় পরিপূর্ণ কিতাব। ইহা ব্যতীত সমস্তই 'নাকেছ' বা অসম্পূর্ণ। এইহেতু যে, সর্বপ্রথম লওহে মাহফুজে এই কিতাব লিখিত হইয়াছিল। তারপর প্রথম আকাশে, তারপর মুমেন মুসলমানদিগের সিনা বা অন্তঃকরণে; এবং হাড্ডি ও পাথর ইত্যাদির উপরে। অতঃপর এই কিতাব কাগজে লিপিবদ্ধ হয়, মুদ্রিত হয়। কাগজে উহা এতদূর লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত হয় এবং উহা এতদূর প্রসারলাভ করে যে, সেই তুলনায় দ্বিতীয় কোন কিতাব দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করে নাই, করিতে পারেও না। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ স্বল্প জ্ঞান ও সীমিত শক্তি দ্বারা যে কিতাব রচনা করে তাহা বড় জোর ২/৪ বার হইতে ১০/২০ বার ছাপা হইবার পর একসময় তাহা শেষ হইয়া যায়। তৌরিত ইঞ্জিল প্রভৃতিও বহুবার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবং বর্তমানে তাহা আর অবশিষ্ট নাই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, কোরআনে কারীম বর্তমান যুগেও দুনিয়াজোড়া সমস্ত প্রেসগুলিকে প্রায় দখল করিয়া রহিয়াছে। যেহেতু, কেবল লাহোর হইতে প্রতি বৎসর ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ কোরআনুল কারীমের কপি ছাপা হইয়া বাহির হয়। এক্ষণে, আমার জানা নাই যে, হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ছাপাখানায় প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ছাপা হইতে পারে কিংবা ছাপা হইতেছে। অতঃপর, হিন্দুস্থান ব্যতীত বিশ্বের অপরাপর দেশসমূহের ছাপাখানা হইতে বিশেষতঃ মিসর, ইস্তাম্বুল, বৈরুত, ইরাক ও হেজাজ প্রভৃতি হইতে কি পরিমাণ কপি ছাপা হইয়া প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে তার পরিমাণ নির্ণয় করার সাধ্য কাহারও আছে কি? অতএব একথা অনস্বীকার্য যে, লেখা ও ছাপা অনুসারে কোরআনে কারীম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ কিতাব। তফসীরে 'রুহুল বয়ান' শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রহিয়াছে 'তৌরিত শরীফে' এক হাজার সুরা ছিল; এবং প্রত্যেক ছুরায় এক হাজার করিয়া আয়াত ছিল। হজরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম আরজ করিলেন "হে আল্লাহ্! এই কিতাব কে পড়িতে পারিবে এবং কে-ইবা ইহা মুখস্থ করিবে?'' আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন– ইহার চাইতেও অধিক উচ্চ শানবান ও মর্যাদাশীল এক কিতাব আমি আখেরী যামানার নবী আলাহিস্‌সালাতু ওয়া তাসলিমার উপর নাযিল করিব। তাঁহার উম্মতের কঁচি ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে সক্ষম হইবে। রুহুল বয়ান শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, এই কিতাবের পূর্বে আসমানী কিতাব সর্বমোট ১০৩ (একশত তিন) খানা নাযিল হইয়াছিল। হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের উপর ১০ (দশ) খানা, হজরত শীস্

আলাইহিচ্ছালামের উপর ৫০ (পঞ্চাশ) খানা এবং ২০ (বিশ) খানা 'সহীফা' হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের উপর নাযিল হয়। আবার 'তৌরিত' কিতাব হজরত মুসা আলাইহিস্সালামের উপর 'জবুর' হরজত দাউদ আলাইহিস্সালামের উপর এবং 'ইঞ্জিল' হজরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উপর অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত কিতাবের সমস্ত বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোরআনুল কারীমে জমা রহিয়াছে। কাজেই এই কিতাব ঐ সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহ অর্থাৎ ১০৩ (একশত তিন) কিতাবের জামে বা সমষ্টি মাত্র। এইহেতু, ইরশাদ হইয়াছে ذلك الكتاب জালীকাল কিতাবু।

কোরআনে পাকের নাম

'তফসীরে কবীর' এবং তাফছীরে আজিজীর মধ্যে আছে- কোরআনে পাকের ৩২ টি নাম যাহা কোরআনে পাকেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা-(১) কিতাব, (২) কোরআন, (৩) ফোরকান, (৪) জিকির তাজকেরা, (৫) তানযিল, (৬) আল্হাদিস, (৭) মাওয়িজাহ্, (৮) হুকুম, হেকমত, হাকিম, মাহ্কুম (৯) শেফা, (১০) হুদা, (১১) হাব্লু, (১২) সিরাতে মুস্তাকীম (১৩) রহমত, (১৪) রুহ্, (১৫) ক্বেছাছ, (১৬) বয়ান, তিব্য়িয়ান্ (১৭) বাছাইর (১৮) ফছল, (১৯) নজ্জুম, (২০) মাছানী, (২১) নিয়মাত, (২২) বুরহান্, (২৩) বাশীর নাজির, (২৪) ক্বাইয়ুম, (২৫) মুহাইমিন, (২৬) হাদী, (২৭) নূর, (২৮) হক্ব, (২৯) আজিজ, (৩০) কারীম, (৩১) আজীম এবং (৩২) মুবারক। এই সকল নাম কোরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় উল্লেখ রহিয়াছে।

কোরআনে পাকের নাম সমূহের কারণ

(১) 'কোরআন' শব্দটি হয়ত 'ক্বারউন' হইতে কিংবা 'কেরাআতুন্' হইতে অথবা 'ক্বারনুন' হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কারনুন্ অর্থ জমা হওয়া। এক্ষণে, ক্বোরআনকে ক্বোরআন্ বলিয়া এইজন্যে নামকরণ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রথম হইতে সর্বশেষ পর্যন্ত সমস্ত এলেমের সমষ্টি এই কিতাব। এমন কোন বিষয় নাই যাহার এলেম কোর্আনে নাই। সর্বপ্রকার এলেম বা জ্ঞান উহাতে রহিয়াছে বলিয়াই উহার নাম কোরআন্ রাখা হইয়াছে।

(২) 'ফোরকান' শব্দটি 'ফারকুন' হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ পার্থক্য নির্ণয়কারী 'কোর্আনকে' 'ফোর্ক্বান' এই জন্যে বলা হয় যে, উহা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা এবং মুমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া দেয়। এ বিষয়ে এ কিতাবের মোকাদ্দমায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হইয়াছে। (৩) কিতাব অর্থ জমা হওয়া ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। (৪) জিকির ও তাজকেরার অর্থ

স্মরণ করাইয়া দেওয়া। যেহেতু, এই কোরআনে কারীম আল্লাহ্ তায়ালা এবং তদীয় নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করাইয়া দেয়; এবং আরও স্মরণ করাইয়া দেয় মীছাক-দিবসের অংগীকার। সুতরাং, উহাকে জিকির বা তাজকেরা বলিয়া অভিহিত করা যথার্থই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। (৫) 'তান্‌জিল' অর্থ অবতীর্ণ কিতাব; যেহেতু কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ; কাজেই উহাকে তানজিল বলা হয়। (৬) 'হাদিস'-এর আভিধানিক অর্থ নতুন জিনিস অথবা কালাম বা বাক্য অথবা কথা। যেহেতু তৌরিত ও ইঞ্জিলের মোকাবেলায় কোরআনে পাক সর্বশেষ অবতীর্ণ; কাজেই, দুনিয়ার বুকে উহা এক নববার্তা পাঠের অবস্থায় নাজিল হইয়াছে, লেখার অবস্থায় নহে। অতএব, উহা কথিত কথামালাও বটে। (৭) 'মাওয়ায়িজাহ্' অর্থ নসিহত; এবং কিতাব সকলেরই জন্যে নসিহত বিধায় কোরআনে পাকের নাম 'মাওয়ায়েজাহ্'। (৮) হেকমত, হুকুম ও মাহকুম এইগুলি হুকুম শব্দের রূপান্তর বিশেষ। ইহাদের অর্থ যথাক্রমে, মজবুত করা, লাজেম করা এবং বারণ রাখা। যেহেতু, কোরআন মজীদ মজবুত কিতাব, সেহেতু উহাকে কেহ তাহ্‌রিফ্ বা পরিবর্তন করিতে পারেনা। কোরআনে পাক বিশ্বমানবের জন্যে লাজেম বা অপরিহার্য কিতাব; সুতরাং উহা কখনো 'মন্‌ছুখ' বা স্থগিত হইবার নহে। এবং মন্দকাজ তথা মন্দকথা হইতে কোরআনে কারীম মানুষকে বিরত রাখে। এইহেতু উহাকে উক্ত নামকরণ করা হইয়াছে। (৯) কোরআন শরীফকে 'শেফা' এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, উহা জাহেরী-বাতেনী সর্ব প্রকার রোগ ব্যাধির নিরাময় করিয়া থাকে। (১০) 'হুদা' বা হাদী এইজন্যে উহাকে বলা হয় যে, কোরআনে কারীম মানুষকে হেদায়াত বা সত্যপথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। (১১) 'সিরাতে মোস্তাকীম' এইজন্য বলা হয় ইহার উপর আমলকারী 'মঞ্জিলে মকসুদে' অর্থাৎ 'পরম গন্তব্যস্থলে' পৌঁছিতে সক্ষম হয়। (১২) হাব্‌লু অর্থ রশি। উহার দ্বারা তিনটি কার্য সমাধা হয়। যথা– রশি দ্বারা কতক পৃথক পৃথক জিনিসকে বাঁধা যায়। রশি ধরিয়া নীচ হইতে উপরে উঠিতে পারা যায়; এবং রশি দ্বারা নৌকা কিনারে বান্ধিয়া রাখা যায়। যেহেতু, কোরআনে পাক ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় মানুষকে একই রশিতে মজবুতভাবে ধারণ করাইয়া একজাতি একপ্রাণ করিয়া গড়িয়া তোলে এবং কুফুরী ও পাপরাশির অতল সাগরে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে উহা মানুষকে উদ্ধার করে; অতঃপর কোরআনে পাককে মজবুতভাবে ধারণ করিয়া ধূলীর ধরণী হইতে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; আরও সক্ষম হয় স্বয়ং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে। (১৩) 'রহমত' এইজন্যে বলা হইয়াছে যে, উহা এলেম বা জ্ঞান, যাহা অজ্ঞতা-অন্ধতা ও গোমরাহীর কবল হইতে মানুষকে মুক্ত করে; অতএব, কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ্‌র রহমত। (১৪) 'রুহ' হজরত জিবরাঈল আলাইহিচ্ছালামের নাম এবং আত্মাকেও 'রুহ্' বলা হয়। যেহেতু, কোরআনে পাক জিবরাঈলের মারফত অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং ইহা আত্মা বা জানের জিন্দেগী তথা জীবন ব্যবস্থা সেহেতু, উহার 'রুহ' নামকরণ যথার্থই

সার্থক হইয়াছে। অনুরূপভাবে, রুহ দ্বারা কতিপয় কাজ সম্পন্ন হয়। যথা– দেহের অস্তিত্ব বজায় রাখা কেননা আত্মা বা রুহবিহীন দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; শরীরের হেফাজত করা, কেননা, আত্মাবিহীন শরীর পশু-পাখির আহারে পরিণত হয়। দেহের জন্যে রুহের প্রয়োজন এইজন্যে যে, শরীরের প্রতিটি হরকত বা অঙ্গ সঞ্চালন রুহের কারণেই সংঘটিত হইয়া থকে। কোরআনুল কারীম মুসলিম জাতির অস্তিত্বের একমাত্র উপায়। ইহা মুসলমানদিগকে শয়তান ও তার অনুচর এবং কুফ্ফারদের কবল হইতে নিস্তারলাভ করিতে প্রেরণা জোগায়। আর মুসলমানবৃন্দ যেন তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ চালচলন ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি কোরআনের আলোকে সম্পাদন করিতে পারে সেই কারণেও কোরআন মজীদকে 'রুহ' বলা হইয়াছে। (১৫) কেছাছ বা কিচ্ছার দুইটি অর্থ (১) হেকায়াত বা এবং (২) কাহারও পিছু অনুসরণ করিয়া চলা। যেহেতু, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাহাদিগের যমানার বিভিন্ন সম্প্রাদায়ের কিস্সা ও কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কোরআনে পাক মানব জাতির ইমাম বা পথ প্রদর্শক যেন সমস্ত মানুষ উহার পিছু অনুসরণ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে; সেইহেতু, উহার এ নামকরণ সার্থক হইয়াছে। (১৬) বয়ান, তিব্ইয়ান ও মুবীন এইগুলির অর্থ জাহির বা প্রকাশকারী। কোরআনে পাক যেহেতু শরীয়তের সমস্ত আহ্কাম বা আদেশ-নিষেধসমূহের প্রকাশকারী এবং সমস্ত গায়েবী এলেম বা অদৃশ্য জ্ঞানকে হুজুরপোরনূর মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিয়াছে একারণেই উহার এ নাম। (১৭) বাছায়ের শব্দ বছিরাতের বহুবচন। 'বছিরত' বলা হয় দ্বীলের আলোকে যেমন 'বাছারাত' বলা হয় চোখের 'নূর' অর্থাৎ জ্যোতিকে। যেহেতু, এই কিতাবের দ্বারা দ্বীলের মধ্যে অর্থাৎ মানবের অন্তঃকরণে শত শত নূর বা আলোকধারা পয়দা হইয়া থাকে। এইজন্যে কোরআন মজীদকে বাছায়েব বলা হয়। (১৮) 'ফছল' অর্থ মীমাংসাকারী অথবা পৃথককারী। যেহেতু, কোরআন মজীদ পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা বা মীমাংসা করে, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে মীমাংসা করে এই জন্যে উহাকে ফছল বলা হয়। (১৯) নজজুম্ শব্দ নাজমুন্ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ নক্ষত্র বা তারকাও হয় আবার হিস্সা বা অংশও হয়। যেহেতু, কোরআনে পাকের আয়াত নক্ষত্রের ন্যায় মানুষকে হেদায়াত বা পর্থ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং উহা পৃথক পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে; এইহেতু উহাকে 'নজজুম' বলা হয়। (২০) মাছানী শব্দ 'মাছান' এর বহুবচন। ইহার অর্থ বারবার। যেহেতু, কোরআনে পাকে আহ্কাম এবং কিস্সাসমূহ বার বার আসিয়াছে এবং কোরআনে পাক নিজেও বার বার অবতীর্ণ হইয়াছে এইহেতু, উহাকে মাছানী বলা হয়। (২১) নিয়ামতের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট (২২) 'বুরহান' অর্থ দলীল বা প্রমাণ। এবং কোরআনুলকরীম এইজন্যে বুরহান যে; উহা আল্লাহ্পাক ও তাহার মাহবুব রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার প্রমাণ বা দলীল। (২৩) 'বাশীর' ও 'নাজির'

হওয়াও অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা, কোরআনে পাক স্পষ্টতঃই সুসংবাদ দান করে এবং ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে। (২৪) 'কাইয়ূম' অর্থ কায়েম থাকা বা কায়েম রাখা। এই জন্যে আল্লাহ্পাককেও কাইয়ূম বা চিরস্থায়ী বলা হয়। কোরআনে পাক এই অর্থে কাইয়ূম বলা হয় যে, উহা কিয়ামত অবধি কায়েম থাকিবে এবং কোরআনের মাধ্যমে 'দ্বীন' কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। (২৫) 'মুহাইমিন' অর্থ আমানতদার অথবা মুহাফিজ বা হেফাজতকারী। যেহেতু, কোরআনে পাক মুসলমানদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে হেফাজতকারী, আল্লাহপাকের আহ্কামের আমানতদার, এবং নবীয়ে আমীনের উপর নাজিল হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের হস্তে ছিল যাহারা ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার আমীন বা বিশ্বস্ত। এইজন্যে কোরআনে কারীম 'মুহাইমিন' বলিয়া কথিত। (২৬) 'হাদী-র' অর্থও অত্যন্ত স্পষ্ট। (২৭) 'নূর' উহাকেই বলে যাহা নিজেও প্রকাশ হয় এবং অন্যকেও প্রকাশ করে। যার অর্থ রৌশন বা আলোক। কোরআনে পাক নিজেও জাহের বা প্রকাশ এবং আল্লাহ্ পাকের আহ্কাম সমূহ নবীগণকে এবং তৌরিত ও ইঞ্জিল প্রকাশকারী। এইজন্যে উহা নূর। যেসমস্ত নবীগণের নাম কোরআনে আসিয়াছে তাহা সকলেরই মধ্যে জাহের বা প্রকাশ হইয়াছে। কোরআনে কারীম পুলসেরাতের আলোকস্বরূপ মুসলমানদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পথ নির্দেশ করিবে। (২৮) 'হক' অর্থ সত্য বাতিলের মোকাবেলায়। কোরআনে পাক 'হক কথা' বলে এবং ' হক' এর পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছে। এবং সত্য নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। এইহেতু উহাকে 'হক' বলা হয়। (২৯) 'আজিজ' অর্থ গালিব বা বিজয়ী এবং বেমিছাল বা অতুলনীয়। কোরআনে পাকও সবার উপর গালিব ছিল এবং অদ্যাবধি সবার উপর গালিব রহিয়াছে এবং অতুলনীয়ও বটে। এইজন্য উহা আজিজ। (৩০) 'কারীম' অর্থ দাতা যেহেতু, কোরআন শরীফ আল্লাহ্র এলেম, রহমত এবং ঈমান ও অফুরন্ত ছাওয়াব দান করে; সেইহেতু উহার মতন এমন দাতা আর অধিক দাতা কে হইতে পারে। (৩১) 'আজীম' এর অর্থ বড়। কেননা, কোরআন মজীদই সবচাইতে বড় কিতাব।

জরুরী জ্ঞাতব্য- আল্লাহ্পাক জাল্লাশানুহূ কতক জিনিসকে 'আজীম' বলিয়াছেন। আল্লাহ্পাক স্বীয় জাত বা সত্ত্বাকে, আরশে মুয়াল্লাকে, কোরআন মজীদকে, কিয়ামতের দিনকে, কিয়ামতদিবসের যল্যলাহ্ বা কম্পনকে, হুজুর পোরনূর আলাইহিস্সালামের আখলাককে কারীমা অর্থাৎ অনুপম সুন্দর চরিত্রকে এবং আল্লাহপাকের ফজল যাহা হুজুর আলাইহিচ্ছালামের প্রতি নাযিল হইয়াছে। আরও কতিপয় বিষয়কে আজীম বলিয়াছেন। যথা- নারীর প্রতারণাকে, ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুকে, মুসলমানদিগের ছওয়াবকে এবং মুনাফেক সম্প্রদায়ের আজাবকে। (৩২) 'মুবারক' অর্থ বরকত ওয়ালা। যেহেতু, কোরআনুলকারীম পাঠে এবং তদনুযায়ী আমলে ঈমানের মধ্যে বরকত হয়। এবং

নেক আমলে বরকত, ইজ্জত আবরুতে বরকত, চেহারার আলোতে বরকত হয়। এইহেতু কোরআন শরীফকে মুবারক অর্থাৎ বরকতময় কিতাব বলা হয়।

ফায়দা ঃ কোরআনেকারীমে কতিপয় জিনিসকে মুবারক বলা হইয়াছে। যথা- (১) 'তুরেসিনাকে যে স্থানে হজরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ্‌পাকের সহিত কালাম বিনিময় করিয়াছেন। (২) যইতুন বৃক্ষকে (৩) হজরত ঈসা আলাইহিসসালামকে (৪) বৃষ্টির পানিকে (৫) শবে কদরকে এবং (৬) কোরআনে কারীমকে। যেহেতু , কোরআনুল কারীম মুবারক রাত্রিতে মুবারক ফেরেশতা দ্বারা মুবারক জাতের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব কোরআনে পাক শত শত বরকতের সমুদ্র। আল্লাহ্‌পাক ছোব্‌হানাহূ ওয়াতায়ালা ৭টি বিষয়কে কারীম বলিয়াছেন। যথা- (১) আল্লাহ্‌পাক স্বীয় জাত বা পবিত্র সত্ত্বাকে, (২) কোরআন শরীফকে, (৩) হজরত মুসা আলাইহিসসালামকে, (৪) নেক আমলের ছওয়াবকে, (৫) আরশে আজীমকে, (৬) জিবরাঈল আমীনকে এবং (৭) হজরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালামের ঐ চিঠিকে যাহা বিলকিসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন ঃ জালীকা 'ইছমে ইশারা' যাহা দূরের জিনিস বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়। এবং ইশারা বা নির্দেশের জন্যে অপরিহার্য যে; যাহার দিকে নির্দেশ করা হয়। তাহা যেন দেখা যায়। যখন জালীকা ব্যবহার করা হইয়াছিল তখন সমগ্র কোরআন শরীফ দেখা যাইত না; এবং উহা দূরেও ছিল না। এক্ষেত্রে জালীকা ব্যবহারের তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ ইহার উত্তরে তফসীরে কবীর শরীফে আছে যে, ইশারা করিবার জন্যে অপরিহার্য নহে যে ঐ জিনিস দেখা যাইবে। যদি ঘটনাক্রমে কোন স্থানে শ্রবণকারীর খেয়ালে ঐ বিষয় উদয় হয়; তবে ঐ খেয়ালের বিষয়ের প্রতি ইশারা হয়। যেমন- কোরআনে কারীমে কিয়ামতের ব্যাপারে ইরশাদ হইয়াছে- 'জালীকা ইয়াওমুল্ ওয়ায়িদ'। এবং 'ছাকরাতুল মাওতের' প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে- 'জালীকা মা কুন্তা মিন্‌হু তাহীদ'।

কিন্তু ইহা অপরিহার্য যে, যেই জিনিস খেয়ালে অনুভব করা হয়, ঐ জিনিসের প্রতি তখন ইশারা করা যাইবে। ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে, জালীকা দূরবর্তী জিনিসকে বুঝাইতে ব্যবহার করা হয়, এবং 'হাজা' নিকটের জন্যে। বরং জালীকা ও নিকটবর্তী জিনিস বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইতে পারে। কেননা, 'হাজা ও 'জালীকা' উভয় শব্দই 'জা' হইতে বাহির হইয়াছে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে; হাজা- র মধ্যে জা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আর 'জালীকার' মধ্যে 'লিকা'। কাজেই এইস্থানে জালীকা নিকটের জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য কথায় জালীকা দ্বারা ঐ কিতাবের দিকে ইশারা হইতেছে যাহা 'লওহে মাহ্‌ফুজে' অথবা তৌরিত এবং ইঞ্জিলে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ইহাও হইতে পারে যে, বড় শানদার বা

মর্যদাশীলের প্রতি দূরের নির্দেশ জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইহেতু, এইস্থানে জালিকা ব্যবহৃত হইয়াছে।

লা-রাইবা ফিহে– পূর্বাপর সম্পর্কঃ ইহার সম্পর্ক 'জালীকাল্ কিতাবের' সহিত অথবা ইহার সম্পর্ক এই যে, লা-রাইবা ফি মুবতেদা' এবং 'জালীকা কিতাব' উহার 'খবর'। তাহা হইলে অর্থ হইবেঃ "ইহা ঐ কিতাব যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।" অথবা জালীকাল্ কিতাব পৃথক পৃথক বাক্য এবং ইহা ভিন্ন বাক্য। কাজেই, অর্থ দাঁড়াইবেঃ ইহা পূর্ণ কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে, 'লা-রাইবা ফি' ইহাতেও দুইটি এহতেমাল' বা অনুগ্রহ রহিয়াছে। প্রথমতঃ লারাইবার উপর আয়াত শেষ হইবে ফিহের সম্পর্ক 'হুদান'-এর সহিত। তাহলে অর্থ হইবে– ইহাই পূর্ণ কিতাব, নিঃসন্দেহে ইহাতে পরহেজগারদিগের হেদায়াত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই যে, ফিহের উপর আয়াত শেষ হইয়াছে এবং 'হুদাল্লিল্ মুত্তাক্বীন দ্বিতীয় আয়াত হইলে অর্থ হইবে– ইহাই পূর্ণ কিতাব উহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীনদিগের হেদায়াতকারী।

তাফসীর ঃ لا 'লা' নফীয়ে জিন্‌ছ। নফীয়ে জিন্‌ছ উহাকে বলে যে আসল জিনিসের এন্‌কার বা অস্বীকার করে। তখন অর্থ দাঁড়াইবে– ইহাতে মূলতঃই কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ কোন প্রকারের সন্দেহই কোরআনে পাকে নাই। ريب 'রাইবা ريبة 'রাইবাতুন' হইতে নিষ্পন্ন। যাহার অর্থ কষ্ট, পেরেশানী, এবং নূতন মছিবত। এইজন্যে বলা যায়– ريب الزمان অর্থাৎ যুগের মছিবত। 'এস্তেলাহী' বা পরিভাষাগত অর্থে ঐ সন্দেহকে রাইবা বলা হয়ঃ যাহার মধ্যে বদগুমানী বা মন্দধারণা পাওয়া যায়। সন্দেহে বা রাইবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সন্দেহের মধ্যে পেরেশানী রহিয়াছে। অর্থাৎ কোন কথায় বিশ্বাসের দুর্বলতাজনিত দুর্ভাবনার সৃষ্টি হওয়া এবং রাইবা ও ঐ ধরনের সন্দেহ যাহার মধ্যে মন্দধারণা শামিল থাকে। যেহেতু, রাইবের মধ্যেও দ্বীলের পেরেশানী ও অশান্তি নিহিত থাকে। সেইহেতু, উহাকে 'রাইব' বলা যায়। অতএব, কালামের মকছুদ এই যে, কোরআনে পাক 'আল্লাহ্‌র কালাম' হওয়ার বিষয়টি এতদূর স্পষ্ট যে, উহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। অর্থাৎ 'কালামে ইলাহী' বা 'কালামুল্লাহ' হওয়ার ব্যাপারে এত অধিক দলীল-প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে যার কারণে উহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতেই পারে না। বিশেষতঃ কোরআনে পাক যে দেশে অবতীর্ণ হয় সেই দেশের অধিবাসীরা তদ্‌কালে নিজস্ব ভাষাচর্চায় এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া ছিল যে, তাহাদের ফাছাহাত ও বালাগাত পরিপূর্ণ ভাষা ও সাহিত্যে নিজেদের শীর্ষস্থানীয় দাবী করিত। এইজন্যে আরবের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আরবী এবং আরবের বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরকে 'আজমী' বলিয়া অভিহিত করিত। 'আরবী' অর্থ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন বা সবাক প্রাণী। আর 'আজমী' অর্থ– অশিক্ষিত, অজ্ঞ, মূর্খ বা বোবা। এইহেতু, ভাষাহীন প্রাণীকে 'উজামা' বলা হয়। আর কোরআনে কারীম আরবী-আজমী

নির্বিশেষে সকল ভাষাবিদ জ্ঞানী ও সুপন্ডিত সকলকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণপূর্বক মোকাবেলা করিতে আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু কেহই মোকাবেলা করিতে সক্ষম হয় নাই। এবং যে কিতাবের মোকাবেলা হইতে পারে না উহাই 'কালামে ইলাহী' বা আল্লাহ্‌র কিতাব। দ্বিতীয়তঃ যে মহান জাতে পাকের উপর কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার নিকট ঐ কিতাবের প্রচার ও প্রসারের জন্যে জাহেরী বা বাহ্যিক কোন উপকরণ ছিলনা। না ছিল কোন মাল-দৌলত, না ছিল কোন সংগী-সাথী এবং না ছিল কোন সাহায্যকারী। এবং ছিলনা তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন, ছিলনা পিতা-মাতার ছায়া অবলম্বন। আর যিনি ছিলেন পরম হিতৈশী স্নেহময় ও একমাত্র পৃষ্ঠপোষক, সেই মহান পিতামহ হজরত আবদুল মোতালিবের স্নেহের পরশ ও সুনজর হইতে তিনি শৈশবেই চিরবঞ্চিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিকভাবে যাঁহারা ছিল তাঁহার প্রতিবেশী তাহারাই হইয়া দাঁড়াইল প্রাণের দুষমন। এমনি এক সময়ে কোরআন শরীফ দুনিয়ায় আসে যখন না ছিল প্রচার ব্যবস্থা বা প্রচার মাধ্যম। দুনিয়াবী এবং উন্নত যমানার কোন উপায় বা উপকরণ কিছুই ছিলনা সেই যুগে যেমন ছিলনা কাগজ ছিলনা ছাপাখানা কিংবা প্রচার মাধ্যম স্বরূপ রেডিও বা বেতারযন্ত্র। এমনকি, দোয়াত কলম পর্যন্ত ছিলনা। অথচ এতদূর অসহায় ও সম্বলহীন অবস্থায় বরং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ এহেন স্বল্প সময়ে কোরআনে কারীমের উল্লেখযোগ্য প্রচার লক্ষ্য করিয়া সমগ্র দুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক; দুনিয়ার জ্ঞানী-গুনী তথা পণ্ডিতবর্গ হয়রান ও পেরেশান। ইহা কেবল আল্লাহ্‌র কিতাব হওয়ারই প্রমাণ। তৃতীয়ত ঃ যাহাদের মাঝে কোরআন কারীম নাযিল হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুনিয়াবী আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার ন্যায় বিচার তথা মানব-চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী মোটেও ছিলনা। বরং চুরি, ডাকাতি, যেনা,শরাবখুরী, ইত্যাদি ছিল তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার; আর খুন-জখম, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি ছিল তাহাদের জন্মগত অভ্যাস। এই ধরনের সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে কোরআনে পাক কেবল তেইশ বৎসরে বরং প্রকৃত প্রস্তাবে, দশ বৎসরের মধ্যে শুধু তাহাদের অবস্থারই পরিবর্তন সাধিত করে নাই; বরং সারাজাহানের কায়া বদল করিয়া দিয়াছে সমগ্র চোরকে করিয়াছে সাধু, ডাকাতকে ন্যায়-পরায়ণ ও সুবিচারক, অসভ্যদিগকে করিয়াছে সমগ্র দুনিয়ার সভ্য মানুষের শিক্ষাগুরু এবং অশিক্ষিতদিগকে করিয়াছে 'এলমে লাদুনী' বা পরম ঐশীজ্ঞানের অধিকারী। অন্য কথায়, অশিক্ষিতদের মধ্য হইতে কাহাকেও বানাইয়াছে 'সিদ্দিক' বা 'পরম বিশ্বস্ত' কাহাকেও বানাইয়াছে ফারুক বা ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী; এবং কাহাকেও "জুন্নুরাইন্' ও কাহাকেও হায়দার বানাইয়া দিয়াছে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিতে, বি,এ; এম,এ পাশ করিতে, কোন যুবকের উল্লেখযোগ্য কতক বৎসর লাগিয়া যায় এবং তাহাতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু ঐ যুগে কোথায় ছিল মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়? আর কোথায়ইবা ছিল উপযুক্ত শিক্ষক

কিংবা পুঁথি-পুস্তক? কোন কিছুই যখন ছিলনা, ঐ যামানায় তখন মুহূর্তের মাঝে দেখিতে দেখিত নবীয়ে পাকের ছাহাবাগণ সমস্ত বিষয়ে পরিপক্কতা ও পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ কোরআনুল কারীমের ছোট ছোট আয়াতও ফাছাহাত ও বালাগাত এবং মাসায়েল ও হেকমত বা রহস্যরাজির ভাণ্ডারস্বরূপ। হজরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী আলাইহির রাহমাত শুধু 'আউজু' এই শব্দ হইতে ১০,০০০ (দশ হাজার) মাসআলা বাহির করিয়াছেন। এক বুজুর্গ ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রায় চারিলক্ষ 'তরকীব' বাহির করিয়াছেন। অপর এক বুজুর্গ الهكم التكاثر 'আল্‌হাকুমুত্তাকাছুর' দ্বারা বহু বহু মাসআলা বাহির করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর মর্মে এই কথাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনে পাক 'কালামে ইলাহী' বা 'আল্লাহ্‌র কালাম'। পঞ্চমতঃ কোরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে এতদূর আকর্ষণ রহিয়াছে যে, যাহারা কোরআনের মর্ম বুঝেনা তাহারাও শ্রবণমাত্রই ক্রন্দন করিতে থাকে। তাহাদের শরীরে পশমগুলি দাঁড়াইয়া যায় এবং শরীরে কম্পন আসে। যখন হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোরআন তেলাওয়াত করিতেন তখন মুশরেকদিগের ছেলেমেয়েরা একত্র হইয়া কান্না জুড়িয়া দিত। আজকালও দেখা যায়, কেহ যদি উত্তমরূপে খোশলেহানে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে তখন অমুসলমানদিগের মধ্যেও 'ওয়াজ্‌দহাল' পয়দা হইতে দেখা যায়। ষষ্ঠতঃ আরবের বড় বড় নামজাদা ভাষাবিদ তথা বালাগাত ও ফাছাহাতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ যখনই আল্‌কোরআনের মোকাবেলায় অসিত কোরআনের অমিয়বাণী শ্রবণমাত্রই তৎক্ষণাৎ সেজদায় লুটাইয়া পড়িত। মানবজাতির মধ্যে যদি সামান্যতম জ্ঞানও বিদ্যমান থাকে। তবে আল্‌ কোরআনের এই সমস্ত গুণাবলী দর্শন কিংবা শ্রবণপূর্বক উহাকে আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিতে পারে না। আর জ্ঞানের ইশারায় ইসলাম হইতে দূরে অবস্থান করিতেও পারে না। কিন্তু জেদ্‌ ও হিংসা নামক মারাত্মক ব্যাধির কোন চিকিৎসা নাই।

একটি নুক্‌তা বা সুক্ষমকথা ঃ لَا رَيْبَ فِيْهِ 'লা-রাইবা ফি' দ্বারা একথারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যেহেতু ইহা আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহ পাক মিথ্যা হইতে পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্যে মিথ্যা বলা 'মহাল বিজ্জাত'; কাজেই আল্লাহ্‌র কালাম হইতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। দুনিয়ায় যতবড় বিদ্যান ও সুপণ্ডিত হউক অনেক সময় দেখা যায় ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিতে কিংবা উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে এমনকি, অধিক কথা বার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নিতেও ত্রুটি করেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের কালাম কোরআন মজীদ এই সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহাতে 'দেওবন্দি' মজহাবের' বিরুদ্ধাচারণ হইয়া গেল। কেননা, দেওবন্দি ধর্মমতে 'আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা সম্ভব'। যখন আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব হইয়া গেল, তখন কোরআন সত্য হওয়া লাজেম রহিল না। আবার, কোরআনে যখন মিথ্যার সম্ভাবনা কিংবা

আভাস পাওয়া গেল তখন অনিবার্যরূপে 'লা-রাইবা ফি'-র খেলাফ হইয়া গেল। নাউজুবিল্লাহ্! এই বেকুফ পণ্ডিতদিগের ধর্মমতে খোদাতায়ালার সত্য হওয়ার পরিচয় তখনই মিলে যখন খোদাতায়ালার মধ্যে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে, যদিও বলেন না। প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, বোবা লোকেরা মিথ্যা বলার যোগ্যতা নাই। কারণ; সে তো সত্য-মিথ্যা কিছুই বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। ঐ সমস্ত দেওবন্দী লোকেরা হয়তবা এই কায়দায় সমস্ত দোষের কাজেরই সম্ভাবনা আল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মানিয়া থাকিবে। যথা–মৃত্যু, অজ্ঞতা প্রভৃতি। অথবা চুরি, ডাকাতি, জিনা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ। এই সমস্ত বিষয়ের উপর আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু উহা প্রয়োগ করেন না। এই আল্লাহ্র পরিচয়? নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহপাক যখন দ্বীনকে কাহারও উপর হইতে উঠাইয়া লন তখন তাহার আক্বল বা জ্ঞানও বিলুপ্ত করিয়া দেন। এই মাছআলার পূর্ণ-আলোচনা على كل شئ قدير এই আয়াতের প্রসঙ্গে করা হইবে।

فيه 'ফি' শব্দ মোকাদ্দম বা অগ্রবর্তী হওয়ায় অর্থাৎ আগে ব্যবহৃত হওয়ায় কলেমায়ে হাছারের ফায়দা হাছেল হইয়াছে। অর্থাৎ কেবল কোরআনের মধ্যেই হেদায়াত রহিয়াছে। আক্বল বা জ্ঞানের দ্বারা হাছেল হয়না। তৌরিত এবং ইঞ্জিলের দ্বারাও এখন আর হেদায়াত লাভ হয় না। কেননা, আক্বল জ্ঞান শ্রেফ দুনিয়াভী হেদায়েতের কাজে আসে। আর তৌরিত ও ইঞ্জিল মনছুখ বা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীছের হেদায়াত প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনেরই হেদায়াত। কারণ, হাদীছ তো কোরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র। তৌরিত ও ইঞ্জিল পূর্বে হেদায়াত ছিল এক্ষণে নহে। যেমন– শৈশবকালে মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্যে খাদ্য ছিল, কিন্তু যৌবনকালে তাহা নহে। জানা দরকার যে, 'অনুভূতি' ও 'আক্বল' মানুষকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং আল্লাহর ওহি মানুষকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু অনুভূতি আক্বলের সহায়তার পথ দেখায় বেআক্কেল মানুষ নাপাক বা অপবিত্র দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া বসে। কুপের ভিতর ডুবিয়া মরে। তদ্রুপ, আক্বল বা জ্ঞান কেবল ওহির সাহায্যে পথ প্রদর্শকরূপে পরিগণিত। এবং ওহি ব্যতীত আক্বল বিপরীত পথে ধাবিত হয়।

আরিয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন

এই স্থানে আরিয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন এই যে, কোরআনের ঘোষণা যে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ ইহাতে কাফেরদেরও সন্দেহ রহিয়াছে এবং মুসলমানদের বহু দলের উহার ব্যাখ্যার উপর সন্দেহ রহিয়াছে। যেমন– কতক ফেরকার লোক আয়াতে মোতাশাবেহাতের জাহেরী অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। উলামাগণের মধ্যে বহু জায়গায় সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্যে, মোফাচ্ছির ও মোহাদ্দিসগণের মধ্যে এবং ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্বারীগণের কেরাতের মধ্যেও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। মোটকথা,

কাফেরদেরতো উহা 'আল্লাহ্‌র কালাম' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ, মুসলমানদের গোমরাহ দলের উহার অর্থের মধ্যে সন্দেহ, আলেমগণের উহার তৌজির মধ্যে সন্দেহ। এবং ক্বারীদের এবারতের মধ্যে সন্দেহ; আবার সর্বসাধারণের বুঝার মধ্যে সন্দেহ। এতসব সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও 'সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই'- এই কুথা কেন? সর্বোপরি, মজার কথা এই যে, কোরআনে একস্থানে আছে– و ان كنتم فى ريب مما نزلنا 'ওয়াইন্‌কুন্তুম্ ফিরাইবিম্ মিম্মা নায্‌যালনা' যাঁহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহাতে লোকের সন্দেহ হইয়াছে এবং তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে, উভয় আয়াতের মধ্যে মীমাংসা কিরূপে হইবে?

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ যে সুন্দর নিয়মে আমি উল্লিখিত প্রশ্ন সাজাইয়াছি প্রশ্নকারীগণ এতদূর সুন্দর করিয়া প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইবে না।

উত্তর ঃ উল্লিখিত প্রশ্নের সবচাইতে উত্তম উত্তর ইহাই যাহা তফছীরে 'রুহুল বয়ান শরীফে' দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই যে, উক্ত আয়াতে কিতাবের মধ্যে সন্দেহ নাই বলিয়া ইরশাদ হইয়াছে; মানুষের মধ্যে সন্দেহ নাই বলা হয় নাই। অর্থাৎ, এই কিতাবে সন্দেহের অবকাশ নাই; যদি মানুষের অন্তঃকরণে সন্দেহ উদ্ভব হয় তবে উহার অস্বীকৃতির উল্লেখ হয় নাই। এই জওয়াবের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মূলতঃ সন্দেহ দুইটি কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বয়ং কালাম সন্দেহযুক্ত। দ্বিতীয়ত ঃ কালামতো সত্য বটে কিন্তু লোকজন আপন জ্ঞানহীনতার দরুণ কিংবা হিংসার বশবর্তী হইয়া উহাতে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। যেমন কোরআন শরীফ আপন অস্তিত্বের মাঝে স্বয়ং সত্য কিন্তু কুফ্‌ফাররা জেদ ও হিংসার বশবর্তী হইয়া উহাতে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। যেমন– সত্য বিষয়কে অনেক সময় হিংসার কারণে মানুষ সন্দেহ করিয়া থাকে কিংবা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে থাকে, যদিও বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সত্যই থাকিয়া যায়। উলামায়ে রব্বানীদিগের এখতেলাফ বা মতভেদ এলেমের স্বল্পতার দরুণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহকীকের অভাবহেতু। و ان كنتم فى ريب 'ওয়াইন্‌কুন্তুম্ ফিরাইবিম্' -এর মধ্যে মানুষের সন্দেহের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, কোরআনের সন্দেহের কথা বলা হয় নাই। এবং মানুষের সন্দেহ এই কারণে যে, আয়াতের মধ্যে 'লা-রাইবা ফি' অর্থাৎ এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই। আর ঐস্থানে বর্ণিত হইয়াছে–'ওয়া ইনকুন্তুম ফিরাইবিম্' অর্থাৎ, 'হে কাফেরসকল! যদি তোমাদের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়া থাকে'।

هدى للمتقين হুদাল্লিল্ মোত্তাক্বীন ঃ

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ হয়ত হুদান্ 'মুবতেদা এবং ইহার খবর কি; তবে উহা মাছদারের অর্থ প্রকাশ করিবে। এক্ষণে ইহার অর্থ হইবে– এই কোরআনে পাকে পরহেজগারদের জন্য হেদায়াত বা পথের সন্ধান রহিয়াছে। অথবা ইহা পৃথক

বাক্য এবং উল্লিখিত لا ريب فيه লা রাইবা ফিহে শিয়া ফেরকারও রদ বা প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কেননা, কোরআনে কারীম সন্দেহ হইতে তখনই মুক্ত থাকিবে যখন উহার বাহক হজরত জিবরাঈল আলাইহিচ্ছালাম গ্রহণকারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং কোরআন প্রচারকারী ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই থাকিবেন আমানতের খিয়ানত হইতে পাক পবিত্র। যেমন– কোরআনে কারীম সত্য বলিয়া মানার জন্যে হজরত জিবরাঈল আমীন এবং নবীয়ে কারীম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া মানা জরুরী। তদ্রূপ ছাহাবায়ে কোরামকেও সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া একান্ত অপরিহার্য। যদি তাহারা সত্য না হয় তবে কোরআনে সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে যে, হয়ত ছাহাবায়ে কেরাম ভুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কাজেই তাহারা সত্যবাদী ছিলেন না। (মাআজাল্লাহ)। এক্ষণে هدى 'হুদান' হয়ত 'মাছদারের' অর্থ হইবে কিংবা 'ইছমে ফায়েলের অর্থ হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ এই ইহবে যে, কোরআনে পাক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পরহেজগারদিগের জন্যে হেদায়াত বা হেদায়াতকারী। হেদায়াতের অর্থ এবং উহার প্রকারভেদ 'ছুরায়ে ফাতেহায়' উল্লেখ করা হইয়াছে– متقى - وقى - اور وقايه মোত্তাক্বী 'ওয়াক্বীয়ুন' অথবা 'বেক্বায়াতুন' শব্দ হইতে বাহির হইয়া যাহার অর্থ হেফাজত বা অনিষ্ট সাধনকারী সকল বস্তু হইতে নিজেকে রক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় 'তাকওয়া' উহাকেই বলে মানুষ ঐ সমস্ত কার্যবলী হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবে যেসব কার্যবলী পরকাল বরবাদ করিয়া দেয়।

অতএব আয়াতের অর্থ হইবে– কোরআনে কারীম ঐসমস্ত লোকদিগের জন্যে হেদায়াত পথ প্রদর্শনকারী যাহারা মোত্তাকী বা পরহেজগার। মোত্তাকীর গুণাবলীকে তাক্বওয়া বা পরহেজগারী বলা হয়। উহার ৩টি স্তর রহিয়াছে। (১) দোজখের কঠিন আজাব হইতে নিজেকে চিরকালের জন্যে রক্ষা করা। এবং শিরক ও কুফর হইতে বাঁচিয়া থাকা। এই হিসাবে সকল মুসলমানই মোত্তাকী। (২) যাবতীয় ছগীরা-কবীরা গোনাহ্ বা ছোট-বড় সর্বপ্রকার অবৈধ ও গর্হিত কার্যকলাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করা। এই হিসাবে একমাত্র পরহেজগার লোকজনই মোত্তাকী বলিয়া পরিগণিত। অপরদিকে যাহারা ছগীরা-কবীরা গোনাহ্সমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় তাহারা মোত্তাকীদের মধ্যে শামিল নহে। (৩) অন্তর হইতে ঐ সমস্ত বস্তু নিচয়ের খেয়াল ও ধ্যানকে দূরীভূত করিয়া দেওয়া যাহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্তরায়। ইহাই তাক্বওয়ার শ্রেষ্ঠতম স্তর। এই হিসাবে আওলিয়ায়ে এজাম ও আম্বিয়ায়ে কেরামগণ মোত্তাকীরূপে পরিগণিত। তাক্বওয়া বা পরহেজগারীর শেষোক্ত স্তরের দুইট পদ্ধতি রহিয়াছে– (১) দুনিয়াভী যাবতীয় বস্তু হইতে নিজেকে সম্পর্কহীন রাখা। যেমন– দুনিয়াত্যাগী বা ফকীরের আদর্শ এবং হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম যে আদর্শ দেখাইয়াছেন। (২) বাহ্যিক সম্পর্ক সকলেরই সহিত থাকিবে কিন্তু দ্বীলের সম্পর্ক

থাকিবে আল্লাহ্র সহিত। যেমন– হুজুর গাওছেপাক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু এবং ঐ সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরামের তরিকা মোবারক যাহারা দুনিয়ার কাজ-কারবারের মধ্যেও নিজেদের জড়িত রাখিতেন। যেমন হজরত ছোলায়মান আলাইহিস্ছালাম ও হজরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালাম প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, এই কোরআন মজীদ সকল শ্রেণীর মোত্তাকীদের জন্যে সেই অনুযায়ী হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী। এইহেতু, সাধারণ লোকদের জন্যে ইসলাম ও ঈমানের হেদায়াত এবং খাছলোকদের জন্যে 'ইক্বান',ও 'এহ্ছানের' হেদায়াত। আর খাছুল্ খাছলোকদের জন্যে পর্দা আপসারণপূর্বক জামালে মাহবুবের দর্শন লাভের হেদায়াত।

কোরআনে কারীমে 'তাক্বওয়া' কতিপয় অর্থ প্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে। যথাঃ- (১) ঈমান, (২) তওবা, (৩) ফরমাঁবরদারী, (৪) গোনাহ্ পরিত্যাগ করা, (৫) এখলাছ এবং (৬) আল্লাহ্র ভয় বা 'খওফে ইলাহীকেও তাক্বওয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, ভয় বা ভীতি দুই প্রকারের হইয়া থাকেঃ- প্রথমতঃ কষ্টজনিত ভয় যাহা কষ্ট প্রদানকারী দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন– সাপের ভয় এবং চোরের ভয়। দ্বিতীয়তঃ শক্তি এবং কুদ্‌রতের ভয়, যাহা বাদশাহ্র দ্বারা নির্যাতনের ভয়ে সংকোচভাব সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে পলায়ন করিতে হয়। এইজন্যে মানুষ সর্প দেখিয়া পলায়ন করে, এবং কুদ্‌রতের ভয়ে 'বন্দেগী' পালন করা হয়। 'খওফে ইলাহী বা আল্লাহ্র ভয় ভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। আবার, কুদ্‌রতের ভয় দুই প্রকারঃ– (১) নিরাশার ভয় এবং (২) আশার ভয়। নৈরাশ্যজনিত ভয় অর্থাৎ নিরাশার মধ্যে যে ভয়ের উদ্ভব হয় তাহা আবার গোনাহ্ বা পাপকাজের উপর বাহাদুরী করিবার প্রয়াস পায় যেমন– পরাজিত বিড়াল কুকুরকে হামলা করিয়া বসে। পক্ষান্তরে আশার সহিত যে ভয়ের সৃষ্টি হয় তাহা পাপকাজ হইতে রক্ষা করে। আল্লাহ্র প্রতি যে ভয় তাহা দ্বিতীয় প্রকারের ভয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইহেতু, আল্লাহ্পাক 'ছোবহানা হুওয়াতায়ালা' কোরআনে পাকে যেমন ভয়প্রদর্শনও করিয়াছেন তেমনি আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

তাক্বওয়ার উপকারিতা

তাক্বওয়া বা পরহেজগারী অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়। কোরআনে পাকে ইরশাদ হইয়াছে– ان اکرمکم عند الله اتقاکم 'ইন্না আক্‌রামাকুম ইন্দাল্লাহে আত্‌কাকুম' অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অধিক পরহেজগার সেই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত'। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে– ان الله مع الذین اتقو 'ইন্নাল্লাহা মাআল্লাজিনাত্তাক্বাও' অর্থাৎ, 'আল্লাহ্পাক পরহেজগারদিগেরই সংগী'। অপর এক জায়গায় আল্লাহ্পাক আরও ইরশাদ করেন– অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করিবে, সে সর্বপ্রকার

বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং তাহাকে এইরূপ রিজিক দেওয়া হইবে যাহা তাহার ধারণার বাহিরে। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, তাক্বওয়া বা পরহেজগারী দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে বড়ই উপকারী। তফছীরে কবীরে হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি লোক সমাজে সম্মানিত হইতে চায় তাহার উচিত আল্লাহতায়ালাকে ভয় করা এবং পরহেজগারী এখ্তিয়ার করা। হজরত শেখসাদী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে 'বুস্তায়' লিখিয়াছেন– অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে গর্দান না ঝুঁকাও, তবে তোমার হুকুমে কেহ ফিরিয়াও তাকাইবে না।

অনেক আওলিয়ায়ে কেরামকে দেখা যায়; জংগলের পশু এবং পাথর প্রভৃতি তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে।

তাক্বওয়ার আলামতসমূহ

বিভিন্ন বুজুর্গানে কেরাম তাক্বওয়া বা পরহেজগারীর বিভিন্ন আলামত বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা তফছীরে কবীর এবং তফছীরে আজিজী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ছাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, 'মোত্তাকী' বা পরহেজগার ঐ ব্যক্তি যিনি গোনাহ্র কাজে স্থির থাকে না এবং নিজ এবাদতের উপর গৌরব করে না। হজরত হাছান বছরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে– পরহেজগার ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র মোকাবেলায় গায়রুল্লাহকে সমর্থন না করে; এবং সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র কব্জা বা অধিকারে ধারণা করে।

হজরত ইব্রাহীম ইব্নে আদহাম বলেন– মোত্তাক্বীর পরিচয় এই যে, কথায় যে সৃষ্টি এবং কাজে কর্মে যে ফেরেশতা এবং আল্লাহ্পাক যাহার অন্তরে কোন প্রকার দোষত্রুটি না পান।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে– মোত্তাক্বী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি সন্দেহপূর্ণ বস্তুসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকেন। যেমন– হজরত ইব্নে ছিরিন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট ৪০টি ঘিয়ের ঘড়া ছিল। জনৈক গোলাম আসিয়া জানাইল যে, কোন এক ঘড়াতে ১টি মরা ইঁদুর পাওয়া গিয়াছে। তিনি সেই ঘড়া কোনটি জানিতে চাহিলে গোলামটি বলিল যে, উহা তাহার স্মরণ নাই। তখন তিনি আদেশ করিলেন– 'সমস্ত ঘড়াসমূহের ঘি ফেলিয়া দাও; কেননা, সমস্ত ঘড়ার মধ্যেই সন্দেহ জাগিয়াছে।' হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন এক লোকের নিকট কিছু কর্জ দেওয়া টাকা পাওনা ছিলেন; একদিন তিনি সে টাকার তাগিদে ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তখন রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত প্রখর ছিল। ফলে, গরম খুবই বেশী ছিল; কিন্তু, তবু তিনি ঐ কর্জদার ব্যক্তির বাসভবনের

দেওয়ালের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ইমামে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তরে বলিলেন– "আমি ভয় করিতেছি যে, তাহার দেওয়ালের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে না জানি সুদ হইয়া যায়।" (রুহুল বয়ান শরীফ)। ছুফীয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন যে, মোত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যে ঐ রোজে আযলের অংগীকারকে পূরণ করে। যাহার সম্বন্ধে কোরআনে পাকে ফরমাইয়াছেন– اوفوا بعهدى اوف بعهدكم 'আওফু বিআহ্‌দি উফি বিআহ্‌দিকুম' অর্থাৎ "তোমরা আমার ওয়াদা বা অংগীকার পূরণ কর, এবং তোমাদের ওয়াদাও পূরণ করা হইবে।"এবং উহার আলামত এই যে, যাবতীয় বালা মছিবতে 'ছবর' বা ধৈর্যধারণ করিবে; নেয়ামাতসমূহের শোক্‌রীয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে; ক্বাজায়ে ইলাহীর উপর অর্থাৎ তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কোরআন মজীদের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িবে; অর্থাৎ কোরআনে কারীমের উপর দৃঢ়বিশ্বাস কায়েম রাখিবে।

প্রশ্ন ঃ এই স্থানে কতিপয় প্রশ্ন রহিয়াছে। আরিয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন এই যে, ইহার দ্বারা জানা যায় যে, কোরআনে কারীম ঐ ব্যক্তিকেই হেদায়াত করিবে যে ব্যক্তি পূর্ব হইতেই পরহেজগার ছিল। অথচ, প্রয়োজন ছিল যে, গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট লোকদিগকেই কোরআনে কারীম হেদায়াত করিবে। কেননা, যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে পরহেজগার তার আবার হেদায়াতের প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ ইহার কয়েকটি উত্তর রহিয়াছে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তর যাহা তফছীরে আজিজীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এই যে, ইহার অর্থ এই নয় যে, যাহারা মোত্তাক্বী তাহাদিগকে কোরআনে কারীম হেদায়াত করিবে। বরং এই অর্থ যে, যাহারা মোত্তাক্বী হইবে বলিয়া বুঝা যায়, তাহাদিগকেই কোরআনে কারীম হেদায়াত করিয়া থাকেন। তাহারা কোরআন দ্বারা হেদায়াত লাভ করিয়া থাকে। যেমন– অতীত যুগে মোত্তাক্বীদিগকে হেদায়াত করিয়াছে। এই কথা বলা হইয়াছে– হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা কি কোরআনে কারীমের শান অবগত আছ? তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ছিদ্দিক ও ফারুক এবং মোহাজের ও আনছার এবং মোত্তাক্বী পরহেজগার ও নেককার রহিয়াছে তাহারা সকলেই কোরআনে কারীমের দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। তাহারা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন সবই কোরআনে পাক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোরআনে কারীম তাহাদিগকে সুপথের সন্ধান দিয়াছেন, পরহেজগারী বা ধর্মনিষ্ঠা দান করিয়োছেন। উপরন্তু, তাহাদিগকে 'হাদী' বা হেদায়াতকারী অর্থাৎ, এক একজন স্বয়ং পথপ্রদর্শক বানাইয়াছেন। মোটকথা, কোরআনে কারীমের ঘোষণা এই যে, "যদি আমার হেদায়াতের নমুনা দেখিতে হয় তবে যিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন সেই মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ছাহাবাগণকে দেখ।" উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেহ কোন এক মেয়েলোকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিল যে, এই দুধ পিলানেওয়ালা মেয়েলোকটি ঐ যুবকের মাতা। তাহলে, একথার মর্ম এই নহে যে

মেয়েলোকটি এখনো ঐ যুবককে দুধ পান করায়। বরং কথাটির তাৎপর্য এই হইবে যে, লোকটি এই দুধ মাতার দুধ পান করিয়া যুবক হইয়াছে। ইহাই এই স্থানে বুঝাইতেছে।

ফায়দা ঃ ইহাতে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরাম অথবা আহলে বাইতে এজামের ঈমানের অস্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনে কারীমের 'হাদী' হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করে। কেহ কেহ এই উত্তর দিয়াছেন যে, বর্ণিত 'মোত্তাক্বী' ভবিষ্যৎকালের হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কোরআনে পাক হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী এ সমস্ত লোকদের জন্যে যাহারা মোত্তাক্বী হইবার যোগ্য এবং যাহাদের ভাগ্যে 'তাক্বওয়া' লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন– আমরা অনেক সময় 'তালেবুল এল্‌মকে' মৌলুভী সাহেব' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকি। তৃতীয় উত্তর– এই যে, মোত্তাক্বী দ্বারা বুঝায় যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অর্থাৎ, যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় রহিয়াছে, সে কোরআনের উপর ঈমান আনিবে। আর যাহাদের অন্তরে হটকারিতা ও শয়তানী কুমন্ত্রণাপূর্ণ তাহারা অস্বীকার করিবে। চতুর্থ উত্তর– এই যে, হেদায়াত দ্বারা বুঝায় 'মঞ্জিলে মকছুদে' পৌঁছান। এক্ষণে, অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি পরহেজগার কোরআনে পাক কিয়ামতের দিন তাহাকে বেহেশ্‌ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। যেমন– বর্ণিত আছে যে, কোরআনে কারীম ঐ দিন 'নূর' হইয়া মোমিনগণের আগে আগে চলিবে। পঞ্চম উত্তর– 'মোত্তাক্বীন' দ্বারা বুঝায় 'মুমিনীন্' বা ঈমানদারগণ আর হেদায়াত দ্বারা বুঝায় নেক আমলের 'নির্দেশনা। এক্ষণে, আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে কোরআনে কারীমের উপর, কোরআনে পাক তাহাদিগকে নেক আমলের প্রতি নির্দেশ করিয়া থাকে।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ ঈমান নবীর মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং ঈমানের পর কোরআন মুমীনের দ্বীলে আসে। এইজন্যে কাফেরকে সর্বপ্রথম কালেমা পাঠ করাইয়া মুসলমান বানাইতে হয়। তৎপর, তাহাকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব, নবীকে যে পাইয়াছে সে ঈমান পাইয়াছে, ঈমান কেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌কে পাইয়াছে। এবং কোরআন মজীদ তখনই হাতে আসে যখন অন্তরে নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ভালবাসা থাকে। আমারা হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দ্বারা কোরআনকে চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু কোরআনের দ্বারা হুজুরের পরিচয় পাই নাই। বরং হুজুরে পাকের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহার 'মু'জেজার' দ্বারা। এক্ষণে, এইকথা বলা যাইতে পারে যে; 'ক্বোরআন' মু'জেজা' হওয়ার কারণে নবীয়েপাকের পরিচয় বহন করে। আর নবী আলাইহিচ্ছালামের মাধ্যমে কোরআন পাক পরিচিতি হয়। এক্ষণে আয়াতের অর্থ খুবই সূক্ষ্ম বিবেচিত হইতেছে। যথা– যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার বরকতে ঈমান আনয়ন করিয়াছে, কোরআন মজিদ তাহাদিগকে তাক্বওয়া ও পবিত্রতার পথ নির্দেশ করিয়া থাকে। স্মরণ রাখা উচিত যে, নবী

করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হেদায়াত বা পথ প্রদর্শন কোরআনের উপর নির্ভরশীল নহে। কেননা, তিনিতো স্বয়ং আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে হেদায়াতসহ দুনিয়ায় আগমন করিয়াছেন। হজরত ঈসা আলাইহিচ্ছালাম জন্মগ্রহণ করিয়াই তাহার কওমকে বলিয়াছেন– "আমি আল্লাহ্র বান্দাহ্, আমাকে আল্লাহ্ কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী বানাইয়াছেন। আমাকে বরকতওয়ালা করিয়াছেন। আমাকে নামাজ-রোজার আদেশ দিয়াছেন।" পক্ষান্তরে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম পূর্ব হইতেই 'মুন্সেফ' বা সুবিচারক ছিলেন। 'আমিন' বা বিশ্বস্ত ছিলেন; এবং আবেদ বা শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ্র উপাসক ছিলেন।

আর যে সমস্ত আহ্কাম কোরআনে পাক শুনাইয়াছে উহার সম্বন্ধে হুজুরপাক পূর্ব হইতেই জানিতেন; এমনকি, উহার উপর আমলকারী ছিলেন।

এইজন্যেই ইরশাদ হইয়াছে– هدى للمتقين হুদাল্লিল্ মোত্তাক্বীন্'। এইরূপ ইরশাদ হয় নাই যে, হুদান্ লাকা-অর্থাৎ কোরআনে পাক এই সমস্ত পরহেজগারদিগের জন্যে হাদী, আপনার জন্যে হাদী নহে।

প্রশ্ন ঃ এইস্থানে বলা হইয়াছে যে, কোরআন পরহেজগারদের জন্যে হাদী; অপর এক জায়গায় বলা হইয়াছে– هدى للناس 'হুদাল্লিন্নাছ' অর্থাৎ, কোরআন সমস্ত মানুষের জন্যে হেদায়াত। এক্ষণে এই উভয় আয়াতের 'মুতাবেকাত' বা সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে সম্ভব?

উত্তর ঃ ইহারও কয়েকটি উত্তর রহিয়াছে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জওয়াব ইহাই যাহা তফছীরে কবীরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই– উক্ত উভয় আয়াতের একত্রীকরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেবল পরহেজগার লোকজনই মানুষরূপে গণ্য। আর যাহার অন্তঃকরনে আল্লাহ্র ভয় নাই সে মানুষই নহে। সে কেবল মানুষের বেশধারী পশুমাত্র। বরং পশুর চেয়েও অধম। কেননা, পশু তার নিজের মালিককে চিনে; আর সে তার মালিককেও চিনে না। দ্বিতীয় উত্তরঃ কোরআনে পাকের একটি কাজ হইল– রাস্তা দেখাইয়া দেওয়া বা পথ প্রদর্শন করা। এবং তাহা কাফের মুনাফেক কিংবা পৌত্তলিক-মুশরিক নির্বিশেষে সকলকে পথের সন্ধান দেওয়া। আর একটি কাজ হইল রাস্তায় পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইহা কেবল মুমিন-মুসলিমদিগের জন্যে; কাফেরদের জন্যে নহে। অর্থাৎ, কোরআন দ্বারা মুসলমান সঠিক রাস্তায় পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। আর কাফের পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল সমগ্র কোরআন মজীদ হেদায়াত; অথচ কোরআনের কতিপয় আয়াত আয়াতে 'মুতাশাবেহাত যাহা কোন মানুষেরই বোধগম্য নহে; অর্থাৎ বুঝে আসে না। এমতাবস্থায় হেদায়াত কিরূপে সম্ভব হইবে? আর কিছুসংখ্যক আয়াত এইরূপে রহিয়াছে যাহাদের অর্থ ও তাৎপর্য বহুধরনের। যাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ মুসলমানদের মধ্যে বহু বাতেল

ফেরকার উদ্ভব হইয়াছে। তফছীরে কবীরে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, ইহার মোকাবেলায় কোরআন দ্বারা দলীল না দেওয়া। কেননা, কোরআন দ্বারা প্রত্যেক মানুষ আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'কোরআন হেদায়াত নহে যদি তাহা হইত; তবে, পথভ্রষ্ট লোকেরা উহার দ্বারা দলীল নিতে পারিত না।

উত্তরঃ- কতিপয় আয়াতের অর্থ বোধগম্য না হওয়া বা বুঝে না আসাও উহা কালামে ইলাহী বা আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা, যদি কোরআন মানুষের কালাম বা বাণী হইত তবে, কোন না কোন মানুষের জ্ঞান হাক্বিকত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইত। ছোব্হানাল্লাহ্! বড়ই মজার কথা যে, কোরআন যদি বুঝে আসে তবু উহা হেদায়াতের পথ দেখায়; আবার বুঝে না আসলেও উহা সঠিক পথের সন্ধান দিয়া থাকে। যাহা হউক, কোরআনে পাক সর্বঅবস্থায় হেদায়াতের পথ বাতায়। বদ্মজহাবের লোকদের কোরআনের আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করার অর্থ এই যে, তাহারা কোরআনের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। এবং কোরআনে পাকের 'নূর' বা জ্যোতিঃ তাদের অন্তর চক্ষুকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যেমন– মানুষ সূর্যের প্রতি নজর করিলে সূর্যকে কালরঙের দেখিতে পায়; যদিও সূর্য কাল নহে। কিন্তু তাদের চক্ষুই কাল হইয়া গিয়াছে। অন্যকথায়, বৃষ্টি বহু উপকারী জিনিস। কিন্তু কোন কোন সময় বৃষ্টির ফলে জমীনের গাছপালা কিংবা তৃণ-লতা যাহা গরু-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাও মরিয়া যায় কিংবা বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা বৃষ্টির দোষ নহে; বরং তাহা গাছ-পালা বা তৃণ-লতার দোষ। অনুরূপভাবে, ভাল খাদ্য নিশ্চয়ই দেহের ক্ষয় পূরণ ও শক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু অসুস্থ ও দুর্বল লোকের জন্য উত্তম ও শক্তিশালী খাবার নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। ইহা খাদ্যের ত্রুটি নহে, বরং খাদ্য গ্রহণকারীর শরীরের দুর্বলতা ও পেটের গোলমালই ইহার জন্যে দায়ী। অতএব, সর্বঅবস্থায় কোরআনে কারীমের প্রতিটি হরফ হেদায়াতস্বরূপ। কাজেই, কেহ হেদায়াত গ্রহণে বঞ্চিত থাকিলে তাহা কোরআনে কারীমের ত্রুটি নহে; বরং ত্রুটি তাহার নিজেরই।

২নং আয়াত ঃ

الذين يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

'আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল্ গাইবে।'

তরজমা ঃ যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে গায়েবের উপর, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াদি যাহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না।

সম্পর্ক ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোরআনে পাক পরহেজগারগণের জন্যে হেদায়াতস্বরূপ। এক্ষণে, বর্ণনা করা যাইতেছে যে, মোত্তাক্বী বা পরহেজগার কোন ধরনের লোক। যদি তাক্বওয়ার অর্থ– এই নেওয়া যায় যে, নাজায়েজ কথা-বার্তা বা নিষিদ্ধ কাজ-কর্ম ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা। তাহা

হইলে মর্মার্থ এই হইবে যে, মোত্তাক্বী ঐ ব্যক্তি যে, নাজায়েজ বিষয়াদি হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং উত্তম বিষয়াদি গ্রহণ করে। কাজেই, ঐ উত্তম বিষয়াদির কথা এই আয়াতে আসিয়াছে। যেহেতু, কঠিন ব্যাধি দূর করিতে শক্তিশালী ঔষধের প্রয়োজন, এইজন্যে তাক্বওয়ার কথা আগে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই আয়াত প্রথম আয়াতের উপর তরতীব দেওয়া হইয়াছে।

গায়েবের প্রতি ঈমান বা না দেখিয়া বিশ্বাসের কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইবার কারণ এই যে, ঈমান সমস্ত নেককাজের আসল-বা মূল। যদি ঈমান কায়েম থাকিবে তবে নেক আমলের দ্বারা উপকার হইবে। পক্ষান্তরে, ঈমান যদি বলবত না থাকে তবে নেক আমলে কোনও ফল হইবে না। এইজন্যে ঈমানের কথা আগে বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপর নামাজ, যাকাত প্রভৃতি নেক আমলের প্রসঙ্গ। মানুষের দ্বীল এক প্রকার শ্লেট বা ফলক স্বরূপ যাহার উপর নেক আমলের নক্‌শা অংকিত হয়। আর উত্তম নক্‌শা শ্লেট বা ফলকের উপর তখনই অংকন সম্ভব হয় যখন উহা উত্তমরূপে ধৌত করতঃ পরিষ্কার করা হয়। ঈমান এমনই রহমতের পানির তুল্য যাহা দ্বারা মানুষের ক্বালব বা অন্তরের ময়লা ধৌত করতঃ পরিষ্কার করা হয়। যখন ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিষ্কার করা হয়, দ্বীলের সাফাই হাছেল করা হয় তখন উহাতে নেক আম্‌লের সুন্দর সুন্দর নক্‌শা অংকন করা যাইতে পারে।

তফ্‌ছীর ঃ يؤمنون 'ইউমিনুনা' ايمان 'ঈমানুন' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'ঈমানুন্' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আমান দেনা' বা 'নিরাপত্তা দেওয়া' মুমিন যেহেতু উত্তম আকীদা বা বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকে চিরকালের জন্যে আজাবমুক্ত করতঃ নিরাপত্তা লাভ করে। এইহেতু, উত্তম আকীদা বা বিশ্বাস গ্রহণের নাম 'ঈমান'। এইস্থানে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কোরআনে কারীমের মুসলমানকে 'মুমীন' বলা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তায়ালাকেও 'মুমিন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানের 'মুমিন' হওয়ার অর্থ এই যে, 'মুমিন' নিজেই নিজেকে চিরকালের জন্যে আজাবমুক্ত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার মুমীন হওয়ার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌পাক নিজ করুণা ও অনুগ্রহের দ্বারা ঈমানদার বান্দাহ্‌গণকে দোজখের আজাব হইতে চিরতরে মুক্ত রাখেন, নিরাপত্তা দান করেন। ঈমান শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইল মজবুত করা এবং ভরসা রাখা। যেহেতু, মুমিন নিজ আক্বীদার উপর মজবুত অর্থাৎ, আপন দৃঢ়-বিশ্বাসের উপর অটল-অনড় এবং পূর্ণ ভরসা বা আস্তা লাভ করিয়া থাকে। এইহেতু, তাহাদিগকে মুমিন বলা হয়। পক্ষান্তরে, কাফের সর্বদা পেরেশান থাকে, এইজন্যে ইহাদেরকে মুমিন বলা যায় না। শরীয়তের পরিভাষায়, ঈমানের অর্থ হইল– যে সকল কথা ও বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা জানা যায় যে, উহা দ্বীনে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত, ঐ সমস্ত বিষয়াদির উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, এবং মুখে স্বীকার করা। কিন্তু দ্বীলের বিশ্বাসই আসল ঈমান বা ঈমানের মূল। এবং মুখে প্রকাশ করা ইসলামের

আহ্কাম বা আদেশসমূহ জারী করার শর্ত মাত্র। আমল ধর্ম নহে। অর্থাৎ নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাত, টুপী-দাড়ী-পাগড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, পর্দা-পুশিদা ইত্যাদি নেক-আমলসমূহ ধর্ম নহে, ধর্মের অংশও নহে। যদি আকীদা-বিশ্বাস ভাল থাকে, আমল করেনা অথবা খারাপ আমল করে তবু সে মুমীন। এইজন্যেই, আয়াতে কারীমায় ঈমানের পর নামাজের কথা বা আমলের উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি 'আমল' ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হইত কিংবা ঈমানের অংশ হইত তবে ঈমানের পরে আমলের আলোচনার কোন প্রয়োজনই হইত না। কাজেই, শরাবখোর, এবং চুরি-ডাকাতি জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের যদি আকীদা ভাল থাকে তবে তাদের মুমীনই বলিতে হয়। কাফের বলা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি কোন নামাজী পরহেজগার ব্যক্তির আকীদা নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাকে আর মুমীন বলা যায় না; নিশ্চয়ই সে কাফের। কোরআনে কারীমে আছে–

و ان طائفَتَانِ منَ الْمُؤْمنيْنَ اقتَتَلُوْا

'ওয়াইন্ ত্বায়েফার্তানে মিনাল্ মুমেনির্নাক্তাতালু' অর্থাৎ, যদি মুসলমানদের দুই দলে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয় শেষ পর্যন্ত। লক্ষ্যণীয় যে, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি-হানাহানি ইত্যাদি হারাম। কিন্তু, আল্লাহ্পাক এহেন হারাম কাজ বা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মুমিন বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন নেককাজ করিল, বন্দেগী করিল কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ, মরনের সময় তাহার আকীদা নষ্ট হইয়া যায় তবে নিশ্চয়ই সে বেঈমান, ঠিকানা তার জাহান্নাম। যেমন– ইবলিছ মালাউনের শয়তান ও মরদুদ্ হওয়া এবং 'বাল্আম' ইব্নে 'বাউরার' ঘটনা। এক্ষণে, এই ব্যাখ্যার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান যুগে যে সব নূতন নূতন দল-উপদল উদ্ভাবিত হইয়াছে– যথা, খাকছার বাহায়ী, কাদীয়ানী, জমাতে ইছলামী, দেওবন্দী ও নব-তবলীগী; এদের কারও কারও ধারণা, ঈমান শুধু 'খেদমতে খাল্ক' বা সৃষ্টির সেবামাত্র; বিশুদ্ধ আকীদার কোন আবশ্যক নাই। ইহারা মারাত্মক ভুলের জগতে রহিয়াছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ঈমান অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকীদা হইল মূল এবং আমল উহার ফলস্বরূপ। বৃক্ষে ফল তখনই আসে যখন উহার মূল বা শিকড় ঠিক থাকে। বস্তুতঃ ঈমান ও আকীদাই ধর্ম, যাহা মানবের দ্বীন ও দুনিয়ায় ইহকাল ও পরকালে কাজে আসে।

ঈমানকে আমলের মধ্যে শামিল করা অজ্ঞতা বা পাগলামী ছাড়া কিছুই নহে; বরং তাহা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কোরআনে পাকে আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন ঃ "যদি তোমরা আমার নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে বড় করিবে তবে তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ হইয়া যাইবে।" ঈমান যদি কেবল আমলেরই নাম হইত তবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সাধারণ বেয়াদবীর দ্বারা আমল বরবাদ কেন হইল? একথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, মুমীনের জন্যে আমলের দরকার নাই। নেক আমল অবশ্যই দরকারী। যে ব্যক্তি নিজ আকীদা বিশুদ্ধ করার

পর আমল ও আখলাককে দুরস্ত করিল না সে যেন ফলশূন্য বৃক্ষের ন্যায়।

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামের অর্থ সেজদায় মস্তক অবনত রাখা অর্থাৎ বন্দেগী করা। ইসলাম জাহেরী জিনিস আর ঈমান বাতেনী বিষয়। এইহেতু, যদি কাহারও আকায়েদ বিশুদ্ধ না হয় তবু সে নিজেকে মুমীন বলিয়া প্রকাশ করে। যেমন মুনাফীকরা কেবল মুসলমানই ইহয়াছিল, মুমীন হয় নাই। অনুরূপভাবে, যদি কোন লোক ঈমান গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের ঈমান প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলনা, সে ব্যক্তি মুমীন হইল বটে, মুসলিম হইলনা। আবার যে ব্যক্তির আক্বায়েদও বিশুদ্ধ হইল এবং ঈমানের স্বীকৃতিও প্রকাশ করিল। কিন্তু আমলকে দুরস্ত করিল না সে ফাছেক। আর যে ব্যক্তি নিজের আমলকেও দুরস্ত করিয়া লইয়াছে সে-ই মুত্তাক্বী বা পরহেজগার। স্মরণ রাখিবেন! জানা এবং চিনা এক কথা আর মান্য করা ভিন্নকথা। কাজেই, হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে চিনা ও জানার নামই ঈমান নহে; বরং তাঁহাকে মান্য করার নামই ঈমান। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে– يعرفونه كما يعرفون ابناءهم অর্থাৎ, মক্কার কাফেররা হুজুর পোর-নূর মোহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে চিনিত, জানিত; কিন্তু তবু কাফেরই রহিল। এইহেতু যে, তাহারা হুজুরকে মানিত না। মান্য করা তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা– (১) শুধু ভয়ের কারণে মান্য করা, (২) কেবল লোভের বশবর্তী হইয়া মান্য করা। মুনাফিকরা কেবল ভয়ে ভীত হইয়া এবং লোভের বশবর্তী হইয়াই মানিত। (৩) অন্তরের ভালবাসার সহিত মান্য করা। উহাই ঈমান। উহাই এইস্থানে বুঝানো হইয়াছে।

গায়েব ঃ গায়েব অর্থ অদৃশ্যবস্তু। গায়েবের পারিভাষিক অর্থ হইল যাহা জাহেরী বা বাতেনী কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না। জ্ঞান-বুদ্ধিরও অগোচরে যাহা। অর্থাৎ, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতির দ্বারা যাহা অনুভব করা যায়না। গভীর চিন্তা ফিকির বা অনুধ্যানের ফলে জ্ঞানের সীমারেখায় আসিতে পারে। গায়েব দুই প্রকার ঃ- (১) যাহার কোন দলীল-প্রমাণ নাই। যেমন– কাহারও মৃত্যুর সময়, কিয়ামত দিবসের তারিখ, মাতৃ-গর্ভের সন্তান (ছেলে বা মেয়ে; জীবিত কিংবা মৃত)। এই সমস্ত বিষয় দলীল দ্বারাও বুঝে আসে না। উহারই নাম মাফাতিহুল গায়েব–গায়েবের কুঞ্জি। কোরআনে কারীমে এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে– عنده مفاتيح الغيب অর্থাৎ "গায়েবের কুঞ্জি বা চাবিসমূহ আল্লাহ্তায়ালারই নিকটে।" ঐ গায়েবকে কেহ স্বাভাবিকভাবে কিংবা নিজের ইচ্ছায় অবগত হইতে পারে না। আল্লাহ্পাক যাঁহাকে অবগত করান তিনিই কেবল জানিতে পারেন। যেমন– আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং খালেছ আওলিয়ায়ে কেরামগণ ঐ স্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব যাহার দলীল প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে। অর্থাৎ দলীল প্রমাণে যাহা অবগত

হওয়া যায়। যেমন- আল্লাহ্পাকের 'জাত' ও 'ছিফাত' নবীগণের 'নবুওয়ত' এবং তদ্‌সম্পর্কিত হুকুম আহ্‌কাম ইত্যাদি। এই শ্রেণীর গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় গভীর চিন্তা-ফিকির বা ধ্যান ও গবেষণার ফলে অবগত হওয়া যায়, উপলব্ধি করা যায়। নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্পাককে আমরা দেখিতে পাইনা বটে; কিন্তু বিশ্বনিখিলের সমস্ত সৃষ্টি তথা প্রতিটি লতা-পাতা পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। এইস্থানে গায়েবের দ্বারা এই বিষয়টিই প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে, আয়াত শরীফের অর্থ এই হইবে মোত্তাক্বী ঐ লোককে বলে যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত গায়েবের উপর ঈমান রাখে যাহা দলীল দ্বারা জানা যায়। আল্লাহ্তায়ালার জাত ও ছিফাত, নবীগণের নবুওয়ত, কিয়ামত, হিসাব-কিতাব, শাস্তি ও পুরস্কার, এবং বেহেশ্‌ত দোজখ প্রভৃতি ঐ গায়েবের মধ্যে শামিল রহিয়াছে। যে কেহ এই সমস্ত গায়েবী বিষয়ের কোন একটি অস্বীকার করিবে কাফের হইয়া যাইবে।

তফছীরে রুহুল বয়ানে আছে গায়েব দুই প্রকার ঃ- ১নং– যাহা তোমার নিকট হইতে গায়েব। যেমন– 'আলমে আরওয়াহ্' বা রুহের জগত যেখানে পূর্বে তোমরা অবস্থান করিতে, এখন এইস্থানে আসিয়াছ। কাজেই, তাহা তোমাদের নিকট হইতে গায়েব রহিয়াছে। ২নং– গায়েব তাহা যাহার নিকট তুমি গায়েব রহিয়াছে। তিনি তোমার নিকটে অথচ তুমি দূরে। যেমন- আল্লাহ্পাক। আল্লাহ্পাক আমাদের গর্দানের শাহ্‌রগের চাইতেও অধিকতর নিকটে অথচ আমরা আল্লাহ্পাক হইতে দূরে।

ইয়ার নজদিকতর আ্যমান্ বমান্ আস্ত
দীনে আজিবতর কে আয্ওয়ায়ে দূরম্।।

বর্ণিত আয়াত শরীফের ৩টি অর্থ ঃ- ১নং এই যে, ঐ গায়েবের উপর ঈমান আনয়ন করা। আল্লাহ্পাক, বেহেশ্‌ত-দোজখ ইত্যাদি না দেখিয়া মানা ও বিশ্বাস করা। ২নং এই যে, ঐ গায়েব অর্থাৎ অন্তর দ্বারা ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা। জবান জাহেরী আর দ্বীল বা অন্তর বাতেনী জবান দ্বারা তো মুনাফিকরাও মানিত বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহা গ্রহণযোগ্য হয় নাই কেননা তাদের মধ্যে ঐ গায়েব অর্থাৎ দ্বীলের দ্বারা বিশ্বাস ছিল না। ৩নং এই যে, গায়েবের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমানদের অগোচরেও বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান রাখা। মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্মুখে বলিত যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বলিত 'আমরা তোমাদের দলেই আছি।' অতএব, আয়াত শরীফের মর্মে ইহাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মুমেন ঐ ব্যক্তি যে সর্বাবস্থায় অর্থাৎ, প্রকাশ্য ও গোপনে ঈমানদার বলিয়া পরিগণিত হয়।

ফায়দা ঃ ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, গায়েবের উপর অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়বস্তুর উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করাই বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য। জাহেরী বিশ্বাসের নাম ঈমান নহে। কোরআনে পাকের জাহেরী

অক্ষরসমূহ মানিয়া লওয়া যে, ইহা একটি কিতাব, আরবী ভাষায় ঢাকার অমুক প্রেসে অমুক মূল্যবান কাগজে ছাপানো একথা ঈমান নহে। কেননা এ কথার দ্বারা কোরআনে পাকের কেবল জাহেরী অবস্থারই স্বীকৃতি প্রমাণ পায় বাতেনী গুণাবলীর নহে। পক্ষান্তরে, কোরআনে পাকের বাতেনী গুণাবলীর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান। তাহা এই কোরআনে পাক আল্লাহ্পাকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে। জিবরাঈল আমীন আনিয়াছেন এবং হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সমস্ত গুণাবলী কোরআনে পাকের জাহেরী নহে, বাতেনী। এই গুণাবলী জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না। তদ্রূপ, হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার জাহেরী গুণাবলী মানিয়া লওয়ার নাম ঈমান নহে। যথা– হুজুর পাক সাধারণ মানুষের মত ছিলেন, মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদীনা মুনাব্বারায় বসবাস করিয়াছিলেন। ছাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ্র সন্তান এবং হজরত আমেনা খাতুন রাঁদিয়ল্লাহু আন্হার চক্ষের পুতুলী, কলিজার টুকরা ছিলেন আমাদের মত পানাহার করিতেন যেহেতু এই সমস্ত জাহেরী গুণাবলী ছিল এবং এইগুলি কাফেররাও মানিত; কাজেই এই সমস্ত জাহেরী বিষয়ের উপর ঈমান নির্ভর করেনা। বরং হুজুর আলাইহিচ্ছালামের বাতেনী গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্র রাছুল আল্লাহ্পাকের প্রিয় মাহবুব তখ্ত ও তাজের মালিক, গোনাহ্গার উম্মতের সুপারিশকারী, নিখিল সৃষ্টির রহমত হায়াতুন্নবী হাজির ও নাজির গায়েবের খবর দাতা ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহিচ্ছালাম। এই সমস্ত হুজুরে পাকের বাতেনী গুণাবলী, জাহেরী অবস্থায় অনুভব করা যায় না। এইহেতু, রাছুলে পাককে তাঁহার এই সকল গুণাবলীসহ মানাই হইতেছে 'ঈমান বিল্ গায়েব'। পক্ষান্তরে, ওহাবী ও দেওবন্দীদের হুজুরপাক আলাইহিচ্ছালামকে মানুষ প্রমাণ করিবার বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগা বেদ্বীনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হুজুরকে আমাদের মত মানুষ মানা ঈমান নহে। বরং তাঁহাকে নূরে খোদা রহমতে আলম মানা ঈমান, মোস্তাফা ও মোরত্বাদা মানা ঈমান, ছাইয়্যেদুল মুরছালীন্ রাহ্মাতুল্লিল আলামিন ও শাফীউল মুজনেবীন, মানা ঈমান। এই জন্যে কলেমা শরীফে পাঠ করা হয়–

محمد رسول الله 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'। محمد بشر 'মোহাম্মাদুন বাশারুন নহে'। অর্থাৎ কলেমা শরীফে একথা বলা হয় নাই যে, মোহাম্মদ আলাইহিচ্ছালাম আমাদের মত একজন মানুষ। বরং হক কথা এই যে, আল্লাহ্কে কেবল সৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে মানাই ঈমান নহে। কেননা, আল্লাহ্পাকের খালেক ও রাজ্জাক হওয়া–স্রষ্টা ও লালন-পালনকারী হওয়ার যে গুণ তাহা জাহেরী বরং আল্লাহ্পাককে 'রাব্বে মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ' মানা অর্থাৎ মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রতিপালক মানাই ঈমান। এইজন্যে আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন قل هو الله احدٌ 'ক্বোলহুয়াল্লাহু আহাদ্' যাহার

দ্বারা জানা গেল যে, মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াছাল্লামের মাধ্যমে যে 'তৌহিদ আসিয়াছে,উহা মানাই ঈমান। আরও ফরমাইয়াছেন-· بَنِى اٰدَمَ مِن ظُهُورِهِم
وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن 'ওয়া ইজা আখাজা রাব্বুকা মিনবাণী আদামা মিন্ জুহুরিহিম' যাহার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্পাক মিছাকের দিন সমস্ত আওলাদে আদমের নিকট নিজের পরিচয় এমনিভাবে দিয়াছেন যে, 'আমি (আল্লাহ্) মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ-র রব'। এই সমস্ত বিষয় 'ঈমান বিল্ গায়েবের' মধ্যে শামিল।

রাব্বুল এজ্জাত জাল্লা শানুহু স্বীয় মাখলুকাতের মধ্যে গায়েব ও শাহাদাত অর্থাৎ জাহের ও বাতেন রাখিয়াছেন। যথা– আমাদের শরীর জাহের এবং কাল্ব (দ্বীল) ও রুহু বাতেন। বৃক্ষ, ডাল-পালা এবং পাতা, ফুল-ফল জাহের কিন্তু উহার মূল ও বৃক্ষে সঞ্চালিত রস যাহা শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায় উহা বৃক্ষের মধ্যে গায়েব বাতেন। তদ্রূপ, ঈমানের জন্যেও গায়েব ও শাহাদাত বা জাহের ও বাতেন রহিয়াছে। ইবলিছ শুধু আদম আলাইহিচ্ছালামের জাহেরী অবস্থা তথা শরীরের গঠন দেখিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বাতেনী গুণাবলী 'খেলাফতে ইলাহীয়া' দেখে নাই। এইজন্যে ইবলিছ মরদুদ ইহয়াছে। এক্ষণে, আজকাল যাহারা হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার বাতেনী গুণাবলী না দেখিয়া কেবল হুজুরের জাহেরী 'বাশারিয়াতকেই দেখে এরা ইবলিছেরই মতন বদনছীব ও হতভাগ্য। এইহেতু কোরআনে কারীমে ইরশাদ ইহয়াছে–

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ 'ইউমিনুনা বিল্ গাইব'।

কোরআনের জাহেরী শব্দগুলি জাহের এবং উহার কালামে এলাহী বা 'আল্লাহ্র কালাম' হওয়া বাতেন। এক্ষণে, যাহারা হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে কেবল বাশার কিংবা হজরত আবদুল্লাহর পুত্র অথবা আরবী ও হাশেমী হওয়া মানিয়া লয় তাহারা মুমিন নহে। এই জাহেরী গুণাবলীতো আবু জাহেলও জানিত ও মানিত। বরং হুজুরপাককে নবী রাসুল, শাফী এবং খাতামুল্ আম্বিয়া মানা ঈমান এই সমস্ত হুজুর পাকের বাতেনী গুণাবলী।

প্রশ্ন ঃ গায়েবী জিনিসের উপর ঈমান আনা জরুরী কেন?

উত্তর ঃ ঈমানের হাকিকত এই যে, আল্লাহ্ ও রাসুলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখা। কোন জিনিসকে দেখিয়া বা শুনিয়া সকলেই মানিয়া থাকে। কিন্তু যে সব জিনিস গায়েব বা অদৃশ্য অর্থাৎ, দৃষ্টির বাহিরে যাহা অবস্থিত এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির যাহা অগোচরে ঐ সকল গায়েবী জিনিসসমূহকে শুধু এই বলিয়া মনিয়া লওয়া যে, উহা রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন। ইহা ঐ কথারই দলিল যে, তাহার দ্বীলের মধ্যে এতাআতে 'মোস্তফা' অর্থাৎ রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার আনুগত্য বা গোলামী রহিয়াছে। দ্বীলের বন্দেগী ইহাই।

মৃত্যুর সময় আজরাঈলকে দেখিয়া কিংবা কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিমদিকে সূর্যকে উদয় হইতে দেখিয়া কেহ ঈমান আনিলে তাহা কখনো কবুল হইবে না, গ্রহণযোগ্য হইবেনা। কেননা, তাহাতে নবীগণের খবরের উপর আস্থা বা বিশ্বাস না হওয়ায় এবং 'ঈমান বিল্ গায়েব' -এর পরিবর্তে স্বচক্ষে দেখিয়া মানিতে বাধ্য হওয়ায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঈমানের জান ইহাই যে, রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার খবরকে নিজের চাক্ষুষ দর্শন কিংবা অনুভূতি প্রভৃতি হইতে অধিকতর বিশ্বাস ও ভরসাযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা যদি আমরা স্বচক্ষে দেখি যে 'এই সময় দিন আর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমান যে, 'এই সময় রাত্রি' তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, 'এই সময় রাত্রি' এবং আমাদের চক্ষু মিথ্যা। নবীয়ে পাকের ফরমান সত্য। কেননা, আমাদের চক্ষু সহস্র প্রকারের ভুলের মধ্যে নিপতিত; এবং আল্লাহ্র নবী ভুল-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র। ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াছাল্লিম। কবির ভাষায়– কি সুন্দরই না ব্যক্ত হইয়াছে–

আগার শাহে রোজে রা গুইয়াদ শবাস্ত ইঁ
বিবায়াদ গোফ্ত্ ইঁনাক শাহ্ ও পর দিঁ।।

অর্থাৎ, যদি রাসুলে পাক দিনকে রাত্রি বলিয়া ঘোষণা করেন তবে আমাদের উপর ফরজ হইয়া যাইবে যে, দিনকে রাত্রি বলিয়া মানিয়া লওয়া।

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, ছাহাবায়ে কেরামের ঈমান দুরস্ত নহে কেননা, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছেন; অথচ না দেখিয়া ঈমান আনা জরুরী ছিল।

উত্তর ঃ ছাহাবায়ে কেরাম নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জাহেরী শরীর মোবারক দর্শন করিয়াছেন সত্য কিন্তু উহাতে ঈমান নির্ভর করে না। ঈমান তো হুজুরেপাকের নবুওয়ত এবং বাতেনী গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। আর উক্ত বাতেনী গুণাবলী ছাহাবায়ে কেরামের নজর হইতে গোপনে ছিল। মুজেজাসমূহ দেখায় নবুওয়ত অনুভব করা যায় না। যেমন, মখলুক দেখিয়া খালেককে অনুমান করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ তবে তো নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে মুমিন বলা যায় না; কেননা, নবীজীর জন্যে ঈমানের কোন জিনিসই গায়েব নহে। নবীজী আল্লাহ্পাককে দেখিয়াছেন, ফেরেশতাগণকেও দেখিয়াছেন। কোরআন নাযিল হইবার সময় উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আর বেহেশ্ত-দোজখ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। নবুওয়ত তো তাঁহার নিজেরই গুণ; যাহা ছিল তাহার এলেম। যখন তাঁহার জন্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন কিছুই গায়েব রহিল না তখন তাঁহার ঈমানের কী অবস্থা?

উত্তর ঃ এই সমস্ত আলোচনা কেবল মুমিনের জন্যেই ছিল। রাসুলেপাক

তো আইনে ঈমান স্বয়ং ঈমান। তাঁহাকে জানা ও চিনার নামই ঈমান। সকলেই মুমিন আর নবীজী ঈমান, ঈমানের মূল। সকলেই আরেফ, নবীজী এরফান। সকলেই ছাদেক এবং নবীজী আপাদমস্তক ছিদ্‌ক্। সকলেই আলেম আর নবীজী আপাদমস্তক এলেম-এলমের মূল। সবাই কাছেদ নবীজী মন্‌যিলে মকছুদ। সবাই ত্বালেব, নবীজী মাত্বলুব। নবীজী সকলেরই চরম চাওয়া ও পাওয়ার পরম আকাঙ্খিত ধন। তাহাকে নিজেদের উপর কেয়াছ করা কিরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়? নবীয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে এইরূপ মুমিন বলা হয় যেইরূপে আল্লাহ্ তায়ালাকে মুমিন বলা হয়। মুমিন একটি শব্দ বটে, কিন্তু ইহার অর্থ বহু ব্যাপক। ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারিক্ ওয়াছাল্লিম। একটি নুক্‌তা বা রহস্য ঃ তফছীরে কবীর ও তফছীরে আজিজীর মধ্যে আছে মছনদে ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বলের বর্ণিত হাদিছ হারেছ ইব্‌নে কায়ছ হজরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট আরজ করিলেন বড় আফছুছ ও পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এক নিয়ামত পাইয়াছ, যাহা আমরা পাই নাই। অর্থাৎ তোমরা নবীজীর জিয়ারত পাইয়াছ, আর আমরা সেই নিয়ামত হইতে বঞ্চিত। হজরত ইব্‌নে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন– নবুওয়তে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সকলের জন্যেই জাহের; কিন্তু "হে হারেছ! তোমাদের ঈমান বড়ই কামেল বা পরিপূর্ণ। কেননা, আমরা নবীজীকে দেখিয়া ঈমান গ্রহণ করিয়াছি আর তোমরা না দোখিয়া ঈমান আনিয়াছ।" অতঃপর, তিনি ঐ আয়াত ('ঈমান বিল গায়েব'-এর) শরীফ পাঠ করিলেন। তফছীরে আজিজিতে আবু দাউদ হইতে বর্ণিত আছে–এক ব্যক্তি ছাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল– তুমি কি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাল্লামকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন– হ্যাঁ। আবার ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– তুমি কি নবীজীর সহিত কথাবার্তা বলিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন– হ্যাঁ। পুনরায় ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– তুমি কি তোমার এই হাতের দ্বারা রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নিকট বয়াতও গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন– হ্যাঁ। অতঃপর ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজ্‌দের হাল জারি হইয়া গেল। এবং ঐ ব্যক্তি বেহুঁশ অবস্থায় বলিতে লাগিল– 'তোমরা কতই না সুনছিব– কতইনা ভাগ্যবান।' ছাইয়্যেদেনা ইব্‌নে উমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাহার এ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন– আমি তোমাদিগকে একটি হাদিস শুনাইব যাহা আমি রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পাক জবানে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি– হুজুরে পাক ইরশাদ করিয়াছেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আমাকে দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে এবং বড়ই সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আমাকে না দেখিয়াই ঈমান আনিয়াছে। এই হাদিসসমূহের দ্বারা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ বর্ণিত আছে যে, কতক আওলিয়া আল্লাহ্ এবং ছাহাবায়ে কেরামগণের উপর সমস্ত গায়েব জাহের হইয়া যাইত। যেমন– হজরত জায়েদ রাদিয়ল্লাহু আন্‌হু হুজুরেপাকের নিকট বলিলেন– 'বেহেশত-দোজখের সমস্ত তব্‌কাগুলি আমার সামনে হাজির।' হজরত গাওছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বালিয়াছেন 'আমি আল্লাহ্‌র সমস্ত শহরগুলি এমনভাবে দেখিতেছি যেমন কয়েকটি সরিষার দানা।' ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের গায়েবের উপর ঈমান হাছেল হয় নাই। কেননা, কোন জিনিস যখন তাহাদের নজর হইতে গায়েবেই রহিল না তবে গায়েবের উপর ঈমান কিরূপে হইবে?

উত্তর ঃ দেখিয়া ঈমান আনা এক কথা আর ঈমান আনিবার পর দেখা ভিন্ন কথা। দেখিয়া ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহারা গায়েবের উপর ঈমান পূর্বেই আনিয়াছিলেন। তারপর 'নূরে ঈমানী' বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাহারা গায়েবের বিষয়বস্তু দেখিতে পান। এই জন্যে তাহাদের ঈমান বিল গায়েব উচ্চ শ্রেণীর হাছেল হইয়াছে। এ বিষয়টির সমর্থন হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের একটি ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। একদা হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহ্‌পাকের দরবারে আরজ করিলেন– 'হে আল্লাহ্! মৃতকে কেমন করিয়া জিন্দা করিবে, আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে উত্তর আসিল– او لم تؤمن 'আ-ওয়ালাম্ তুমিনু'-তুমি কি ইহাতে ঈমান আন নাই? ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম উত্তরে বলিলেন হ্যাঁ, ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু 'দ্বীলের শান্তি' ও 'হক্কুল ইয়াকীন' হাছিল করিতে চাই। লক্ষ্যণীয় যে, হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের ঈমান তো পূর্বেই হাছেল হইয়াছিল পরে এনকেশাফ্ বা প্রকাশ হইয়াছে।

ফায়দা ঃ এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, এল্‌মে গায়েব ব্যতীত ঈমান হাছেল হয় না। কেননা, ঈমান একীনের নাম। একীন এলমের শেষ দরজা। যদি কাহারও বাতেনী এলেম না থাকিবে তবে একীন হাছিল হইবে। আমরা কিয়ামত, বেহেশ্‌ত–দোজখ আল্লাহ্‌র জাত ও ছিফাতকে জানি; তবেই তো উহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আর এই সমস্ত জিনিস গায়েব বা অদৃশ্য এবং এই সমস্ত গায়েব বা বাতেনী জিনিস সম্পর্কে জানাই এল্‌মে গায়েব। তফছীরে কবীরে এই স্থানে লিখিত আছে– প্রত্যেক মুসলমান বলিতে পারে, "আমি এলমে গায়েব জানি।" কিন্তু এলমে গায়েব জানিবার দুইটি প্রণালী রহিয়াছে। (এক) শুনিয়া শুনিয়া জানা; (দুই) দেখিয়া জানা। শুনিয়া যাহা জানা যায় তাহা 'এল্‌ম বিল্ গায়েব' বলা হয়। যেমন– আমাদের জন্যে কিয়ামত, বেহেশ্‌ত-দোজখ ইত্যাদি গায়েবী জিনিসের এলেম নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, তাই আমরা জানিয়াছি এবং দেখিয়া জানাকে 'এল্‌মুল গায়েব' বলা হয়। যেমন- আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের এলেম। এইহেতু, ছুফিয়ানের কেরাম এই আয়াতে করিমার অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন– মুত্তাক্কী ঐ ব্যক্তি যে, ঈমান

আনিয়া থাকে ঐ গায়েবী নূরের দ্বারা যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং ইহার প্রমাণ ঐ হাদীছ হইতে পাওয়া যায় যে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নূরের দ্বারা দেখিয়া থাকে।

আয়াত শরীফ ঃ و يقيمون الصلوة 'ওয়া ইউকিমুনাসসালাত'

তরজমা ঃ- এবং নামাজ কায়েম করিবে।

এইস্থানে মোত্তাক্বীনের আলোচনা হইতেছে মোত্তাক্বী ঐ ব্যক্তি যাহার ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ রহিয়াছে। ঈমানের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এক্ষণে, আমলের আলোচনা আরম্ভ করা গেল। যেহেতু আমলের মধ্যে নামাজ সব চাইতে উৎকৃষ্ট আমল; এইহেতু প্রথমেই আসে নামাজের আলোচনা। কতিপয় কারণ ঈমান আমলের অগ্রবর্তী। প্রথমতঃ ঈমান আমলের উৎস বা মূল সে কারণে প্রথমে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঈমান ক্বাল্ব্ বা দ্বীলের কর্ম আর আমল ক্বাল্ব বা দেহের কর্ম। দ্বীল্ হইতেছে বাদশাহ্ এবং দেহ বা শরীর উহার প্রজা। এই জন্যে দ্বীলের কাজ দেহের কাজের চাইতে উত্তম। তৃতীয়ত ঃ ঈমান সমস্ত পয়গাম্বরগণের ধর্মেই এক রকম। কেবল আমলের পার্থক্য হইয়া থাকে। এবং সর্বক্ষণ স্থায়ী জিনিস পরিবর্তনশীল জিনিস অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে। চতুর্থত ঃ ঈমান আনয়ন করা ইসলামের মধ্যে প্রথম হইতেই ফরজ ছিল; নামাজ, যাকাত প্রভৃতি পরবর্তী সময়ে ফরজ হইয়াছে। নামাজ মেরাজ শরীফে ফরজ হইয়াছে। অবশিষ্ট আমলসমূহ উহারও পরে হইয়াছে। পঞ্চমতঃ আমল মৃত্যুর পর শেষ হইয়া যায়। কিন্তু, ঈমান মৃত্যু এবং কবর-হাশর মিযান-পুলছেরাত প্রভৃতি সব জায়গায় সঙ্গে অবস্থান করে। ষষ্ঠতঃ ঈমান আনা সকলেরই উপর ফরজ কিন্তু আমল সকলের উপর ফরজ নহে। ঈমান আনয়ন করা কাফেরের উপরও ফরজ। নাবালেগ ছেলে-মেয়ে এবং পাগল পিতা-মাতার অধীনে থাকায় মুমিন ঈমান সকল মুসলমানের উপর সর্ব অবস্থায় ফরজ কিন্তু নামাজ যাকাত ইত্যাদি আমল কাফেরের জন্য ফরজ নয় নাবালেগ ছেলে-মেয়ে এবং পাগলের জন্যে ফরজ নহে। তদ্রূপ, নামাজ-রোজা হায়েজ-নেফাছ অবস্থায় মেয়েলোকদের উপর ফরজ নহে। যাকাত ও হজ্জ গরীবলোকের উপর ফরজ নহে। এই সমস্ত কারণে ঈমান আমলের অগ্রবর্তী এবং আমলের চাইতে বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। আর এই কারণেই ঈমানের প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে বয়ান করা হইয়াছে। এবং ঈমানের পরে নামাজের প্রসঙ্গ। নামাজকে যাকাত হইতে আগে এই জন্য বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নামাজ বদনী এবাদত অর্থাৎ শরীরের বন্দেগী। আর যাকাত মালের এবাদত এবং শরীর মাল বা সম্পদ হইতে নিঃসন্দেহে উত্তম। এইহেতু নামাজ যাকাত হইতে উত্তম। দ্বিতীয়তঃ নামাজ ইসলামের বিধানসমূহের সর্বপ্রথম ফরজ হইয়াছে এবং ইহার পর যাকাত ইত্যাদি ফরজ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্পাক তাহার হাবীব ছারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে আরশে আজিমের উপর ডাকিয়া নিয়া নামাজ দান করিয়াছেন এবং যাকাত ইত্যাদি বাকী আমলসমূহ জমীনের উপর পাঠাইয়াছেন। যাহার ফলে, অবগত হওয়া যায় যে, নামাজ সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও অধিক ফজিলতপূর্ণ। চতুর্থতঃ নামাজ সারাদিনে পাঁচবার পাঠ করা যায়। কিন্তু যাকাত ও রোজা একবৎসর অন্তর। আর হজ্জ সারাজীবনে একবার মাত্র। পঞ্চমত ঃ নামাজ প্রত্যেক গরীব-ধনী, মুছাফীর-মুকীম মুসলমানের উপর ফরজ। কিন্তু যাকাত গরীবের উপর ফরজ নহে; এবং রোজা মুছাফীরের উপর ফরজ নহে। কেননা, মুছাফীর রোজা ক্বাজা আদায় করিতে পারে। ষষ্ঠতঃ নামাজ হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহিচ্ছালাম পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পয়গাম্বরগণই কিঞ্চিৎ পার্থক্য সহকারে নামাজ আদায় করিয়াছেন। কিন্তু যাকাত ও রোজার এই অবস্থা নহে। যেহেতু, হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন, হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম জহুরের নামাজ পড়িয়াছেন হজরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম আছরের নামাজ পাঠ করিয়াছেন; এবং হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম মাগরিবের নামাজ ও হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম এশার নামাজ পাঠ করিয়াছিলেন। তাফছীরে রুহুল বয়ানে এইস্থানে এই বিষয়ে আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

তফছীর ঃ يقيمون ইউক্বিমুনা শব্দ ইক্বামত হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ সোজা করা। আর এইস্থানে বুঝায় নামাজ সর্বদা আদায় করা; নামাজের জাহেরী এবং বাতেনী আদাবের সহিত পাঠ করা। জাহেরী আদাব উহার শর্তসমূহঃ যথা– ফরজ, সুন্নত, ও মোস্তাহাবসমূহ আর বাতেনী শর্ত এই যে, দ্বীলে নম্রতা থাকিবে ও রিয়া থাকিবে না, অর্থাৎ অন্তর বিনম্র ও রিয়া শূন্য হইবে। 'হুজুরী ক্বাল্ব' বিরাজমান থাকিবে। অর্থাৎ, অন্তর সর্বদা আল্লাহ্র দরবারে মোতাওয়াজ্জাহ্ হইবে। এইহেতু, কোরআনে কারীমে যেখানেই নামাজের আলোচনা আসিয়াছে সেই স্থানে 'ক্বায়েম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে কিন্তু পাবন্দীর সহিত আদায় করে না। সে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করে না। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি মোস্তাহাব সময়ে নামাজ আদায় না করে, নামাজের মধ্যে পাক-পবিত্রতার খেয়াল না রাখে নামাজের সুন্নতসমূহের আদায় না করে, কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশে নামাজ পড়ে; সবাই এই আয়াতের বাহিরে। 'ইউক্বিমুনা' শব্দের মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। শরীয়ত ও তরীকতের সমস্ত মাছায়েল উহাতে আসিয়াছে। আল্লাহ্পাক সকলকেই নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুন। ছুফিয়ানে কেরামের নিকট নামাজ কায়েম করা এক কথা, আর নামাজ কায়েম রাখা ভিন্ন কথা। যেমন– ভিত্তি বা বুনিয়াদ ব্যতীত ঘরের দেওয়াল টিকিতে পারে না এবং শিকড় বা মূল ছাড়া বৃক্ষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তেমনি নামাজের দেওয়ালের উপর ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারত

প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে, ঐ নামাজকে দৃঢ়তার সহিত কায়েম রাখে ঐ ব্যক্তি যাহার মধ্যে এশ্‌কে মোস্তফা এশ্‌কে মাহবুবে খোদা বিরাজমান থাকে। তাহার মুখ থাকিবে। কাবার দিকে আর অন্তঃকরণ থাকিবে মদীনা পাকের দিকে। তাহা না হইলে রুকু সেজদায় পরদা পড়িয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক হুজুরী কাল্বসহকারে নামাজ আদায়ের তৌফিক দান করুন। এশ্‌কে মোস্তফা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম ব্যতীত নামাজ সর্বদা ক্বায়েম থাকেনা।

يقيمونَ 'ইউক্বিমুনা' জমার ছিগা দ্বারা ইরশাদ হইয়াছে যাহা দ্বারা ইশারা হয় যে, মুসলমান মিলিত হইয়া জমাতের সহিত নামাজ আদায় করিবে। কোরআনে পাকে এক জায়গায় আছে واركعوا مع الرَّاكعيْنَ 'ওয়ারকাউ মায়ার্‌ রাকেঈন' অর্থাৎ 'নামাজীগণের সহিত নামাজ আদায় কর'। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, জামাতে নামাজ পড়া খুবই জরুরী। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর নিকট পুরুষদিগের জন্যে জামাতে নামাজ পড়া ফরজ। আমাদের নিকট ওয়াজিব। কিন্তু আমাদের নিকটও কতক নামাজ জমাতের সহিত আদায় করা ফরজ। যেমন– জুম্মার নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজ।

صلو او صلى او صلوة ছালাতুন শব্দ ছালয়ুন অথবা ছালবুন শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। ছালয়ুনের অর্থ অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করা বা তাপ দেওয়া। কোরআনে পাক ফরমান– لعلكم تصطلون লাআল্লাহ্‌কুম তাছতালুন্‌।

যেহেতু, বাঁকা বাঁশকে আগুনের তাপ দ্বারা সোজা করা হয়, তদ্রূপ বাঁকা মানুষকে নামাজের দ্বারা সোজা-সরল করা হয়। এইজন্যে ইহাকে 'ছালাত' বলা হইয়াছে। ছালয়ুন-এর দ্বিতীয় অর্থ– দরকারী জিনিস জানা। কোরআনে পাক ইরশাদ করেন– تصلى نَاراً حَاميه তাছ্‌লা নারান্‌ হামিয়াহ্‌।' কাজেই নামাজ ও মুসলমানদের জন্য লাজেম বা অপরিহার্য হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যে ইহাকে ছালাত বলা হইয়াছে। 'ছালবুন'-এর অর্থ ছোতর। যেহেতু নামাজের অবস্থায় ছোতর নড়া-চড়া করে। এইজন্যে ইহাকে ছালাত বলে। কোরআনে কারীমের ছালাত শব্দ পাঁচটি অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা– (১) দোয়ার জন্যে যেমন– و صل عليهم -ছল্লু আলাইহিম (২) তারিফ প্রশংসা যেমন– يتلون فلما بهى و يصلى عليهم ওয়া ইউছাল্লি আলাইহিম, (৩) কোরআনে পাক তেলাওয়াতের জন্য; যেমন–

و يصلون على النبى صلوة من ربهم

(৪) রহমত বুঝাইতে যেমন– وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلوتِكَ

এবং (৫) নামাজ বুঝাইতে; যেমন- اقِيْمُوْا الصَّلوةَ আক্বিমুচ্ছালাত নামাজ কায়েম কর। আসল কথা এই যে, নামাজের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি

জিনিসও মওজুদ রহিয়াছে। যেমন– নামাজে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া বা প্রার্থনা রহিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা রহিয়াছে; তেমনি কোরআন তেলাওয়াতও রহিয়াছে এবং নামাজ পাঠকারীর জন্যে আল্লাহ্‌পাকের রহমতও রহিয়াছে। মোটকথা এইস্থানে উক্ত আয়াত শরীফ ছালাতের মর্ম নামাজেই বুঝাইয়াছে। নামাজ বহু প্রকার ফরজ- পাঞ্জেগানা নামাজ এবং জুম্মার নামাজ, ওয়াজিব বিতির নামাজ ও দুই ঈদের নামাজ; ছুন্নতে মোয়াক্কাদা জহুর ও মাগরেবের ছুন্নত নামাজসমূহ এবং ছুন্নতে গায়েব মোয়াক্কাদা নফল নামাজসমূহ যেমন– আওয়াবিন এশরাক ও চাশতের নামাজ ইত্যাদি। এইস্থানে আয়াত শরীফ মর্মে ফরজ নামাজ বুঝায়। কাজেই, আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় মোত্তাক্বী ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফরজ নামাজ পাবন্দীর সহিত আদায় করিয়া থাকে।

নামাজের ফজিলতসমূহ

নামাজের কিছু ফজিলততো সম্পর্ক আলোচনাতেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে, আরও কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে। (১) নামাজ ফেরেশতাগণের এবাদতের সমষ্টি। কেননা, মোকারব ফেরেশতাগণের মধ্যে কতক ফেরেশতা শুধু রুকুর হালাতে কতক ফেরেশতা শুধু ছেজদার হালাতে এবং কতক শুধু ক্বিয়ামের অবস্থায়, কতক শুধু তছ্‌বীহ্‌ তাহ্‌লিল পাঠরত অবস্থায় রহিয়াছে। রাব্বুল এজ্জাত জাল্লা শানুহু আমাদের নামাজের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় সবই একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কাজেই, যে কেহ এই নামাজের পাবন্দী করিবে মর্যাদার দিক দিয়া সে সমস্ত ফেরেশতার সমান অথবা ফেরেশতাদের চাইতেও উত্তম। (২) নামাজের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির বন্দেগী জমা রহিয়াছে। তাহা এই অবস্থায় যে যাবতীয় বৃক্ষরাজি সর্বক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায়, চতুষ্পদ জন্তুসমূহ সর্বদা রুকুর অবস্থায় এবং মৎস-সর্প বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণিসমূহ সর্বক্ষণ সেজদার হালাতে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ ও এই জাতীয় প্রাণীসমূহ সর্বদা নামাজের বৈঠকের হালাতে রহিয়াছে। মানুষ যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির সেরা, এইহেতু মানুষের এবাদতের মধ্যে এই সকল কিছুরই সমাবেশ রহিয়াছে। (৩) নামাজ মানুষের সকল অবস্থা বিশুদ্ধ রাখে। মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখে। ইহাতো পরীক্ষিত সত্য যে, বড় বড় ফাছেক বদকার লোক যখন বিশুদ্ধ অন্তরে নামাজ পড়িতে শুরু করিয়া দেয় তখন আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমের দ্বারা সর্বপ্রকার গোনাহ্‌ হইতে বাঁচিয়া যায়। (৪) নামাজ শত শত রোগ ব্যাধির প্রতিষেধক। বড় বড় বিজ্ঞ হাকিম ও চিকিৎসাবিদগণ বলিয়া থাকেন যে, ওজু করণেওয়ালা ব্যক্তি মস্তিষ্ক রোগে ভূগিতে খুব কমই দেখা যায়। নামাজী মানুষ অধিকাংশই খোশ-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ হইতে এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতে নিরাপদে থাকে। অনুরূপভাবে, দৈনিক পাঁচবার পাঞ্জেগানা নামাজের কল্যাণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, নামাজী মানুষের কাপড়-চোপড় পাক-পবিত্র থাকে। এইজন্যে নামাজী মানুষ সকল প্রকার অপরিষ্কার ও

অপরিচ্ছন্নতা হইতে রক্ষা পায়। আর অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা বহু রোগ-পীড়ার উৎস (৫) নামাজ সকল প্রকার মছিবতের এলাজ বা প্রতিষেধক। এইহেতু, সকল মছিবতের সময় নামাজ পরিবার আদেশ রহিয়াছে। অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এস্তেস্কার নামাজ পড়িতে হয়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় ছালাতুল কুছুফ বা গ্রহণের নামাজ পড়িতে হয়। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে হাজতের নামাজ পড়িতে হয়। ফলকথা, সমস্ত মছিবতেই নামাজ কাজে আসে। কিন্তু, জ্ঞাতব্য বিষয় হইল, নামাজ কেমন করিয়া পড়িতে হয়? এই সম্পর্কে রুহুল বয়ান শরীফে বর্ণিত আছে– কেহ হজরত হাতেম জাহেদ (রহমতুল্লাহ্ আলাইহে) কে নামাজ আদায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন– যখন নামাজের সময় নিকটবর্তী হয় তখন আমি উত্তমরূপে জাহেরী ও বাতেনী ওজু করিয়া লই। পানি দ্বারা জাহেরী ওজু করি এবং বাতেনী ওজু তওবা দ্বারা। তারপর, সোজা হইয়া যখন জায়নামাজে দাঁড়াই তখন অন্তঃকরণে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া লই যে, কাবাশরীফ আমার সম্মুখে, মাকামে ইব্রাহীম আমার সিনা বরাবর; আল্লাহ্পাক আমার নিকটে যিনি আমাকে সর্বক্ষণ সর্ব অবস্থায় দেখিতেছেন এবং আমি পুলছেরাতের উপর দণ্ডায়মান আমার ডাইনদিকে বেহেশ্ত এবং বামদিকে দোজখ। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে; মালাকুল মওত আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। আর প্রত্যেক নামাজের ক্ষেত্রেই এই ধারণা করি যে, ইহা আমার আখেরী নামাজ অতঃপর আদাবের সাথে তাকবীরে তাহ্রীমা পাঠকরতঃ মর্যাদার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করি। বিনয় ও নম্রতার সহিত রুকু ও কান্নার হালে সেজদায় লুটাইয়া পড়ি। কবুলিয়াতের আশায় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাত পাঠ করি। সর্বশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত ছুন্নাত তরীকায় ছালাম ফিরাই। অতঃপর যখন নামাজ হইতে পৃথক হই তখন উহা কবুল হইবার আশায় এবং কবুল না-হওয়ার আশংকায় মশগুল হইয়া পড়ি। হজরত হাতেম জাহেদ আরও ফরমাইলেন যে, এইরূপে আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ নামাজ আদায় করিয়া থাকি। নামাজের প্রসঙ্গেই ছুফীয়ানে কেরাম বলিয়া থাকেন– হে আল্লাহ্র বান্দা! নামাজের জন্যে নক্ষত্রের আদর্শ অনুসরণ কর, সারা রাত্রি আল্লাহ্র এবাদতে রত থাক। চন্দ্রের আদর্শ নহে যে, রাত্রির কিয়দংশ এবাদত করিবে। যদি তাহাও না পার তবে সূর্যের চাইতে কম হইও না, দিনের বেলায় আলস্য করিয়া না কাটাও।

নামাজের ভেদ ও হেকমতসমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এইজন্যে ফরজ হইয়াছে যে, প্রথমতঃ মেরাজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইয়াছিল। হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের অনুরোধে রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আরজ করায় পাঁচ ওয়াক্তই রহিয়াছে। আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ পাওয়া যায়। কাজেই নামাজ যদিও পাঁচ ওয়াক্তই পাঠ করা হয়, কিন্তু ছওয়াব পঞ্চাশ

ওয়াক্তেরই পাওয়া যায়।

২নং হেকমত ঃ অন্য উম্মতগণ এই নামাজ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে পাঠ করিতেন। কেহ শুধু ফজর, কেহ জোহর কেহ শুধু আছর কেহবা শুধু মাগরিব ইত্যাদি। আল্লাহ্পাক ঐ সমস্ত নামাজসমূহ আমাদের জন্য একত্র করিয়াছেন। ঐ নামাজসমূহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত ছিল। এইহেতু আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্তই রহিয়াছে।

৩নং ভেদ তত্ত্ব ঃ নামাজসমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য হইল এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি হাল বা অবস্থান যেন আল্লাহ্র জিকিরের মাধ্যমে শুরু হউক। এবং রাত্রি ও দিনে মোট পাঁচটি হাল বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এইহেতু, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত হইয়াছে। যেমন– ভোরে উঠিয়াই মানুষের জাগ্রত অবস্থা শুরু হয় ঃ কাজেই সর্বপ্রথম আল্লাহ্পাককে নামাজের দ্বারা স্মরণ করিয়া লওয়া। দ্বিপ্রহরের সময় যাবতীয় কাজ-কারবার হইতে অবসর হইয়া পানাহার করতঃ মানুষ যখন আরাম করিতে যাইবে তখন দিনের দ্বিতীয় অংশে আমাদের দ্বিতীয় হাল উপস্থিত হয়। কাজেই প্রথমেই উচিৎ নামাজ আদায় করা। আছরের সময় প্রায় সমস্ত লোক নিজ নিজ কারবার হইতে পৃথক হইয়া ভ্রমণে বাহির হয়। হাটে-বাজারে তখন ব্যবসার সময়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও শুরু হয় তৃতীয় অবস্থা। এই সময়ও উচিৎ প্রথমেই নামাজ পড়িয়া লওয়া। মাগরেবের সময় দিন যায় রাত্রি আসে; দিনের হাল বদল হইয়া যায়। এক্ষণে, কর্তব্য প্রথমে নামাজ আদায় করিয়া লওয়া। যখন রাত্রিকালে বিছানায় শুইতে যাওয়া হয় তখন দৈনন্দিন জীবনের পঞ্চম অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই নিদ্রা হয়তো জীবনে শেষ নিদ্রাও হইতে পারে কেননা, নিদ্রাও একপ্রকার মৃত্যু। ইহার পর কেয়ামতের দিন উঠিতে হইবে। অতএব, এই হাল শুরু হইবার পূর্বে আল্লাহর বান্দাগণের উচিৎ নামাজ আদায় করিয়া লওয়া। আল্লাহ্র বান্দা! জীবনের এই অবস্থায় নামাজ দ্বারা আল্লাহ্র জিকির করতঃ নিদ্রায় যাও। মনে রাখিবে যে কাজের প্রথম ভাল, সে কাজের শেষও ভালই হইয়া থাকে। দোকানদার ব্যক্তি মনে করে যে, দিনের প্রারম্ভে তাহার প্রথম গ্রাহক যদি ভাল হয় তবে সারাদিনের ব্যবসা ভালই হইয়া থাকে। অতএব, মুসলমানের প্রত্যেক কর্ম আল্লাহ্র জিকিরের দ্বারা শুরু করা উচিৎ। এইজন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রাখা হইয়াছে। নামাজের রাকাত ভিন্ন ভিন্ন হইবার কারণ এই যে, নামাজ হইল পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের স্মৃতি স্মরণ করা। কেননা, হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম ফজরের নামাজ দুই রাকাতই পাঠ করিয়াছিলেন এবং হজরত খলীল আলাইহিচ্ছালাম জহুরের চারি রাকাত পাঠ করিয়াছিলেন। এইহেতু আমরাও তাঁহাদের সেই স্মৃতি রক্ষা করিয়া তাঁহাদের অনুসরণে বিভিন্ন নামাজে বিভিন্ন রাকাত পাঠ করিয়া থাকি। ডাক্তার রোগীর ব্যবস্থাপত্রে বিভিন্ন ঔষধের পরিমাণ বিভিন্ন নির্ধারণ করিয়া থাকেন; কেননা তাহাতে হেকমত নিহিত থাকে। তদ্রূপ, নামাজের বিভিন্ন রাকাত রুহানী চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুযায়ীই

হইয়া থাকে। এই জায়গায় তাফছীরে রুহুল বয়ান্ শরীফে বর্ণিত আছে– বিভিন্ন ফেরেশতার বিভিন্ন পাখা রহিয়াছে। কোন ফেরেশতার দুইটি পাখা, কোন ফেরেশতার তিনটি এবং কোন ফেরেশতার চারিটি পাখা রহিয়াছে। আল্লাহ্পাক নামাজের রাকাত বিভিন্ন রাখিবার অন্যতম কারণ ইহাও যে, নামাজ রুহের বাহু।

কেবলামুখী হওয়ার কারণ

কেবলামুখী হওয়ার কারণ এই যে, কাবা শরীফ সমস্ত জমীনের আসল বা মূল। কেননা ঐ স্থান হইতেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই নামাজীর শরীর উহার আসলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। ইহাতে ঐদিকেও ইশারা হইতেছে যে, নামাজীর দ্বীল কুল্ আলমের আসল অর্থাৎ সৃষ্টিকূলের মূল মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দিকে থাকে। কেননা, মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম রুহের আসল। এইহেতু নামাজী নামাজের মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে আদবের সহিত ছালাম আরজ করে।

আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু এই জন্যেই বলিতে হয় যে, কোন নামাজীকে যদি হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যদি আহ্বান করেন তবে ঐ নামাজীর উপর তৎক্ষণাৎ ওয়াজিব হইয়া পড়ে নবীয়ে পাকের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং খেদমতে হাজির হওয়া। এই বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হইতে চাহিলে গুজরাতের বেনজীর আলেম হাকিমুল উম্মত মুফ্তী আহ্মদ ইয়ার খাঁন সাহেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'জাআল হক' পাঠ করুন।

১নং প্রশ্নঃ কোরআনে পাকের ঐ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে; মোত্তাক্বী ঐ লোকদিগকেই বলা হয় যাহারা নামাজ কায়েম করেন। তবে যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম নামাজ ফরজ হইবার পূর্বে এন্তেকাল করিয়াছেন; অথবা যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবামাত্রই এন্তেকাল করেন তাঁহারা মোত্তাক্বী নহেন। কেননা, তাহারাতো নামাজ কায়েম করেন নাই।

উত্তর ঃ সমস্ত আমলের জন্যে শক্তি শর্তরূপে আরোপিত হয়। অর্থাৎ শক্তির অনুপাতে আমল ওয়াজিব হইয়া থাকে। নামাজও এমনই একটি আমল যাহা আদায়ের শক্তি দেহে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করিবার সময় কিংবা সুযোগ মোটেও পায় নাই তাহার উপর নামাজ ফরজই হয় নাই। লক্ষ্যণীয় যে, মালদার ব্যক্তি মাত্রই দ্বীনের পাঁচটি আরকান আদায় করিয়া থাকেন; আর গরীব লোকজন তিনটি আরকান আদায় করে। যথা– কলেমা, নামাজ ও রোজা। কিন্তু জাকাত ও হজ্জ পালন মালদার বা ধনীদের জন্যে, গরীবের জন্যে নহে। হায়েজ অবস্থায় মেয়েলোক নামাজও পড়ে না। কিন্তু এই সমস্ত এক শ্রেণীর মোত্তাক্বী। কেননা, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি

অনুযায়ী বন্দেগী করিয়া থাকে.। তদ্রূপ, এক ব্যক্তির বয়স ১০০ বৎসর এবং অপর এক ব্যক্তির বয়স ২৫ বৎসর। প্রথম ব্যক্তির এবাদত বেশী হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে একই শ্রেণীর মোত্তাক্বী।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ আমল করা এক কথা আর মানিয়া লওয়া আরেক কথা। 'মোত্তাক্বী' তাহাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি আমলের শক্তি থাকিলে কিংবা সময় পাইলে আদায় করিবে; নতুবা আমলের শক্তির অভাব হইলে কিংবা সময় না পাইলে অন্ততঃ উহা মানিয়া লইবে। যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম নামাজ ফরজ হইবার পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছেন তাহাদেরও এই আক্বীদা ছিল যে, যত আহ্‌কাম আসিবে সবই সত্য; উহা তাহাদের আমলের সুযোগ আসুক বা নাআসুক। গরীব মানুষের এই আকীদা যে, জাকাত ইসলামী ফরজ; যদি কখনো মালদার হই তবে আমার উপরও জাকাত দেওয়া ফরজ হইয়া যাইবে। এইরূপ মানাই তাহার মোত্তাক্বী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। অনেক ছাহাবী সমগ্র কোরআন শরীফ নাযিল হইতে দেখেন নাই। কেননা, তাহারা কতিপয় ছুরাহ্‌ নাযিল হইবার পূর্বেই ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। অনুরূপভাবে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ সমস্ত আম্বিয়াগণের সম্বন্ধে অবগত নহে; কেননা, তাহাদের পরে আরও অনেক নবী আলাইহিমুচ্ছালামের আগমণ হইয়াছে। সেই কারণে একথা বলা যায় না যে, তাহাদের ঈমান অসম্পূর্ণ ছিল, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ যদিও আমরা সমগ্র কোরআন শরীফ এবং সমস্ত নবীগণকে পাইয়াছি। এইহেতু যে, সকলকে তাহারাও মানিত এবং আমরাও মানি। তাহারা এইভাবে মানিত যে কিছু সংখ্যক নবী আগমন করিবেন এবং কতিপয় কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইবে; সমস্তই হক। আমরা এইরূপে মানি যে, যাঁহারা আগমণ করিয়াছেন এবং যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে সবই হক।

২নং প্রশ্ন ঃ এ আয়াতের তফছীর দ্বারা বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজই পড়া দরকার, সুন্নতের কোন দরকার নাই কেননা, মোত্তাক্বী হওয়ার জন্যে তো ফরজ নামাজের পাবন্দীই যথেষ্ট।

উত্তর ঃ সুন্নত ব্যতীত ফরজ অসম্পূর্ণ বরং সুন্নত ব্যতীত ফরজ আদায় হইতেই পারে না। ফরজের সহিত সুন্নতের ঐ সম্পর্ক, যেরূপ সম্পর্ক খাদ্যের সহিত পানির রহিয়াছে। পানি ব্যতীত খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হইতেই পারে না। খাইতেও পারা যায় না। তদ্রূপ, সুন্নত ব্যতীত ফরজ আদায়ও হয় না এবং পাঠ করাও সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ- রুটি পানি ব্যতীত তৈরী করাও যায় না এবং খাওয়াও সম্ভব হয় না। অন্যকথায়, জমিতে ধান ও গম উৎপন্ন করিতে পানির প্রয়োজন। সেইরূপ, ধান হইতে চাউল ও চাউল দ্বারা ভাত প্রস্তুত করিতে এবং গমের আটা দ্বারা রুটি তৈয়ার করিতে অনিবার্যরূপে পানির প্রয়োজন হয়। অপরদিকে রুটি কিংবা ভাত খাইতে বাসিয়াও অনুরূপভাবে পানির প্রয়োজন হয়। খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে গিয়া মাঝে মাঝে পানি পান করিতে হয় এবং

খাওয়ার শেষেও পানির দরকার হয়। তদ্রূপ, ফরজ সুন্নতের দ্বারাই হাছেল হইয়া থাকে। নামাজ পড়িতে গিয়া প্রথমে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠান, কিয়াম, তেলাওয়াত, রুকু, সেজদা, আত্তাহিয়্যাত প্রভৃতির সুন্নত আদায়ের পরই ফরজ আদায় হইবে। অতঃপর এমন কোন ফরজ নাই যাহার সহিত সুন্নত নাই। তদ্রূপ, রোজার জন্য ছেহরী খাওয়া, খেজুর দ্বারা ইফ্তার করা সুন্নত জাকাতের টাকার দ্বারা আহলে কারাবাত বা আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা সুন্নত। বরং ফরজতো আমাদের বালেগ হওয়ার পর ফরজ হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুন্নত আমাদের জন্মলগ্ন হইতেই আরম্ভ হয়, এবং মৃত্যুর সময়ে বরং মৃত্যুর পরেও সুন্নত আমাদের সঙ্গে থাকে। কোন সময় আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় না। জন্ম হইবামাত্রই বাচ্চাকে গোসল দেওয়া, খাত্না করা, আকীকা করা ইত্যাদি সমস্তই সুন্নত। জিন্দেগী যাপন করা উদর পূর্ণ করা, আহার করা, এবং জামা-আছকান, পাগড়ী, জুতা ইত্যাদি পরিধান করা সবই সুন্নত। অধিকাংশ সময় বিবাহ-শাদী এবং বিবি বাচ্চাদের লালন-পালন করা সুন্নত। তদ্রূপ, মৃত্যুর সময় কলেমা পড়া, কাফনের তরতিব দেওয়া, কবরের নক্শা বানান সবই সুন্নত। মৃত্যুর পর খতম পড়া, অর্থাৎ ইছালে ছওয়াব করা সবই সুন্নত। এইহেতু, আমাদের নাম আহ্লে ফরজ নহে, বরং আহ্লে সুন্নত ওয়াল জমাআত। কাজেই যাহার সুন্নত নামাজের মুনকির বা অস্বীকারকারী তাহাদের কর্তব্য বাড়ী-ঘর তৈয়ার না করা, দুই বেলা পেট ভরিয়া পানাহার না করা, ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান না করা; বরং যখন মরিবার উপক্রম হয় তখন যেন জান বাঁচাইবার উদ্দেশে ছোলা বা গম চিঁবাইয়া গিলিয়া লয়। তারপর ভাল পোশাকের পরিবর্তে শুধু নাভি হইতে টাকনু বা গোড়ালী পর্যন্ত নেংটি পড়িতে পারে। পুনরায়, জটিল প্রয়োজন ব্যতীত কখনো যেন বিবাহ-শাদী না করে। আর নিজের নাম যেন কিছুই না রাখে। কেননা, ফরজ তো শুধু এই পর্যন্ত যাহা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা কী রকম আশ্চার্যের কথা। সমস্ত সুন্নত বিনা দ্বিধায় পালন করিয়া চলিবে, অথচ সুন্নত নামাজের বেলায় খুবই কষ্ট হয়। প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখুন, সুন্নত আমাদিগকে মানুষ বানাইয়াছে। আল্লাহ্পাক যেন আমাদিগকে সুন্নতের উপর ক্বায়েম ও দায়েম রাখেন। সুন্নত বর্জনকারী রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। স্মরণ রাখিবেন, সুন্নত ও হাদিছের মধ্যে পার্থক্য দুই প্রকার - প্রথমতঃ হাদিস হেকায়াত বা কাহিনী এবং সুন্নত যাহার হেকায়াত বা কাহিনী বর্ণনা করা যায়। হাদিস ঐ আল্ফাজ বা বাণীমালা যাহাতে হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার আফয়ালে কারীমা বা কর্মাদর্শ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ আল্ফাজ বা বাণীসমূহ হাদিস এবং স্বয়ং হুজুরেপাক যে কর্মাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই সুন্নত। সুতরাং হাদিস 'আম' এবং সুন্নত 'খাছ'। জানিয়া রাখুন হুজুরে পাকের জন্যে কতক বিষয়

খাছ। যথা– নয়জন বিবি একসঙ্গে রাখা, ভেছালের রোজা, মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া এবং উটের পিঠে অবস্থান করিয়া তওয়াফ করা। হাদিস শরীফে এই সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের জন্য এইসব সুন্নত নহে। কেননা, আমরা তাহা পালন করিতে পারিনা। এই জন্যে হাদিস শরীফে আসিয়াছে- عليكم بسنتى 'আলাইকুম বিছুন্নাতী' অর্থাৎ তোমাদের উপর আমার সুন্নত (কর্মাদর্শ) লাজেম রহিল। এইস্থানে بحديثى 'বিহাদিসী' ইরশাদ হয় নাই। এইহেতু, মানুষ আহ্লে সুন্নত' হইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক সুন্নতের উপর আমলকারী; কিন্তু কোন ক্রমেই আহ্লে হাদিস হইতে পারে না। নিজেকে 'আহ্লে হাদিস' বলিয়া স্বীকার প্রকাশ্য মিথ্যা। অন্যথায়, নয়জন বিবি একসঙ্গে রাখিতে হয়।

আয়াত শরীফ ঃ وَ مِمَّا رَزَقْنٰـهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

ওয়ামিম্মা রাজাক্বনাহুম ইউনফিকূন্।

অনুবাদ ঃ এবং আমার দেওয়া রিজিক হইতে আমার রাস্তায় খরচ করিবে।

সম্পর্ক ঃ এইস্থানে মোত্তাক্বীন বা পরহেজগারদিগের গুণাবলীর ধারাবাহিক আলোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈমানের আলোচনা যাহা সমস্ত বন্দেগীর মূল, তারপর নামাজের আলোচনা যাহা সমস্ত আমলের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এবং যাহার সম্পর্ক মুমিন লোকের দেহের সহিত রহিয়াছে। এক্ষণে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আলোচনা আসিয়াছে; যাহার নিবিড় সম্পর্ক মালের সহিত রহিয়াছে। যেহেতু, মানুষ যখন জন্মলাভ করে তখন তাহার নিকট দেহই বিদ্যমান থাকে এবং মাল বা সম্পদ লাভ হয় পরবর্তী সময়ে। এইহেতু, নামাজের আলোচনা সর্বাগ্রে এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার আলোচনা শেষে। দ্বিতীয়তঃ জাকাত নামাজের পরে ফরজ হইয়াছে এইজন্যে জাকাতের আলোচনা নামাজের পরে। তৃতীয়ত ঃ ঈমানের নাযাত; নামাজে মুনাজাত এবং দান-খয়রাতে দারাজাত বা মর্যাদা সম্মান লাভ হয়। অতঃপর দারাজাত বা মান সম্মান নাযাত-মুনাজাতের পরবর্তীতে লাভ হয়। এইজেন্য উহার বয়ান শেষে করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ ঈমান সুসংবাদ, নামাজে কাফ্ফারা এবং দান খয়রাতে পবিত্রতা। পঞ্চমতঃ ঈমানে ইয্যত-সম্মান, নামাজে ক্বোরবত বা আল্লাহ্র নৈকট্য এবং দান-খায়রাতে সমৃদ্ধি হাছেল হয়। আর এ সমৃদ্ধি ঐ দুইটি বিষয়ের পরবর্তীতে লাভ হয়। এইজন্যে ইহার বয়ানও পরেই আসিয়াছে। ষষ্ঠতঃ উক্ত আয়াতে করিমায় চারিটি বিষয়ের আলোচনা আসিয়াছে। যথা– (১) তাক্বওয়া বা পরহেজগারী, (২) ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস, (৩) নামাজ কায়েম করা এবং (৪) দান-খয়রাত করা। আর এই চারিটি গুণ বিশেষভাবে চারিজন খলীফার মধ্যে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ ছিদ্দিকে আকবর, ওমর ফারুক ওছমান গণি এবং মাওলা আলীর মধ্যে ঐ চারিটি গুণ রহিয়াছে। যেহেতু, ছিদ্দিকে আকবর মোত্তাক্বীনগণের

সরদার ছিলেন, ওমর ফারুক মুমিনগণের পেশোয়া, ওছমান গণি নামাজীগণের বাদশাহ্ এবং মাওলা আলী আল্লাহ্র রাস্তায় খরচকারীদের ইমাম ছিলেন। রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুম আজমাঈন (তফছীরে রুহুল বয়ান)।

তফছীর ঃ এই বাক্যে তিনটি শব্দ রহিয়াছে। এই তিনটি শব্দের মধ্যে বহু বিষয়াদি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যাহার ফলে এই বাক্যটি সমস্ত মাছায়েলের সমুদ্র বলা চলে। আর ইহা বলা যায় যে, এই একটি বাক্য সমগ্র মানবজীবনের জন্যে যথেষ্ট (এক) مِمَّا মিম্মা, (দুই) --- رَزَقْنٰهُمْ রাযাক্নাহুম, (তিন)- يُنْفِقُوْنَ -ইউন্ফিকুন্। প্রথমতঃ 'মিম্মা' শব্দটি কিয়দংশ বুঝাইবার জন্যে। অর্থাৎ নিজস্ব রোজগার হইতে কিয়দংশ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা। ইহাতে দুইটি কল্যাণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করিয়া নিজে নিঃস্ব ও ফকির হইয়া যাওয়া। যদি কেহ নিজে সমস্ত সম্পদ দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দেয় এবং নিজে ও নিজের সন্তানদিগকে অভুক্ত রাখে; তবে ইহাতে বহুজনের হক নষ্ট করিয়া সে ব্যক্তি একটি নফল বন্দেগী করিল মাত্র। যাহা একেবারে নিষিদ্ধ। দান-খয়রাতের পরে যদি পথে বসিতে হয়, ভিক্ষা করিতে হয় তবে এইরূপ নফল আদায় করা হারাম। কেননা, খুবই মারাত্মক অবস্থা ব্যতীত ভিক্ষা করা হারাম। এইজন্যে এইস্থানে 'মিম্মা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি হজরত ছিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনকারী হয় তাহার পরিবারস্থ লোকজন সকলেই ছিদ্দিকে আকবরের পরিবারস্থ লোকজনের ন্যায় যদি ভরসাকারী হয়; এবং তাহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পাক কদমের উপর উৎসর্গ করিয়া দেয়; নিজের ঘরে কেবল আল্লাহ্ ও রাসুলের নাম অবশিষ্ট রাখে, তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ছাইয়্যেদেনা হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেনজির আশেকে রাসুল ছিলেন। এহেন হৃদয়বানদিগের জন্যে আদেশই ভিন্ন রকম। কাজেই, যে কেহ এই আয়াত দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে সে ব্যক্তি আশেকগণের রহস্য বুঝিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ মিম্মা দ্বারা ঐ দিকেও ইশারা হইতেছে যে, আমাদের নিকট সাধারণতঃ দুই প্রকার মাল থাকে কিছু হালাল এবং কিছু হারাম। কাজেই আয়াতের মর্মে আদেশ হইতেছে– আল্লাহ্র রাস্তায় হালাল মাল খরচ কর। কেননা, হারাম মাল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। তৃতীয়তঃ আমাদের নিকট কিছু মাল থাকে খারাপ, এইজন্যে এইস্থানে مِنْ 'মিন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। رَزَقْنٰهُمْ 'রাযাকনাহুম' 'রিযকুন' হইতে বাহির হইয়াছে। 'রিযকুন' এর আভিধানিক অর্থ দুইটি عطا অর্থাৎ, যাহা দেওয়া হইয়াছে– وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ۔ এই আয়াতে রিযিক্ হিচ্ছা বা অংশ বিশেষের অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার পারিভাষিক অর্থে রিযিক ঐ জিনিসকে বলে যাহার দ্বারা উপকার লাভ হয়। যেমন– বাতাস, পানি, পোশাক,

খাদ্য, জমীন, আওলাদ ইত্যাদি। মোটকথা, দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতই রিযিক। এক্ষণে, এই আয়াতের অর্থ হইবে এই যে, প্রত্যেক নিয়ামত হইতে আমার রাস্তায় খরচ কর। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের ব্যয় ইহার অনুযায়ী করিতে হইবে। যেমন– বাতাস দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয়। কাজেই, কিছু শ্বাস-আল্লাহ্‌র জিকির কর ইহা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের জাকাত হইল। যদি সন্তানাদি থাকে তবে যেমন কতক সন্তানকে দুনিয়ার কাজ কারবারে সুদক্ষ বানাও; তেমনি উহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ একটি সন্তানকে কোরআনের হাফেজ বানাও, অথবা দ্বীনের আলেম বানাও। যেমন– নিজ সন্তানকে দুনিয়ার কর্ম শিক্ষা দাও তেমনি ধর্মের কাজও শিক্ষা দাও। আর তাহাকে ইহাও বুঝাইয়া দাও যে, তুমি কোন বৃক্ষের ডাল কিংবা কোন বৃক্ষের ফল। তদ্রূপ, তোমার কাছে যদি মাল থাকে তবে মালও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর। رزقنهم শব্দে এই সমস্ত শামিল রহিয়াছে। শরীয়তের সাত নিয়মে মাল খরচ করা এবাদত। জাকাত বহু প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের হাজার মাছায়েল রহিয়াছে। যথা– স্বর্ণ ও রৌপ্যের জাকাত, পশুর জাকাত, জমীনের ফসলাদির জাকাত, ইত্যাদি ইত্যাদি। ২নং ছদকা-ফেৎরা, ৩নং নফল-ছদকা, ইহাও বহু প্রকারের। যথা– মেহমানের দাওয়াত, দুর্বলের সাহায্য, এতিমের লালন-পালন এবং কর্‌জদারের কর্‌জ আদায়। ইহা ছাড়া, গিয়ারভী শরীফ ও মীলাদশরীফের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা কিংবা সম্ভব হইলে উহাতে অংশগ্রহণ করা। ৪নং ওয়াক্‌ফে, ইহারও বহু ছুরত রহিয়াছে। মসজিদ, দ্বীনি মাদ্রাসা, পুল, কূপ এবং মুছাফিরখানা ইত্যাদি। ৫নং হজ্জের খরচ, ৬নং জেহাদ এবং ৭নং নিজের জিম্মায় যেসব আপনজন থাকে; উহাদের ব্যয় নির্বাহ করা। উহাও কয়েক প্রকারঃ যথা– বিবির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়, ছোট সন্তানাদির লালন-পালন, এবং পিতা-মাতার জন্যে আবশ্যকীয় ব্যয়। নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা করা ইত্যাদি। সমস্তই উক্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ينفقون 'ইন্‌ফাক্‌' 'নাফ্‌কুন' হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ পৃথক হওয়া; এই জন্যে যাহার দ্বীল এবং জবান এক নহে, তাহাকে মুনাফেক বলা হয়। কেননা মুনাফেক লোকের দ্বীল জবান হইতে পৃথক। শৃগালের গর্তকে নফ্‌কা বলা হয়, কেননা উহার পৃথক পৃথক মুখ থাকে। একটি প্রকাশ্য আরেকটি গোপণীয়। খরচের টাকাকে নাফ্‌কা বলা হয়, কারণ তাহাও মাল হইতে পৃথক হইয়া যায়। যেমন- এক ব্যক্তির পকেটে পঞ্চাশ টাকা আছে সে বাজারে গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি খরিদ করিতে বিভিন্ন দোকানে গেল এবং উক্ত পঞ্চাশ টাকা পৃথক পৃথকভাবে খরচ হইয়া গেল। অর্থাৎ উক্ত টাকা যাহা ঐ ব্যক্তির পকেটে জমা ছিল তাহা এক্ষণে, পৃথক হইয়া বিভিন্ন জনের হাতে চলিয়া গেল। খরচ কয়েক প্রকারের ঃ (১) হারাম খরচ– শরাব পান ও জুয়া ইত্যাদি শরীয়ত গর্হিত কাজে। (২) হালাল খরচ- দুনিয়াভী প্রয়োজনীয় বিষয়ে খরচ করা

যাহা মুস্তাহাব, সুন্নত এবং ফরজ। এইস্থানে আয়াত শরীফ মর্মে ঐ খরচ বুঝায় যাহা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় হয়। উহা ফরজই হউক কিংবা নফল। যে সমস্ত মুফাচ্ছেরীনগণ ইহার তফছীর জাকাতের করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ প্রকারের তফছীর করিয়াছেন। যাহা হউক, কোরআনে পাকের এই বাক্যে হাজার প্রকারের মছলা-মাছায়েল শামিল রহিয়াছে।

ছুফিয়ানা তফছীর ঃ ছুফীয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন যে, এই আয়াতে কারিমায় যেমন জাহেরী নেয়ামত খরচ করার কথা বলা হইয়াছে তেমনি বাতেনী নেয়ামত খরচের কথাও ইহাতে শামিল রহিয়াছে। যথা– ধনীরা তাহাদের মাল হইতে কিয়দংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিবে। অনুরূপভাবে আলেমগণ তাহাদের এলেম হইতে বিতরণ করিতে লোকজনকে এলেম শিক্ষা দিবে। আবেদগণ নিজেদের জান উৎসর্গ করিবে; অর্থাৎ বন্দেগীর মধ্যে কোন ক্রটি করিবে না। আরেফগণ নিজের দ্বীলকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত রাখিবে অর্থাৎ নিবিষ্টমনে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মশগুল থাকিবে। এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ মাল আসবাবের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া নিজের দ্বীলকে কলুসিত করিবেনা। অর্থাৎ, দুনিয়ার কোন ভাবনাই তাহাদের অন্তরে স্থান পাইবে না। দ্বীলের ঘরকে পরম মাশুকের জন্যে আবর্জনামুক্ত ও হেফাজতে রাখিবে। কেননা, আবর্জনাপূর্ণ ঘরে বাদশাহ্‌র আগমন হয়না। দুনিয়ার আবর্জনা ও মছিবতকে এমনিভাবে দ্বীল হইতে সরাইয়া রাখিবে যেমন দরিয়ার পানিকে নৌকার অভ্যন্তর হইতে সরাইয়া রাখা হয়। কবির ভাষায় কি সুন্দরই না উল্লিখিত হইয়াছেন–

…………………… ………

اب در کشتی هلاك کشتی اس = اب اندر زیر کشتی پشتی است

অর্থ ঃ নৌকার জন্যে পানির দরকার বটে; কিন্তু নৌকার ভিতরে পানির পরিমাণ বেশী হইলে নৌকা ডুবিয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে।

তদ্রূপ, মানব হৃদয়ের জন্যে চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন; এ চিন্তা-ফিকির, ধ্যান-কল্পনার উপরই মানুষের হৃদয় বা দ্বীল ভাসমান থাকে। কিন্তু এ চিন্তা ভাবনাই মানুষের দ্বীলকে হালাক ও বরবাদ করিয়া দেয়। অনুরূপভাবে ইহা বলা হইয়া থাকে– ধনীরা মাল হইতে পকেট খালি কর; আর ফকীর বাজে চিন্তা-ভাবনা হইতে দ্বীলকে মুক্ত রাখ।

জাকাতের ভেদসমূহ ও উপকারিতা

ইহা কুদরতী কথা যে, দান করিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় যদি আলেম তাহার নিজের এলেম বিতরণ না করে তবে তাহা হ্রাস পাইয়া থাকে। কূপের পানি যদি না উঠান হয় তবে তাহাও পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বৃক্ষের ডাল যদি কিছু কিছু

ছাঁটিয়া না দেওয়া হয় তবে উহাতে আগামী মৌসুমে ফল কম ধরিবে। তদ্রূপ, মালের জাকাত না দেওয়া হইলে উহার উন্নতি হ্রাস পাইতে থাকে; বরং মালের উন্নয়নের গতিরোধ হইয়া যায়। (২) কুদ্‌রতে ইলাহী প্রত্যেক বস্তু হইতে জাকাত গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা- অসুস্থতা হইল সুস্থতার জাকাত; নিদ্রা জাগরণের জাকাত; দুঃখকষ্ট শান্তির জাকাত। জামীনের ফসল কিছু পোকা-মাকড়ে নষ্ট করিয়া ফেলে, কিছু পশু-পাখি খাইয়া ফেলে ইহা ফসলের জাকাত। যদি মালের জাকাত না দেওয়া হইত তবে উহাতে কুদ্‌রতের আইনের বিরোধীতা হইত। (৩) যদি কাহাকেও তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দেওয়া হইয়া থাকে। তবে তাহার পক্ষে সেই সম্পদের কিয়দংশ অন্য জায়গাতেও খরচ করা উচিত। কুকুর-বিড়াল প্রভৃতির স্তনে এতটুকু দুধ থাকে যতটুকু উহার বাচ্চাদের পান করাইতে পারে। কিন্তু গরু-মহিষ প্রভৃতির মধ্যে উহার বাচ্চাদের চাহিদার তুলনায় অধিক সঞ্চিত থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গাভী বা মহিষের দুধে অন্যান্যদের হকও রহিয়াছে। কাজেই, যদি আল্লাহ্‌পাক কাহাকেও তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল বা সম্পদ দিয়া থাকেন নিশ্চয়ই উহাতে ফকীর-মিছকিনের অংশও রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতিরিক্ত জিনিস পৃথক করিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের বর্ধিত নখ ও চুল লম্বা হইবামাত্রই উহা কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তদ্রূপ, আমাদের পেটের ভিতরকার ময়লা ও দুষিত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, উহা পেটের ভিতর সঞ্চিত রাখা অসুস্থতার কারণ। (৪) আমাদের সম্পদ হইতে যেমন সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় এবং ঐ ট্যাক্স অনাদায়ে সরকারের নিকট দায়ী হইতে হয়, অপরাধী হইতে হয়; আর সরকারের ইচ্ছা থাকে যে; সকল প্রকার সাহায্য সহায়তা দ্বারা সরকার যখন জনগণের কল্যাণ করিয়া থাকে; সেক্ষেত্রে সরকারী তহবিলে বার্ষিক ধার্য করা সরকারী ট্যাক্স আদায় করা একান্তই অপরিহার্য। তদ্রূপ, এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রকার নিয়ামত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল-আসবাব দ্বারা আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন, আমাদের পরম কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে হাজার হাজার ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে তাহার কি এতটুকু হক নাই যে, আমাদের মাল হইতে কিয়দংশ জাকাতস্বরূপ গ্রহণ করিবেন? নিশ্চয়ই রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল মালও তাঁহার এবং আমরাও তাঁহারই। ইহা তাঁহারই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদিগকে মালদার বানাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং সে মাল হইতে কিয়দংশ গ্রহণপূর্বক আমাদিগকে ছওয়াব প্রদান করিতেছেন।

মুহব্বত বা প্রেম-ভালবাসা মানব হৃদয়ে জন্মগতভাবে স্থান লাভ করে। কিন্তু কতক ভালবাসা উপকারী কতক নিষ্ফল ও কতক ক্ষতিকর। আল্লাহ্ ও রাসুলের ভালবাসা উপকারী, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর ভালবাসা নিষ্ফল, আর শয়তানী কাজের ভালবাসা অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইসলামে প্রথম ভালবাসা বা

আল্লাহ্-রাসূলে ভালবাসা বৃদ্ধির উদ্দেশে ইবাদতের বিধান রাখা হইয়াছে। যাহার চর্চা বা আলোচনা অধিক হইবে। তাহার আনুগত্য ও ভালবাসা অধিক হইবে। অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর ভালবাসা দুরীকরণার্থে বহু মাধ্যম স্থায়ী রাখা হইয়াছে। যথা কবর জিয়ারতের দ্বারা দুনিয়ার মুহব্বত কমিতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়াদির মধ্যে জাকাত ও খয়রাত একটি বিষয়। অর্থাৎ, মানুষ নিজ উপার্জন নিজ হাতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলাইয়া দিবে যেন, মালের মুহব্বত দ্বীলের মধ্যে স্থান না পায়। জাকাতের দ্বারা সব চাইতে বড় উপকার এই যে, উহাতে মাল সকল প্রকার অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পায় এবং হামেশা বরকত জারী থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে, জাকাত প্রদানে পকেট খালি হয় বটে, কিন্তু হাকীকতে পকেট ভরাই থাকে।

অর্থাৎ, এক চাষী তাহার গোলা খালী করিয়া ধান বপন করিল, আর একজন বপন করিল না, গোলা তাহার ভরাই রাখিল। জাহেরী অবস্থায় দেখা যায় যে, বপনকারীর গোলা খালি হইয়া গেল, যে বপন করে নাই তাহার গোলা ভরা রহিল। কিন্তু হাকিকতে যে বপন করে নাই তাহার গোলাই খালি হইল। কেননা, তাহার গোলার ধান কিছু পোকায়, কিছু ইঁদুরে নষ্ট করিবে, কিছু মেহমান খাইবে আর অবশিষ্ট ধান কিছুদিনের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা খরচ করিয়া ফেলিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বপন করিল সে পূর্বের চাইতে অনেক বেশী ধান গোলায় তুলিবে।

তফছীরে রুহুল বয়ানে এই জায়গায় আছে– কোন একজন নবীর (আলাইহে ওয়াছাল্লাম) উপর এই মর্মে ওহি আসিয়াছে যে, অমুক ব্যক্তি জীবনের অর্ধেক বয়স ধনী অবস্থায় এবং অর্ধেক বয়স দরিদ্র অবস্থায় কাটাইবে। তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে কোন অবস্থা প্রথম কামনা করে। ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলিয়াছিল যে, সে প্রথম জীবনে ধনী হইতে চায়। কাজেই প্রথমে তাহাকে ধনী বানাইয়া দেওয়া হইল এবং সে ব্যক্তি এইরূপ কর্ম করিল যে, সে নিজের জন্যে যত খরচ করিত ফকির মিছকিনের তত খরচ করিত বরং তদপেক্ষা বেশী খরচ করিত। অতঃপর যখন তাহার অর্ধেক বয়স এইরূপে কাটিয়া গেল পুনরায় ঐ পয়গম্বরের নিকট ওহি আসিল। যেহেতু, ঐ ব্যক্তি আমার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করিয়াছে এবং শোকরিয়া দ্বারা যেহেতু নিয়ামত বৃদ্ধি পাইয়াছে; কাজেই তাঁহার সমস্ত জীবনই ধনী আবস্থায় কাটিয়া যাইবে।

১নং প্রশ্ন ঃ জাকাত মানুষের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। জাকাত দেওয়ায় মানুষ গরীব হইয়া পড়ে। এইজন্যে মুসলমান জাতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে গরীব হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর ঃ কওমের উন্নতিই জাকাতের আসল উদ্দেশ্য। যদি বিশুদ্ধ রীতিতে জাকাত দেওয়া ও নেওয়া হয়; তবে অবশ্যই কওমের মাঝে কোন প্রকার দরিদ্রতা

থাকিতে পারে না। মুসলমান যতদিন রীতিমত বিশুদ্ধ নিয়মে জাকাত আদায় করিত ততদিন মুসলমানদের মধ্যে বহু মালদার বা বিত্তশালী লোক বিদ্যমান ছিল। যখন হইতে জাকাত দাতার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে তখন হইতেই দরিদ্রতা আসিয়াছে। আজকাল মুসলমানদের দরিদ্র থাকার প্রধান কারণ এই যে, অলসতা ও কর্মবিমূখতা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে; বরং মামলা-মোকাদ্দমা এবং বিবাহ-শাদীতে নাজায়েজ রোছম ও রেওয়াজ অনুযায়ী আমোদ-প্রমোদ, ধুম-ধাম ও অপব্যয়ের ফলে নিজদিগকে হালাক ও বরবাদ করিতেছে। এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নাই যে, কোন ব্যক্তি জাকাত দেওয়ার ফলে দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ হেদায়াত নছীব করুন।

২নং প্রশ্ন ঃ আরিয়া সমাজের উক্তি এই যে, জাকাতের ফলে মুসলমান সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির প্রথা চালু হইয়াছে। কেননা, যখন ইহারা জানিতে পারে যে, জাকাতের অর্থ মালদারের কাছে পাওয়া যায় তখন পরিশ্রম কেন করিবে?

উত্তর ঃ ইহা জাকাতের দোষ নহে, বরং জাকাতের অপব্যবহারই ইহার জন্য দায়ী। ইসলামে যেমন– মালদারের জন্যে জাকাত প্রদানের বিধান রহিয়াছে, তেমনী রহিয়াছে গরীব মিছকিনদিগের প্রতি খাটিয়া খাইবার নির্দেশ। আরও রহিয়াছে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখার কড়া নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদীসের বহু নির্দেশ মওজুদ রহিয়াছে। আবার, জাকাত গ্রহণ তো মারাত্মক অক্ষমতার সময় ব্যতীত নহে। যদি কেহ কোন ভাল জিনিস অপব্যবহার করে তবে উহা ব্যবহারের দোষ; উক্ত জিনিসের নহে। যদি কোন ব্যক্তি রেলগাড়ীর নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে তবে উহা রেলগাড়ীর দোষ নহে; দোষ আত্মহত্যাকারীর। যদি জাকাতের ফলে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে হিন্দুদের মধ্যে সাধু ও ভিক্ষুকের দল কি কারণে সৃষ্টি হইল?

৩নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে তো কেবল একটি মাত্র নেক আমল প্রয়োজন হয়; শত শত আমলের বয়ান শরীয়তে কেন রহিয়াছে?

নোটঃ এই প্রশ্ন খাকছারী নামক বাতেল ফেরকার। ইহাদের নিকট শুধু মিথ্যা সৃষ্টির সেরা, এবং ভুল জেহাদ নাজাত লাভের উপায়। 'নামাজ রোজা মৌলুভীদের পেট-পূজা' বলিয়া কটূক্তি করিয়া থাকে।

উত্তর ঃ জীবন ধারনের জন্যে যেমন সহস্র প্রকার জিনিসের প্রয়োজন হয়, যথা– খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি। এই সমস্ত মৌলিক চাহিদা ব্যতীত জিন্দেগীর কল্পনাই অসম্ভব। কেহ যদি বলে যে, জিন্দেগীর জন্যে শুধু বাতাসের প্রয়োজনীয়তাই যথেষ্ট, খাদ্য বা পানির কোন প্রয়োজন নাই; তবে তাহাকে পাগল ব্যতীত আর কি বলা যায়; জীবনযাপনের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রয়োজনে অর্থাৎ, জিছমানী জিন্দেগীতে বহু ধরনের জিনিসের প্রয়োজন; তদ্রূপ রুহানী জিন্দেগী বা মানসিক জীবনযাপনে বহুবিধ আমলের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ মানুষের সহিত বহু বিষয় ও বস্তুর সম্পর্ক রহিয়াছে এবং প্রত্যেক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের শত শত গোনাহ্ বা অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে। কাজেই, প্রত্যেক সম্পর্কের বেলায় কোন না কোন নেক আমলের প্রয়োজন অনিবার্য হইয়া পড়ে যেন ঐ সকল গোনাহ্ বা অপরাধ মোচন হইয়া যায়। যেহেতু মানুষের সম্পর্ক মালের সহিতও রহিয়াছে এবং ঐ মালের দ্বারাও বহু গোনাহের কাজ ঘটিয়া থাকে। এইহেতু, শরীয়তে মালী এবাদতের বিধান রাখা হইয়াছে, যার ফলে মালদারের মাল পবিত্র থাকিবে। এ এবাদতের নামই যাকাত।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ۔

"ওয়াল্লাজিনা ইউমিনুনা বিমা উন্‌যিলা ইলাইকা ওয়ামা উন্‌যিলা মিন্ ক্বাব্‌লিক ওয়াবিল্ আখেরাতেহুম্ ইউকিনুন।"

অর্থ ঃ এবং যাহারা ঈমান আনিবে ঐ জিনিসের উপর, হে প্রিয় নবী! যাহা আপনার উপর নাযিল হইয়াছে এবং আপনার দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহারা পরকালের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ প্রথম আয়াতের সহিত এই আয়াতের কয়েক প্রকার সম্পর্ক রহিয়াছে। কতিপয় সম্পর্ক এবারত অনুযায়ী কতিপয় সম্পর্ক বিষয়বস্তু অনুযায়ী। এবারত অনুযায়ী এই যে, হয়ত ইহা পৃথক বাক্য এবং ইহা মুব্‌তেদা ও উলয়েকা হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার খবর। তবে এই ছুরাতে আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, যে সমস্ত মানুষের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি গুণ থাকিবে তাহারা হোদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম। আবার, হয়ত এ 'আল্লাজিনা' প্রথম আল্লাজিনার উপর মাতুফ্ হইবে, যেই ছুরতে অর্থ হইবেঃ এই কোরআনে পাক ঐ সমস্ত মোত্তাক্বী পরহেজগারদিগের জন্যে পথপ্রদর্শক যাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি গুণও রহিয়াছে এবং শেষোক্ত তিনটি গুণও রহিয়াছে, যাহা এক্ষণে বয়ান করা হইতেছে। তবে এ আয়াতও মোত্তাক্বীনেরই তফছীর। এবং হয়ত আল্লাজিনা মোত্তাক্বীনের উপর মাতুফ্; তবে আয়াতের অর্থ হইবে– এই কোরআনে কারীম পরহেজগারগণের জন্যে হেদায়াত এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যেও যাহাদের মধ্যে এই তিনটি গুণ রহিয়াছে। এ অবস্থায় 'উলায়েকা' হইতে পৃথক বাক্য আরম্ভ হইবে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী কয়েক প্রকার সম্পর্কঃ (১) প্রথম আয়াতে মোত্তাক্বীনের গুণ বয়ান করা হইয়াছিল যে, যাহারা গায়েবের উপর ঈমান রাখে। জাহেরী অবস্থায় গায়েবের দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্‌র জাত ও ছিফাত এবং আল্লাহ্‌র জাত ও ছিফাতকে মানা মোত্তাক্বী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত নবীগণ ও আসমানী কিতাবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না হয়। এই সমস্ত বিষয়াদি এ আয়াতে

বয়ান করা হইয়াছে। (তফছীরে ফাত্‌হুল মান্নান)। (২) প্রথম আয়াতে ঐ সমস্ত পরহেজগারগণের আলোচনা হইয়াছিল যে, অশিক্ষিত ও আরবের মুশরেকদের মধ্যে ঈমান আনিয়া যাহারা পরহেজগার হইয়াছিল। কেননা, তাহাদের জন্যে নবুওয়ত, আসমানী কিতাব এবং কিয়ামত ইত্যাদি সবকিছু সম্পূর্ণ গায়েবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তাহারা ছিল এই সমস্ত বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বেখবর। এক্ষণে, ঐ আহ্‌লে কিতাবের সম্বন্ধে বয়ান হইতেছে যে, যাহারা পূর্ব হইতে নবুওয়ত, আসমানী কিতাব এবং কিয়ামত সম্পর্কে জানিত এবং ঐ সমস্ত বিশ্বাস করিত। আর যাহাদের জন্যে এই সমস্ত বিষয়াদি ছিল জাহের বা প্রকাশ্য। প্রথম আয়াতে ঐ মুসলমানদের আলোচনা হইয়াছে যাহারা মুশরিক হইতে বাহির হইয়া ইসলামে দাখিল হইয়াছে। এক্ষণে, ঐ মুসলমানদের আলোচনা হইতেছে যে, যাহারা ইহুদীয়াত ও ঈছায়ীয়াত হইতে তওবা করিয়া মুসলমান হইয়াছে। যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই কিতাব উভয় প্রকার মানুষের জন্যেই একটি পরিপূর্ণ হেদায়াতের কিতাব। (৩) এই আয়াত প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা; তাহা এই ভাবে যে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে– পরহেজগার ঐ সমস্ত লোক যাহারা গায়েবের উপর ঈমান আনিবে। এক্ষণে, ইহার ব্যাখ্যা এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা ঐ সমস্ত লোক বুঝায় যাহারা সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে। কিন্তু উভয় প্রকার সম্পর্কের দ্বারা গায়েব বলিতে বাতেনী জিনিসকেই বুঝান হইয়াছে।

তফছীর ঃ ঈমানের অর্থ এবং উহার প্রকারভেদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বয়ান করা হইয়াছে। 'মাউন্‌যেলার' মধ্যে দুইটি 'কলেমা গভীর চিন্তা ফিকিরের দাবী রাখে। প্রথমত ঃ ما 'মা,' দ্বিতীয়তঃ انزل মা-'র অর্থ প্রত্যেক জিনিস এবং انزل অর্থ– যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর। যাহার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু কোরআনে পাকের উপর ঈমান আনয়ন করা 'মুমিন' ও মোত্তাক্বী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। বরং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সমস্ত হাদীসসমূহ মানিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা, এইস্থানে بالقران 'বিলকোরআন' বলা হইত। তখন আয়াতের মকছুদ এই দাঁড়ায় যে, হে মাহবুব! ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম! মোত্তাক্বী ঐ ব্যক্তি যে সমস্ত জিনিসের উপর ঈমান আনে যাহা আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে; হউক উহা জাহেরী ওহির মাধ্যমে কোরআন অথবা বাতেনী ওহি অর্থাৎ এলহাম ইত্যাদি যেমন হাদিছসমূহ। এইহেতু, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যাহা কিছু স্বপ্নযোগে দেখিয়া বয়ান করিয়াছেন উহা মানা, যাহাকিছু কাল্‌বে পাকের উপর এল্‌হাম হইয়া উহা মানিয়া লওয়া এবং যাহা হুজুরে পাকের নিকট জাহেরী ওহির মাধ্যমে আসিয়াছে তাহা মানিয়া নেওয়া; মোটকথা, যাহা হুজুরেপাকের পবিত্র জবানে ইরশাদ হইয়াছে।

এই সমস্ত কিছু মানিয়া নেওয়াই ঈমানের জন্য অপরিহার্য। কেননা, এই সমস্ত কিছুই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে। কোরআনে কারীম ঘোষণা করেন

و ما ينطقُ عن الهوى انْ هُوَ الاَّ وَحى يُوْحى

'অমাইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন্হুয়া ইল্লা ওহিয়্যুন্ ইউহা'- অর্থাৎ, আল্লাহ্পাক বলেন, "আমার মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজের খাহেশে কিছু বলেন না, বরং সবকিছুই ওহি যাহা তাহাকে দেওয়া হয়।" অতএব, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন মুনকির বা অস্বীকারকারী হইবে, সে ব্যক্তি কাফের। কোরআন ও হাদীসের পার্থক্য অত্র কিতাবের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল হাদিসকে কোরআনেপাক মনছুখ করিয়াছে, যেমন বদরযুদ্ধের কয়েদিদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করা। যাহা নবীয়ে পাকের ভুল ছিল বলিয়া বেয়াদব সকলে উক্তি করিত। (মাআজ আল্লাহ্)! ইহা মানাও ঐ সময় ফরজ ছিল; যখন ঐ কালাম ইরশাদ হইয়াছিল। এবং ঐ মনছুখ হওয়ার মধ্যেও আজব রহস্য ছিল। অবশ্য পরামর্শ স্বরূপ হুজুরেপাক যাহা ফরমাইয়াছেন উহার এই দরজা নহে। এইহেতু এইস্থানে ইরশাদ হইয়াছে- بما انزل 'বিমা উন্যিলা' অর্থাৎ, যাহা কিছু আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে; বরং এইরূপ নহে--------- بما قلت 'বিমাকুল্তা' - অর্থাৎ, হে নবী! যাহা কিছু আপনি বলেন। এন্যালের অর্থ- একবারে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা প্রত্যেক আয়াত একবারেই নাজেল হইয়াছে। এইজন্যে এইস্থানে উন্যেলা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক আয়াত এবং হাদীসের উপর ঈমান আনিয়াছি যাহা হুজুরেপাকের উপর একবারে অবতীর্ণ হইয়াছে। اليك ইলাইকার মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা হুজুরে আকরাম আলাইহিচ্ছালামের পবিত্র ক্বাল্বের উপর এল্হাম অনুযায়ী নাযিল হইয়াছে। ঐ সমস্ত ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং যাহা কিছু জিবরাঈল আলাইহিচ্ছালাম আসিয়া বলিয়াছেন এবং হুজুর আলাইহিচ্ছালাম পবিত্র কান মুবারক দ্বারা শ্রবণ করিয়াছেন; উহাও ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং যে সমস্ত জিনিস হুজুরেপাক আলাইহিচ্ছালাম পবিত্র চক্ষু মোবারক দ্বারা দর্শন করিয়াছেন জমিনের উপরে থাকিয়াই হউক অথবা আরশের উপর গিয়াই হউক, সমস্তই ইহাতে শামিল রহিয়াছে। কাজেই, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত এবং জাকাতের নেছাবসমূহ ইত্যাদি সবই ইহাতে শামিল রহিয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে কতক জিনিস এমনও রহিয়াছে যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম পবিত্র ক্বালবের দ্বারা অবগত হইয়াছেন, কতক শ্রবণ করিয়া এবং কতক দর্শন করিয়া জানিয়াছেন

و ما انزل من قبلك 'ওয়ামা উন্যিলা মিন ক্বাব্লিক' দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোরআনে পাককে মানা যেমন ঈমানের জন্যে জরুরী, তেমনি সমস্ত আসমানী কিতাবের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। কিন্তু এই উভয়

কিতাবের মধ্যে ঈমান আনার ব্যাপারে দুই প্রকার পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ সমগ্র কোরআনে কারীমকে মানা বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যেমন অপরিহার্য এবং উহার 'মাহকুম আয়াতসমূহের উপর আমল করাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে কেবল এইরূপভাবে মান্য করাই আবশ্যক যে, উহা আসামানী কিতাব ছিল। যাহা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উপর নাযিল হইয়াছিল- তাহা সমস্তই সত্য। কিন্তু ঐ সমস্ত কিতাবের উপর আমল করা আমাদের কর্তব্য নহে। এবং কোরআনে কারীম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের যে সকল আহ্কাম উদ্ধৃত করিয়াছেন; যেমন– কিচ্ছা-কাহিনী ও শাস্তিদানের আয়াতসমূহ। কিন্তু তাহা এইজন্যে নহে যে, তাহা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের হুকুম ছিল; বরং তাহা এই কারণে যে, আমাদের কোরআনে কারীম আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত কিতাবসমূহকে বিস্তারিতভাবে জানা জরুরী নহে। কেবল এতটুকু জানা ও মানা যথেষ্ট যে, কিছুসংখ্যক কিতাব আসিয়াছিল এবং উহা সমস্তই সত্য। পক্ষান্তরে, কোরআনে পাকের প্রয়োজন অনুসারে যেসব আদেশ আসিয়াছে, উহাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই 'ফরজে আইন' এবং সমগ্র কোরআনে পাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা 'ফরজে কেফায়া'– যে ফরজ উলামাগণ আদায় করিতেছেন। এ ধরনের পার্থক্যের কারণে ما انزل 'মা উন্যিলা'-কে দুইবার বয়ান করা হইয়াছে। কোরআনে কারীমের জন্যে আলাদা এবং বাকী সমস্ত আসমানী কিতাবের জন্যে আলাদা ঃ

রহস্য ঃ 'মনছুখ' বা স্থগিত 'আহ্কামসমূহ' মানা অবশ্য কর্তব্য, হইয়া থাকে কিন্তু উহার উপর আমল করা কড়াকড়িভাবে নিষেধ। দেখুন, ইহা অবশ্য মানা দরকার যে, প্রথমত ঃ বায়তুল মোকাদ্দাছ কেবলা ছিল; কিন্তু বাইতুল মোকাদ্দাছের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া নিষেধ। এইজন্যে কোরআনে পাকে এইস্থানে ঈমানের কথাই বলা হইয়াছে, আমলের কথা নহে।

আমাদের তিন জায়গায় আবস্থান করিতে হয়। যথা– কিছুদিন দুনিয়ায়, কিছুদিন কবরে বা আলমে বরজখে এবং চিরদিন আখেরাত বা পরকালে অবস্থান করিতে হইবে। জন্ম হইতে দুনিয়া আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে দুনিয়ার জিন্দেগীর অবসান হয়। বরজখী জিন্দেগী শুরু হয় মৃত্যুর পর হইতে এবং শেষ হয় কিয়ামতের আগমণে। আর, কিয়ামতের দিন হইতেই পরকাল আরম্ভ হয়, যাহার সীমাও নাই শেষও নাই বরং পরকালের জিন্দেগী চিরস্থায়ী দুনিয়াকে এইজন্যে দুনিয়া বলা হয় যে, 'দানবুন্' হইতে অথবা 'দানাআতুন্' উদ্ভুত হইয়াছে। যদি দানবুন্ হইতে হয় তবে অর্থ হইবে নিকটবর্তী জিনিস। কেননা, দুনিয়ার ধ্বংস অতিশয় নিকটবর্তী। আর যদি 'দানাআতুন' শব্দ হইতে দুনিয়ার উৎপত্তি হয় তবে ইহার অর্থ হইবে নগন্য জিনিস। বরজখ শব্দের অর্থ হইল পর্দা। যেহেতু, বরজখী জিন্দেগী দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দেগীর মধ্যে পর্দা স্বরূপ। উহাতে কোন প্রকার আমলও নাই এবং কৃত আমলের বদলাও নাই। আখেরাত শব্দের অর্থ দ্বিতীয়

জিনিস। কেননা, ইহা দ্বিতীয় জিন্দেগী। কাজেই ইহাকে আখেরাত বলা হইয়া থাকে। এইস্থানে আখেরাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় প্রকার অর্থই হইতে পারে। আভিধানিক অর্থে আখেরাতের মধ্যে দোজখও শামিল রহিয়াছে। কাজেই অর্থ এই হইবে যে, দুনিয়া ব্যতীত অপরাপর প্রত্যেক হালাত বা অবস্থার উপর ঈমান রাখিবে। অর্থাৎ বরজখে অবস্থার উপরও এবং পরকালের অবস্থার উপরও। যদি পারিভাষিক অর্থ বুঝায় তবে আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, কিয়ামত এবং উহার পরবর্তী অবস্থার উপর ঈমান রাখিবে। যাহা হউক, এই সমস্ত মানন ঈমানের জন্যে জরুঁরী। কেননা দুনিয়ার জিন্দেগী এবং ইহার সমস্ত অবস্থা অনুভবযোগ্য এবং উক্ত উভয় অবস্থা গায়েব বা অদৃশ্য। কাজেই, দুনিয়ার প্রতি ঈমান আনয়ন করা জরুরী নহে; বরং উক্ত দুইটি অবস্থা অর্থাৎ আলমে বরজখ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের জন্যে অত্যাবশ্যক। 'হুম' ইউক্বিনুন এখানে 'হুম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এনহেছারের জন্যে। অর্থাৎ, ঐ সমস্ত লোকদেরই কেবল আখেরাতের প্রতি ঈমান রহিয়াছে। আরিয়া সমাজ, হিন্দু যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতির কিয়ামতের উপরও বিশ্বাস নাই এবং কিয়ামতের পরবর্তী অবস্থার উপরও বিশ্বাস নাই। এইজন্যে এ হাছার ব্যবহার যুক্তিসম্মত হইয়াছে। তদ্রূপ, ইছায়ী এবং ইহুদীরা যদিও কিয়ামত মানে, তবু ভ্রান্ত বিশ্বাসের সহিত মানে। ইহারা বলে–বেহেশ্তে কেবল ইহুদী কিংবা ইছায়ীরাই যাইবে। ইহুদীদের শুধু কিছুদিনের জন্যে আজাব হইবে। আর বেহেশ্তের নেয়ামতসমূহ দুনিয়ার নেয়ামতের মতন নহে। অর্থাৎ বেহেশ্তে খাদ্যসমগ্রী ও বিবিগণ নাই। কেননা, এই সমস্ত জিনিস কেবল দেহের লালন পালন ও বংশবৃদ্ধির জন্যেই। বেহেশ্তে এই সবের প্রয়োজন নাই; বরং বেহেশ্তে কেবল রুহানী খুশী বিদ্যমান থাকিবে। আবার ইহাদের মধ্যে কতিপয়ের ধারণা এই যে, বেহেশ্তে ঐ সমস্ত নিয়ামত থাকিবে সর্বক্ষণ থাকিবে না বরং দুনিয়ার ন্যায় উহা লয়প্রাপ্ত হইবে। এইহেতু ইহারা বিশুদ্ধ অর্থে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। (তফছীরে রুহুল বয়ান)। এক্ষণে, প্রমাণিত হইল যে, মুসলমান ব্যতীত কেহই বিশুদ্ধ অর্থে আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। কোন কোন ফেরকা মোটেই বিশ্বাস করেনা, কোন কোন সম্প্রদায় আখেরাত মানে কিন্তু ভ্রান্ত বিশ্বাসের সহিত। যথা– আরিয়া সমাজ এবং হিন্দু যোগী-ঋষি, ইহুদী-নাছারা প্রভৃতি। সুতরাং এইস্থানে 'এন্হেছার' ব্যবহার খুবই যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে।

একটি সতর্কবাণী ঃ যে ব্যক্তি মুসলমান দাবী করতঃ বেহেশ্ত ও দোজখকে অস্বীকার করে এবং বেহেশ্তের নিয়ামতসমূহের ভ্রান্ত অর্থ করে ইছায়ীদের ন্যায় সে কাফের ও মোরতাদ। যেমন– প্রকৃতিবাদের হোতা স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী ও তাহার মতবাদের অনুসারীরা এই আয়াতের মর্মে ইসলাম হইতে খারিজ।

يـوقـنـون يـوقـنـون 'ইউক্বিনুন' শব্দ 'একিন' হইতে বাহির হইয়াছে।

একিনের দুইটি অর্থ (১) কোন জিনিসকে নিঃসন্দেহে মানা। অর্থাৎ, প্রথমতঃ সন্দেহ সৃষ্টি হইবে এবং পরে সন্দেহ দূর হইবে (তফছীরে কবীর)। অথবা দলীলের দ্বারা নিঃসন্দেহে মানা। এইজন্যে আল্লাহর এলেমকে একিন বলা হয়না (রুহুল বয়ান)। কেননা, আল্লাহ্পাকের এলেম দলীল দ্বারা নহে এবং শোবাহ্ বা সন্দেহের অবসানের পরও নহে। তদ্রূপ হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার এলেম, যাহা তাহার নবুওয়তের এলেম। উহাকে একিন বলা যাইবে না। কেননা, ইহার পূর্বে তাঁহার না ছিল কোন সন্দেহ এবং না তাঁহাকে দলীল দ্বারা এই এলেম হাছেল করিতে হইয়াছে। হজরত আবু লাইছ রহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন– একিন তিন প্রকারঃ (১) একিনে ইয়াঁ, (২) একিনে খবর এবং (৩) একিনে দালালাত। একিনে ইয়াঁ উহাকে বলা হয়, যাহা নিজে দেখিয়া উহার সম্বন্ধে একিন বা ধারণা সৃষ্টি হয়। একিনে খবর উহাকে বলে, যাহা কাহারও নিকট খবর পাইয়া ঐ জিনিসের একিন লাভ হয়। যেমন– এক ব্যক্তি বাগদাদ শরীফ দেখিয়া বাগদাদ শরীফের একিন বা জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং অপর ব্যক্তি তাহার নিকট বাগদাদ শরীফ সম্বন্ধে শুনিয়া উহা লাভ করিয়াছে। একিনে দালালাত এই যে, কোন জিনিসের আলামত ও নমুনা দেখিয়া উহার সম্বন্ধে যে একিন বা জ্ঞান লাভ হয়। যেমন- ধোঁয়া দেখিয়া অগ্নির একিন পয়দা হয়; এবং রৌদ্র দেখিয়া সূর্যের একিন হয়। এইস্থানে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর একিন বুঝাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে; একিনে খবরই শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। কেননা, কেহ যদি নবীয়ে পাককে অস্বীকারপূর্বক এই সমস্ত বিষয় ও বস্তুকে নিজ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবার প্রয়াস পায় তবে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুমিন নহে। এইহেতু, এ আয়াতে পরকালের একিনকে আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপনের পরে বয়ান করা হইয়াছে।

ছুফিয়ানা তফছীর ঃ ছুফীয়ানে কেরাম বলেন যে, একিনের দরজা তিনটি (ঈমানেরও তদ্রূপ)। যথা- علم اليقين এলমুল একিন, عين اليقين আইনুল একিন এবং حق اليقين হক্কুল একিন। এলমুল একিন শুনিয়া জানা বা অবগত হওয়া, আইনুল একিন দেখিয়া অবগত হওয়া এবং হক্কুল একিন উহাতে ফানা হইয়া বা আত্মবিলোপ করিয়া অবগত হওয়া। ইহার উদাহরণ এই যে, একব্যক্তি শুনিয়া জানে যে, অগ্নি গরম; দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্নির পার্শ্বে গিয়া উহার উত্তাপ অনুভব করিয়া জানিল যে অগ্নি গরম। এবং তৃতীয় ব্যক্তি অগ্নিতে নিজেকে ফেলিয়া দিয়া ফানাফিন্নার হইয়া অতঃপর উহা উপলব্ধি করিল এমন ব্যক্তির মুখেই প্রকাশ পায়- شدی من تن شدم تو جان شدی = تاکس نه گوید
بعد ازاں من دیگرم تو دیگری من تو شدم تو من

'মান তুশুদাম তুমান শুদী মান্ তন্ শুদাম তু জাঁন শুদী
তা কাছ্ না গুইয়াদ বাআদ্ আঁযা মান দিগারাম তু দিগারী।'

অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি যখন অগ্নিতে নিজেকে ফানা বা বিলোপ করিয়া দিল অগ্নি তাহার দেহের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিল তখন সে তাহা জবানে হালের দ্বারা জাহির করিল– "বন্ধু হে! আমি তোমার তুমি আমার, আমি দেহ তুমি আমার আত্মা, ইহার পর কেহ যেন না বলে যে, আমি অন্য তুমি ভিন্ন।"

এই ফানা বা ধ্বংসের পর ঐ বিষয়কে জানাতো প্রথমে এলমুল একিন ছিল দ্বিতীয়তঃ আইনুল একিন এবং তৃতীয়তঃ হক্কুল একিন। আর এহেন হক্কুল একিনের অধিকারী কোন ব্যক্তি যদি কাহারও উপর নজর করিবে তবে তাহাকেও সে রঙ্গে রঙ্গিন করিয়া দিবে। কয়লা যখন আগুনে পুড়ে তখন দেহ উহার কয়লাই থাকিয়া যায়; কিন্তু কাজ আগুনেরই করিয়া থাকে। ছুফীয়ানে কেরাম বলেন– যে কেহ এ রাস্তায় উন্নতিলাভ করিতে চায় সে যেন নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী– কাজ করে (১) অজুর সহিত থাকা, (২) কম–খাওয়া, (৩) কম কথা বলা, অর্থাৎ অধিক সময় নীরব থাকা, (৪) অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকা, (৫) সৃষ্টি-তত্ত্ব বা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা, (৬) ফরজ ও সুন্নতসমূহের পাবন্দী বা নিয়মানুবর্তীতা পালন করা, (৭) দুনিয়াদার হইতে নির্লোভ ও লালসাবিহীন হওয়া। (৮) কম নিদ্রা যাওয়া, (৯) হালাল রিজিক খাওয়া, (১০) সদা সত্য কথা বলা। এই সমস্ত বিষয়বস্তু তালাসমূহের চাবিতুল্য। মোটকথা, একিনের পরিণাম এই হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ায় থাকিয়া পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে এই জায়গায় আছে কতিপয় লোক বহুৎ ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে। যথা–(১) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা জানিয়াও তাঁহার এবাদত করেনা (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রিযিকদাতা জানিয়াও তাঁহার উপর ভরসা করে না। (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়া ধ্বংসশীল জানিয়াও উহার ভরসা করে। (৪) যে ব্যক্তি নিজের ওয়ারিশানদেরকে নিজের দুষমন জানিয়াও ধর্মকে হারাইয়া তাদের জন্যে মাল সঞ্চয় করে (৫) ঐ ব্যক্তি যে মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও উহার জন্যে তৈয়ার হয় না। (৬) যে ব্যক্তি জানে যে, কবর তাহার বাসস্থান এবং তৎপর উহা আবাদ করে না। (৭) যে ব্যক্তি জানে যে, পুলছেরাত পার হইতে হইবে অথচ তাহার বোঝা হাল্‌কা করে না, (৮) যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ্ হিসাব নিবেন অথচ সে তাহার হিসাব পরিষ্কার করে না (৯) যে ব্যক্তি জানে যে, দোজখ বদকার লোকের জায়গা অথচ সে উহা হইতে পলায়ণ করে না এবং (১০) যে ব্যক্তি জানে যে, বেহেশ্‌ত নেককার লোকের জায়গা, অথচ সে উহার প্রতি অগ্রসর হয় না। আয় আল্লাহ্‌তায়ালা। আমাদিগকে নেক আমলের তৌফিক দান করুন! আমিন! ইয়া রাব্বুল আলামিন!

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

১নং প্রশ্ন ঃ এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, সমস্ত কোরআনে পাকের উপর ঈমান আনিলে তাক্‌ওয়া হাছেল হয়। তবে ছাহাবায়ে কেরাম যাহারা সমস্ত কোরআন নাযিল হইবার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন তাহারা তো মোত্তাক্বী

নহেন।

উত্তর ঃ ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সকলেরই ঈমান সমস্ত কোরআনের উপর ছিল। ঈমান আনার জন্যে সমস্ত কোরআন একসঙ্গে নাযিল হইতে হইবে একথার কোন যুক্তি নাই। দেখুন, আমাদের কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিতে হয়, অথচ কিয়ামত এখনও আসে নাই।

২নং প্রশ্ন ঃ ইহাতে জানা যায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার জমানায় ইঞ্জিল, তৌরিত ইত্যাদি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ছহি ছিলনা। যদি ছহি না-ই হয় উহাতে ঈমান কেমন করিয়া আনা যাইবে? এবং যেহেতু ঐ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা ব্যতীত তাক্ওয়া হাছেল হইবে না; যদি মুসলমান বর্তমান ইঞ্জিল ইত্যাদি গলত্ব মানে তবে ঈমান কিসে আনা হইবে?

উত্তর ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার যুগের পূর্ব হইতেই ইঞ্জিল কিতাব খলত-মলত ছিল। তফছীরে হাক্কানী এ আয়াতের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। উপরন্তু বর্তমানের ইঞ্জিল দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা একটি ইতিহাস পুস্তক যাহার মধ্যে হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের জন্ম হইতে নিয়া নকলী মৃত্যু (আকাশে উত্তোলন) পর্যন্ত বিস্তারিত বয়ান করা হইয়াছে। ইহাতে এই সমস্ত বিষয় পাওয়া যায় যে, হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম অমুক স্থানে এই কথা বলিয়াছেন, অমুকের সহিত এই কথা বলিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে, রহিল ঐ প্রসঙ্গ যে, উহা যদি আসল ইঞ্জিল না হইয়া থাকে তবে মুসলমান উহাতে কিরূপে ঈমান আনিবে। এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তুকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? ইহার উত্তর এই ইহা অতিশয় সহজ কথা যে, মুসলমান ইহাতে ঈমান আনিয়াছিল যে; যে কিতাবাদি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ আনিয়াছিলেন তাহা সত্য ছিল পরবর্তী সময়ে উক্ত কিতাবাদি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, কোন জিনিসের উপর ঈমান আনিতে হইলে ঐ জিনিসের মওজুদ থাকা জরুরী নহে। মুসলমান তো অবশ্যই ঈছা আলাইহিচ্ছালামের উপর ঈমান আনিয়াছে; অথচ তিনি বর্তমানে আমাদের সামনে মওজুদ নাই।

৩নং প্রশ্ন ঃ কোরআনে ঐ আয়াতে তরতিব নাই, কেননা, কোরআনে কারীম ঐ কিতাবাদির পরে নাযিল হইয়াছে এবং ঐ কিতাবাদি কোরআনের আগে। কিন্তু আয়াতে ঐ কিতাবাদির বর্ণনা পরে আসিয়াছে। তরতিব অনুযায়ী ঐ কিতাবাদির বর্ণনা আগে হওয়া দরকার ছিল না কি?

উত্তর ঃ যদিও কোরআনে কারীম নাযিল হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য কিতাবাদির পরে, কিন্তু তবু এক্ষণে ঈমান আনার ও জানার ব্যাপারে কোরআনে কারীম ঐ সমস্ত কিতাবাদির অগ্রবর্তী। কেননা, ঐ সমস্ত কিতাবাদির এলেম কোরআনের মাধ্যমে হইয়াছে। মুসলমান ঐ কিতাবাদিকে এই কারণে মানে যে, কোরআনে কারীম ঐ সমস্ত কিতাবাদি মানিতে বাধ্য করিয়াছে। এইহেতু,

কোরআনে কারীমের আলোচনা সর্বপ্রথম হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। কোরআন সত্য এবং অগ্রগামী বটে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পিতার হক সন্তানের উপর দাদার চাইতে অধিক, যদিও দুনিয়ায় দাদাই পিতার আগে আগমণ করিয়াছেন, কিন্তু সন্তানের সাথে দাদার সম্পর্ক বাপের দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছে।

اولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَ اولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ·

৫নং আয়াত ঃ- উলায়েকা আলা হুদাম্‌মির রাব্বিহিম্ ওয়া উলায়েকা হুমুল্ মুফলিহুন।

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত লোকজনই আপন প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই মুক্তিলাভ করিবে।

সম্পর্ক ঃ এই আয়াতের সম্পর্ক কয়েক প্রকার ঃ এবারত অনুযায়ী এইযে, হয়ত এই الَّذِيْنَ 'আল্লাজিনার' খবর অথবা ইহা পৃথক বাক্য ------- اولٰئِكَ উলায়েকা মুবতেদা على هدى 'আলা হুদান্' শেষ পর্যন্ত ইহার খবর। বিষয় অনুযায়ী কয়েক প্রকার।

সম্পর্ক ঃ প্রথমত এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের ফলাফল। তাহা এইভাবে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আমলের কথা বলা হইয়াছে এবং এক্ষণে, এ আয়াতে উহার ফলাফলের বর্ণনা আসিয়াছে। অর্থাৎ, যে সমস্ত লোকদিগের মধ্যে পূর্বে বর্ণনাকৃত গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের পরিণামও ইহা যে, তাহারা হেদায়াতের উপরও রহিয়াছে এবং তাহারা সফলকামও বটে। দ্বিতীয়ত ঃ এই যে, ইহা প্রথম আয়াতের ইল্লত অর্থাৎ কোরআনে পাক ঐ সমস্ত লোকদিগের জন্যে হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক যাঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান। কথা হইল– তাহাদের জন্যে হেদায়াত কেন? তাহা এই জন্যে যে, তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলতা বা মুক্তিলাভকারী। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ আয়াতে কারীমায় বর্ণিত হেদায়াত এবং পুর্বোক্ত আয়াত হুদাল্লিল্ মোত্তাক্বীনের হেদায়াত এই দুই হেদায়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা আবশ্যক হইবে যেন 'ইল্লত' ও মামুলের মধ্যে অথবা আমল এবং উহার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়। উহা 'হুদাল্লিল মোত্তাক্বীনের' তফছীরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে, এই স্থানেও কিছু বয়ান করা হইবে।

তাফছীর ঃ اولٰئِكَ 'উলায়েকা' ইছ্‌মে ইশারা। ইশারার জন্যে প্রয়োজন হয় যে, কোন বস্তু শ্রবণকারীর অনুভবযোগ্য হয় অথবা সে উহা দেখিতে থাকে। যদি মোত্তাক্বী দ্বারা ছাহাবাগণের জমাত বুঝাইয়া থাকে তবে এ উলায়েকা দ্বারা প্রথমোক্ত প্রকারের ইশারা হইবে। অর্থাৎ, ছিদ্দিক, ফারুক, মোহাজের ও আনছার ইত্যাদি ছাহাবাগণের জমাত হেদায়াতের উপর রহিয়াছেন। আর যদি সাধারণ মোত্তাক্বীনদিগের জমাত বুঝায় তবে ইশারা জেহেনী হইবে। অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সমস্ত লোক যাহাদের মধ্যে উক্ত উল্লিখিত গুণাবলী বিদ্যমান

রহিয়াছে তাহারা হেদায়াতের উপর রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু, আমাদের দৃষ্টি হইতে ছাহাবায়ে কেরামের জমাত গায়েব এইজন্যে আমাদের নিকট এই ইশারা জেহনীই বা অনুমানমূলকই হইবে। আর এই ইশারায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত শ্রেণীর পরহেজগারগণই শামিল রহিয়াছে। على هدى 'আলা হুদান্'-এর মধ্যে 'আলা' এইজন্যে বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে, 'আলা' 'গাল্‌বা'র জন্যে বা প্রবলতা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– বলা হইয়া থাকে ঃ জায়েদ ছওয়ারীর উপর আছে; এবং ছওয়ারী জায়েদের অধীনে রহিয়াছে। তদ্রূপ, আয়াতে করীমায় ঐ দিকে ইশারা হইতেছে যে, ঐ সমস্ত লোকজন হেদায়াতের উপর গালেব; এবং হেদায়াত তাহাদের অধীনে আসিয়াছে। ইন্‌শাআল্লাহ উহা তাহাদিগ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। কেননা, উহা আল্লাহ্‌র দান। এবং উহা সর্বক্ষণ তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে। নফছ্ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা, দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তা এবং অন্যান্য বিপদাপদ তাহাদিগকে আপন প্রভুর হেদায়াত হইতে বিচ্যুত করিতে বা সরাইয়া নিতে সক্ষম হইবে না। হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায় এই ভূমিকা পালন করিবে যাহা দরিয়ার বুকে কিশ্‌তীর উদাহরণ। 'হুদান' শব্দটি নাকেরা বা অনির্দিষ্ট হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা সর্বপ্রকার হেদায়াতের মাঝে রহিয়াছেন। তাহারা ঐ রাস্তায় চলিতেছে। যাহা তাহাদিগকে দোজখ হইতে রক্ষা করিয়া বেহেশ্‌তের দিকে নিয়া যায়; এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ও নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিগণের সহিত মিলন ঘটায়। উপরন্তু, উহা হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে আপন প্রভুর সহিত মহামিলন ঘটাইতেও সহায়ক হইয়া থাকে।

من ربهم 'মির্‌রাব্বিহিম'-এর মধ্যে খুবই সুন্দর ইশারা হইয়াছে যে, যাহাকিছু তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম ফজল ও করমের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা, যাবতীয় আমল 'আসবাব' আর আল্লাহ্‌তায়ালা 'মুছাব্বিবাল্ আসবাব্।' পরহেজগার ও হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে যে কর্ম মিলিল আপন প্রতিপালক রাব্বুল আলামিনের ফজল ও করমের দ্বারাই মিলিল। আর উহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা সেই ফজল ও করমের বদৌলতেই। অধিকন্তু, উহাই তাহাকে আমল নষ্টকারী সকল কার্যকলাপ হইতেও হেফাজত করিয়া থাকে। এবং ইহাও উহারই কল্যাণে যাহা তাঁহাদের আল্লাহ্‌র দরবারে কবুলিয়াত লাভে সহায়ক হয়।

و اولئك 'ওয়া উলায়েকা' দুইবার এইজন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, প্রথমত মোত্তাক্বীন দুই প্রকার 'গুণ' বর্ণনা করা হইয়াছেঃ- (১) 'ঈমান বিল্ গায়েব'– অদৃশ্য বিশ্বাস, নামাজ কায়েম করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল খরচ করা। (২) সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা। প্রথমোক্ত গুণের বলে কথিত মোত্তাক্বীন বা পরহেজগারগণ হেদায়াতে রহিয়াছে আর শেষোক্ত গুণের বলে তাহারা সফলকাম

বলিয়া আখ্যায়িত। ইহাও হইতে পারে যে, প্রথম ছিফাত বা গুণাবলী সাধারণ মুসলমানের ছিল আর দ্বিতীয় গুণাবলী উলামায়ে কেরাম প্রভৃতিগণের ছিল। তাহা হইলে এক্ষণে, বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ মুসলমান হেদায়াতের উপর রহিয়াছে এবং খাছ ব্যক্তিবর্গ তথা উলামায়ে কেরাম প্রভৃতি সফলতা প্রাপ্ত। যেমন– কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে-قد افلح من تزكى 'ক্বাদ্ আফ্লাহা মান্ তাযাক্কা' 'সফলকাম বা মুক্তিলাভ ঐ ব্যক্তি করিয়াছে যে তায্কিয়ায়ে নফ্ছ বা আত্মার বিশুদ্ধতা হাছেল করিয়াছে অর্থাৎ, নিজের অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়াছে'। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে- ان الذين امنوا و عملوا الصحت.

এই আয়াতসমূহে ঈমান ও আমলের সহিত হেদায়াতের আলোচনা হইয়াছে এবং অন্তর সাফায়ীর সাথে 'ফালাহ্' বা নাজাত অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। هم 'হুম' দ্বারা জানা যায় যে, সফলতা, নাজাত বা মুক্তিলাভ কেবল ঐ সমস্তলোক দিগের জন্যেই খাছ। ইহুদী কিংবা নাছারা যাহারা নিজেদের নাজাতের স্বপ্ন দেখিতেছে; তাহাদের এ কাল্পনিক স্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপায়িত হইবার নহে। তাহাদের অবস্থা ঐ পিপাসিত ব্যক্তির ন্যায় যে মরুভূমির মরিচিকার পানে অদম্য পিপাসা নিয়া ছুটাছুটি করে। অবশেষে নিরাশ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। কাফের ও মুশরেকদিগেরও একই অবস্থা হইবে। المفلحون 'আল্ মুফলেহুন্' ফালাহ্ শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। ফালাহ্-র আভিধানিক অর্থ ছিন্ন করা, খোলা এবং টুকরা করা। এই জন্যে কৃষককে আরবীতে ফালাহ্ বলা হয়। কেননা, ঐ ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিয়া থাকে। পারিভাষিক অর্থ কামিয়াবী বা সফলতা। কেননা উহাও আড়াল বা পর্দাকে ছিন্ন করতঃ অপসারিত করত ঃ কঠিন বিষয় দূরীভূত করিয়া হাছেল করিতে হয়। কাজেই, আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ঐ শ্রেণীর লোকেরাই দুনিয়া ও আলমে বরজখে এবং আখেরাতে তথা সর্বস্থানে কামিয়াবী বা সফলতা লাভ করিবে। মনে রাখিবেন! 'হেদায়াত' ও 'কামিয়াবী' দ্বারা বুঝায় দুনিয়ার হেদায়াত ও কামিয়াবী। তাহা হইলে অর্থ হইবে– এই সমস্ত লোক দুনিয়ায় ভাল আকীদা সম্পন্ন হইবে। এবং ভাল আমলের অধিকারী হইবে। আমীরী ফকিরী কিংবা বাদশাহী প্রভৃতি সর্ব অবস্থায় কামিয়াব বা সফলকাম হইবে। যদি আলমে বরজখের হেদায়াত ও ফালাহ্ বুঝায় তবে অর্থ এই হইবে যে, মৃত্যুর সময় উত্তম মৃত্যু এবং কবরের প্রশ্নাদি ও উত্তর সমূহের হেদায়াত বা পথ নির্দেশের উপর থাকিবে। অতঃপর আলমে বরজখের যাবতীয় বরজখী নেয়ামতসমুহের দ্বারা কামিয়াব বা সফলকাম হইবে। অপরদিকে যদি কিয়ামতের হেদায়াত ও ফালাহ্ বুঝায় তবে আয়াতের মর্মকথা এই হইবে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশ্তাদের প্রশ্নসমূহের জওয়াব প্রদানের হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে এবং তৎপর রাব্বুলআলামিনের মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রদর্শন দ্বারা কামিয়াব হইবে, মুক্তিলাভ করিবে।

ছুফিয়ানা তফছীরঃ- ছুফিয়ানে কেরাম বলেন যে, মোত্তাক্বী লোকের

দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি এক বিরাট ময়দান অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন; যেখানে স্থানে স্থানে কাঁটা, অঙ্গার কূপ ও গর্ত ইত্যাদি রহিয়াছে। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমান লোক খুব সতর্কতার সহিত নিজেকে কাঁটা, কূপ, গর্ত ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রখিয়া এবং পরিষ্কার জায়গায় পা ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই ব্যক্তির ইনশাআল্লাহুতায়ালা 'হেদায়াতের' উপরও বিদ্যমান থাকিবে এবং শীঘ্রই 'মনজিলে মকছুদেও পৌঁছিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়ত ঃ এক ব্যক্তি যাহার নিকট কোন আলোক নাই যাহার দ্বারা উক্ত মছিবতসমূহ দেখিতে পারে এবং উক্ত কঠিন রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে; এ ব্যক্তি কখনো মনজিলে মকছুদে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে না। ফলে, কোন গর্তে পতিত হইয়া হালাক বা ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদি আগুনের মধ্যে পড়িয়া যায় তবে অনিবার্যরূপে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত ঃ ঐ ব্যক্তি যাহার হাতে আলোক রহিয়াছে বটে, কিন্তু চলিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করেনা। সেই ব্যক্তি যদিও অগ্নি এবং গর্ত হইতে বাঁচিতে পারে, তবে কাঁটার আঘাত হইতে রক্ষা পায় না। এই ব্যক্তি যদিও মনজিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে; কিন্তু জখম হইবারও বহুৎ বিলম্ব ঘটিবার পর।

এই দুনিয়া একটি কণ্টকপূর্ণ গর্ত ও অগ্নিময় ময়দান। সিনেমা, থিয়েটার ও শরাবখানা ইত্যাদি কাঁটা তূল্য। যাহার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, কুফর তাহার অন্তরে বপনকৃত অঙ্গার এবং শিরক তাহার চলার পথে গর্ত স্বরূপ। আর বহুলোক এই কঠিন ময়দান অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু মোত্তাক্বী মুসলামানের নিকট কোরআনে করিমের আলোক রহিয়াছে এবং তাহার তাক্বওয়ার বদৌলতে বড়ই সতর্কতার সহিত এ রাস্তা অতিক্রম করিতেছে। ভাল জায়গায় পা রাখিয়া চলিয়া থাকে এবং মন্দ জায়গায় পদচারণা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখে। গোনাহ্গার মুসলামানের নিকটও এই রোশনী বা আলোক রহিয়াছে, এবং সে কুফর ও শেরক হইতে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ নিজেকে গোনাহের কাঁটায় বিদ্ধ করিয়া থাকে। আর কাফের যেহেতু কোরআন পাকের রোশনী বা আলোক ধারা হইতে পৃথক রহিয়াছে; এইহেতু, সে হয়ত শিরকের অন্ধকুপে নিপতিত হইয়া নিজেকে বরবাদ করিতেছে অথবা কুফুরীর অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া নিজেকে পুড়িয়া ছার-খার করিতেছে। তবে, মোত্তাক্বী বা পরহেজগার ব্যক্তি যেমন হেদায়াতের উপর রহিয়াছেন; এবং উচ্চস্তরের মর্যাদাও লাভ করিয়াছেন। এবং গোনাহ্গার লোক হেদায়াতের উপর রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর হেদায়াতের সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে, কাফের মুশরেকদের জন্যে না হেদায়াত, না কামিয়াবী। ছুফিয়ানে কেরাম ইহাও বর্ণনা করেন যে, কামিয়াবী বা সাফল্যের তিনটি আঞ্জাম রহিয়াছে। প্রথমত ঃ নফ্ছ, দুনিয়া ও শয়তান এবং খারাপ সঙ্গীদের উপর প্রবল রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত ঃ কুফুর ও গোমরাহী আর অজ্ঞতা এবং নফছের প্রতারণা, শয়তানের কুমন্ত্রণা, এবং কবরের অনুশোচনা, কিয়ামতের দিনের অনুতাপ এবং পুলছেরাতের উপর হইতে পিছলাইয়া পড়ার আশংকা এবং বেহেশ্ত হইতে

বঞ্চিত এবং দোজখের কঠিন আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া। ছুফিয়ানে কেরাম আরও বলিয়াছেন যে, একই রাস্তা কেহ পদব্রজে কেহবা ঘোড়ায় চড়িয়া অতিক্রম করে; আবার কেহবা রেলযোগে কেহবা মোটর ইত্যাদি যানবাহনে করিয়া অতিক্রম করে। বাহন যতই শক্তিশালী হইবে রাস্তা ততই তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা সম্ভব হইবে। তরিকত অতিশয় তেজস্বী ছওয়ারী আর শরীয়ত খুবই দৃঢ় ও মজবুত এবং সাবধানের ছওয়ারী শরীয়েত পদস্খলন কম কিন্তু চলার গতি ধীর। আবার তরিকতের চলার গতি খুবই দ্রুত কিন্তু উহাতে ভয় বেশী। এই প্রসঙ্গে মছনবী শরীফে আছে-

ایك زمانه صحبت با اولیء = بهتر از صد سال طاعت بے ریا

একজমানা ছোহবতে বা আওলিয়া বেহ্‌তের আয্ ছদ ছালাহ্ ত্বাআতে বেরিয়া- অর্থাৎ, "অল্প সময় কোন একজন অলির ছোহবতে অবস্থান করিলে ১০০ বৎসরের রিয়া শূন্য এবাদতের চাইতেও উত্তম।"

অনুরূপভাবে, শরীয়তে নিজে নিজেই যাত্রা করিতে হয়, একাকী রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। আর তরিকতে অপর কাহারও আকর্ষণে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া পথ চলিতে হয়। তবে 'হুদান'-এর দ্বারা বুঝায় শরীয়ত অনুযায়ী চলা; আর ফালাহ্ দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্ পাককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। তিনি বলেন– যে ব্যক্তি নেক আমলের অগ্নি দ্বারা নিজের পর্দাকে জ্বালাইয়া দিতে সক্ষম হয় এবং দুনিয়াও উহার চাকচিক্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পরকালের ধ্যানে নিমগ্ন হয়; তবে রহমতে খোদা বা আল্লাহ্‌র করুণা তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। তাহা এইরূপে যে, ঐ রহমতে ইলাহী জাজেব বা আকর্ষণকারী আর এ মজ্জুব বা আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর। বরং ইহাও বলা যায় উহা তালেব-অনুসন্ধানকারী আর ইহা মাত্‌লুব অনুসন্ধানকৃত। এই কথার কোন শেষ নাই। ইহাকেই বলা হয় 'হাল' বা অবস্থা। 'ক্বাল্' বা বর্ণনার দ্বারা উহা শেষ করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ- এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে ব্যক্তির মধ্যে পরহেজগারগণের উক্ত ছয়টি গুণাবলী রহিয়াছে সে হেদায়াতও প্রাপ্ত হয় এবং মুক্তিলাভও করিবে। এ গোনাহ্‌গার মুসলমান যেহেতু নামাজ ও জাকাতের পাবন্ধী করে না বা এই দুইটি গুণ হইতে বঞ্চিত; কাজেই সে হেদায়াত ও কামিয়াবী উভয় হইতেই বঞ্চিত থাকবে।

উত্তর ঃ মোত্তাক্বীনগণের যে সমস্ত গুণাবলী উল্লেখ করা হইয়াছে উহাদের কতকগুলি হইল মৌলিক; যেসমস্ত গুণাবলীর অভাবে মানুষ হেদায়াত ও কামিয়াবী উভয় হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবে। আর কতকগুলি হইল আনুষঙ্গিক, যাহার অভাবে মানুষ পরিপূর্ণ হেদায়াত ও পরিপূর্ণ কামিয়াবী হাছেল করিতে পারে না। আকায়েদ অর্থাৎ গায়েবের উপর ঈমান প্রভৃতি মৌলিক বা আসল গুণ। এবং আমল-নামাজ জাকাত আদায় করা পূর্ণ সফলতা বা উন্নতি হাছেল করিবার

জন্যে। এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যাহার মধ্যে এবং বিধ আকায়েদ ও আমল পাওয়া যাইবে সে ব্যক্তি পূর্ণ হেদায়াতের উপর রহিয়াছে এবং পূর্ণ কামিয়াবী তাহারই জন্যে। পক্ষান্তরে, যাহার মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলী পাওয়া যাইবে না ঐ ব্যক্তি পূর্ণ কামিয়াবী লাভের আশা করিতে পারে না আবার আকায়েদ বিশুদ্ধ না হইলে কামিয়াবী হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবে। এবং যদি শুধু আমল নষ্ট হইয়া যায় তবে পূর্ণ কামিয়াবী লাভ হইবে না।

আরিয়া সমাজের আপত্তিঃ– খোদাতায়ালার ইহা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব যে, কেবল মুসলমানদের আমলসমূহ কবুল করিবেন এবং অমুসলমানদের আমলসমূহ ফেরৎ দিবেন। যখন উভয়ে একেরই উপাসনা করে তবে এ পার্থক্য কেন? এক হিন্দু কূপ খনন করিয়া দেয়, সাঁকো বা পুল নির্মাণ করিয়া দেয়, ছদকা খয়রাতও করিয়া থাকে তবু এসমস্ত একেবারেই কবুল হইবে না। অপরদিকে একজন মুসলমান যদি উক্ত আমলের ১০ ভাগের ১ভাগও করে তবে তাহাতেই সে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইয়া যায়।

জওয়াব ঃ- একব্যক্তি খুব ভাল হালুয়া তৈরী করে যাহার মধ্যে সুজি, বাদাম, ঘি, চিনি প্রভৃতি উত্তমরূপে দিয়া থাকে; কিন্তু উহাতে ১ছটাক দারমুজও মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। অপর একব্যক্তি যে সাধারণ নিয়েমে হালুয়া তৈরী করে কিন্তু উহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করে না। উক্ত বেকুফ মালদারের মূল্যবান হালুয়া জীবন বরবাদ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ব্যক্তি দরিদ্র অথচ জ্ঞানী হওয়ার কারণে তাহার মামুলী উপায়ে প্রস্তুত হালুয়া গ্রহণযোগ্য ও উপকারী বলিয়া পরিগণিত হয় এই নেক আমল হালুয়ার উদাহরণ এবং কুফর দারমুজ বা বিষের উদাহরণ। অতএব, যে ব্যক্তি নেক কাজ করে এবং উহাতে কুফরের বিষও মিশ্রিত করে, এ ধরনের নেক কাজ বৃথা। আর মুসলমান যদিও মামুলী নেক করে তবু উহাতে কুফুরের বিষ মিশ্রন হইতে পবিত্র বলিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়। অমুসলমান তথা কাফের মুশরিকদের নেক কাজ গ্রহণযোগ্য না হইবার ইহাই একমাত্র কারণ।

ان الَّذِين كفروا سواء عليهم ءَانْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ۔

"ইন্নাল্লাজিনা কাফারু ছাওয়াউন্ আলাইহিম আআন্‌যারতাহুম আম্‌লাম্ তুনযিরহুম লাইউমিনুন।"

অর্থঃ নিশ্চয়ই যাহারা কুফুরী করিয়াছে তাহাদিগকে আপনি ভয়প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, উভয়ই তাহাদের পক্ষে সমান, তাহারা ঈমান আনিবেনা।

সম্পর্ক ঃ এ আয়াতের সহিত পূর্ববর্তী আয়াতের কয়েক প্রকার সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথমত ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়বান্দাগণের আলোচনা ছিল এক্ষণে, তাহাদের মোকাবেলায় মরদুদদিগের আলোচন করা হইয়াছে।

কেননা, প্রত্যেক বস্তু উহার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে পুরাপুরি পরিচিত হইয়া থাকে। যেমন দিনকে রাত্রির মাধ্যমে এবং আলোকে অন্ধকার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়। দ্বিতীয়ত ঃ প্রিয়বান্দাগণের ঐ সমস্ত গুণাবলীর আলোচনা ছিল যাহা দ্বারা তাহারা হেদায়াত ও কামিয়াবী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে, মরদুদ্দিগের ঐ সমস্ত গুণের আলোচনা হইয়াছে যাহার কারণে তাহারা হেদায়াত ও কামিয়াবী হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। হেদায়াতের রহস্য এই যে, উভয় প্রকার গুণের আলোচনা করা হইবে, যেন শ্রবণকারীগণ ভাল জিনিস করিবে আর মন্দ জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। তৃতীয়ত ঃ এইযে, পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোরআনে কারিম ঐ সমস্ত পরহেজগারদিগের জন্যে হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক যাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ছয়টি গুণ বিদ্যমান থাকিবে। এক্ষণে, বয়ান করা হইতেছে যে, কোরআনে কারীম ঐ সমস্ত লোকদের জন্যে হেদায়াত নহে যাহাদের মধ্যে পরে আলোচ্য গুণসমূহ বিদ্যমান থাকিবে। প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বোক্ত গুণাবলী হেদায়াত লাভের কারণ; আর এইসব গুণাবলী বঞ্চিত হইবার। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার কোনও রোগীকে তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ আবশ্যকীয় তদবীরসমূহ বলিয়া দিয়াছে যে, অমুক এবং পথ্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছে যে, অমুক অমুক জিনিসসমূহ ক্ষতিকর যেন রোগী এই তদবীর দ্বারা ক্ষতিকর দ্রব্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়।

শানে নযুল ঃ- এই আয়াতে কারীমা আবু জাহেল আবু লাহাব প্রভৃতি কুফ্ফারদের প্রসঙ্গে নাযিল হইয়াছে যাহারা এল্মে ইলাহীতে ঈমান হইতে বঞ্চিত ছিল। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাহাদের ঈমান না আনার কারণে চিন্তাযুক্ত হইতেন। তখন এ আয়াতে কারীমা নাযিলপূর্বক আল্লাহ্পাক তাহার হাবীবকে এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন– 'হে মাহবুব! আলাইহিচ্ছালাম! আপনার তাবলীগের মধ্যে কোন ক্রটি নাই, আমার কালেমার মধ্যেও কোন ক্রটি নাই। তাহাদের ঈমান না আনার কারণ তাহাদেরই দুর্ভাগ্য হে মাহবুব! তাহাদের জন্যে আপনার চিন্তার কারণ নাই।

তাফছীর ঃ- انّ ইন্না শব্দের অর্থ- নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে। ইহা ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেথায় কোন ব্যক্তি কালামকে অস্বীকার করে। অথবা কালাম স্বয়ং এতদূর দৃঢ় ও মজবুত হয় যে, উহা অস্বীকারের আশংকা থাকে। যেহেতু, এইবিষয়টি অত্যন্ত মজবুত ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং অবুঝলোকদের পক্ষে নিশ্চয়ই উহা অস্বীকার করিবার মত ছিল; সেইহেতু কালামের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যে এই জায়গায় انّ ইন্না ব্যবহৃত হইয়াছে– الذين আল্লাজিনার দ্বারা হয়ত বা খাছলোক বুঝায়, যেমন– আবু জাহেল, আবু লাহাব, এবং ওলিদ ইব্নে মুগিরাহ্ প্রভৃতি। অথবা সাধারণ কাফের বুঝায় যাদের হিংসা-বিদ্বেষ এ বিষয়ে ছিল। মনে রাখিবেন! কোরআনে পাকে এবারতের সর্বজনীন রীতি হইয়া থাকে, ঘটনার বিশেষত্ব নহে। অর্থাৎ, যদিও এই আয়াত বিশেষ কয়েক ব্যক্তির প্রসঙ্গে

নাযিল হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু, উহার বাচন-ভঙ্গি সর্বজনীন কাজেই এই আয়াতে সমস্ত লোক বুঝাইতে পারে যে সমস্ত লোকেরা আযালী কাফের।

কাফারু শব্দটি كَفَرُ হইতে আসিয়াছে كُفْرٌ কুফরুন শব্দের আভিধানিক অর্থ– গোপন করা, আবৃত বা আচ্ছাদিত করা। এইজন্যে আবরণ বা আচ্ছাদনকে কাফুর বলা হয়। কেননা ইহা মগজকে আবৃত বা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। আবার কাফুরকেও এইজন্যেই কাফুর বলা হয় যে, ইহার গন্ধ সব গন্ধকে ঢাকিয়া ফেলে। শরীয়তে কুফরের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, অথবা তাহার তৌহিদ কিংবা কোন নবী আলাইহিচ্ছালামের নবুওয়ত অথবা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী এই যে যাহা সাধারণ মুসলমান জানে যে, ইহা দ্বীনের বিষয় বা বস্তু, অথবা ঐ বিষয় যাহার ধারণা ধর্মে দাখিল হওয়ার জন্যে অপরিহার্য। মোটকথা, এতটুকু বুঝিয়া লওয়া কর্তব্য যে, যাহা মানিয়া মানুষ মুসলমান হইয়া থাকে; আর এইসব অমান্য করিয়া কাফের হইয়া যায়। কতিপয় কাজ এইরূপ যাহা শরীয়ত কতৃর্ক ধর্ম অস্বীকারের নিশানা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন– পৈতা ধারণ করা হিন্দুদের মতন, এবং মথায় টিকি রাখা হিন্দুদের মতন, ইহাও কাফেরদের লক্ষণ এবং কুফুরী। কেননা ইহাতে জানা যায় যে, ইহা পালনকারী বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে আর যে কাজ কাফেরদের ধর্মের নিশানা পরিগণিত অর্থাৎ যাহা দেখিলে মানুষ মনে করিবে লোকটি কাফের; তাহা করা মুসলমানদের জন্যে কুফুরী। যেমন–কাশ্‌কা, টিকি রাখা যাহা হিন্দুদের মাথায় রাখে; এবং যাহা কাফেরদের সামাজিক চিহ্ন প্রকাশ করে তাহা মুসলমানদের জন্যে হারাম। যেমন– হিন্দুস্থানে ইংরেজদের হেট্‌ বা সাহেবী টুপী ব্যবহার করে এবং হিন্দুয়ানী ধুতি পরিধান করে।

কোরআনে কারীমে কুফর শব্দটি চারিটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা– (১) ঈমানের বিপরীতে, (২) এন্‌কার বা অস্বীকার, (৩) শোকরের বিপরীতে অর্থাৎ না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতা যেমন– واشكروا لى و لاَ تَكْفُرُوْنَ 'ওয়াশ্‌কুরুলী ওয়ালা তাক্‌ফুরুন্‌' (আল্লাহর শোকর আদায় কর এবং কুফুরী করিওনা) এবং (৪) অসন্তুষ্টি যেমন– يَكْفُگُرُوْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ইয়াফ্‌কুরু বাদুকুম বাদান্‌। এইস্থানে প্রথমোক্ত অর্থ বুঝাইয়াছে কেননা, ইহার পূর্ববর্তী আলোচনা ঈমানের ছিল। কুফুরী চার প্রকার (১) কুফ্‌রে এন্‌কার ঐ কুফুরকে বলে যে, খোদাতায়ালাকে জানেই না। যেমন, আল্লাহ্‌, থেকে বেখবর কাফের। (২) কুফ্‌রে জহুদ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তায়ালাকে অন্তরের দ্বারা মানে কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না। যেমন- ইবলিছের কুফুরী ও জিদ্দি কাফেরদের কুফুরী। (৩) কুফ্‌রে এনাদ- তাহা এই যে, আল্লাহ্‌কে অন্তরের সহিত জানে ও কোন কোন

সময় মুখেও স্বীকার করে; কিন্তু কোনও কারণে তাহার এতাআত বা গোলামী করে না। যেমন- আবু তালেবের কুফুরী। তদ্রূপ, আজকালকার কিছু কিছু হিন্দু ব্যক্তি যাহারা কাগজে কলমে রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রশংসা কির্তন করিয়া থাকে এবং তাহার সত্যতার স্বীকৃতিও দিয়া থাকে; কিন্তু মুসলমান হয় না। (৪) কুফ্‌রে নেফাক- ইহা এই যে, মুখে মুখে স্বীকার করে বটে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও নাই (তফ্‌ছীরে রুহুল বয়ান)। এইস্থানে দ্বিতীয় প্রকারের কুফর বুঝায়। আবু তালেবের ঈমান ও কুফরের বাহাছ ইন্‌শাআল্লাহ্ অন্যস্থানে করা হাইবে। উহাতে বহু আলোচনা হইয়াছে যে; এইস্থানে কোন ধরণের কুফুরী এবং কোন কাফেরের প্রতি ইশারা হইয়াছে। কেননা, সমস্ত কাফের এমন ধরণের ছিলনা যে, তাহারা ঈমান হইতে নিরাশ হইত। শত শত কাফের মুসলমানও হইয়াছে। আর এইস্থানে নিরাশের কথাই প্রকাশ হইতেছে। কতক উলামা বলেন– এইস্থানে বুঝায় ঐ কাফের যাহারা জিদের কারণে কাফের হইয়াছে। কিছু সংখ্যকতো মূর্খতার কারণে কাফের হইয়াছে, আর কিছু সন্দেহের কারণে। এই উভয় প্রকারের ঈমানের আশা থাকে যে, যদি ইহাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ হয় কিংবা ইহাদের সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায় তবে ঈমান গ্রহণ করে। কিন্তু কতিপয় এমন ধরনের হইয়া থাকে যে, সবকিছু জানিয়া বুঝিয়া কেবল জিদ ও হটকারিতার কারণে ইসলাম কবুল করে না। ইহাদের ঈমানের কোন আশাই নাই; কেননা জিদের চিকিৎসা কোন আলেমের নিকট এবং বদ্‌গুমানীর ঔষধ কোন ডাক্তারের নিকট নাই। জিদের কয়েকটি কারণ থাকে– (১) হেদায়াত কারীর জাতের সহিত যদি দুষমনী থাকে তাবে তাহার প্রতি কথাই অস্বীকার করিবে দেখুন। ইবলিছ হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের সহিত হিংসার কারণেই কাফের হইয়াছে। কজেই আদম আলাইহিচ্ছালামকে সেজদা করিতে আল্লাহ্‌র আদেশ সত্ত্বেও, ফেরেশতাদের সেজদা করিতে দেখিয়াও সে সেজদা করে নাই বা ঈমান আনে নাই। কেননা, কালামের তাছির কালামকারীর মর্যাদার দ্বারাই হইয়া থাকে। রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার এশ্‌ক ও মুহব্বত দীলের মধ্যে কুফুরী আসিতে দেয় না। অপরদিকে রাছুলে পাকের দুষমনীর কারণে দ্বীলের মধ্যে ঈমান আসিতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঃ কাফের পিতাও পিতামহের রীতি-নীতি পালনহেতু তাহাদের কথা মানে, তাহা ভ্রান্তই হউক আর বিশুদ্ধই হউক। তৃতীয়ত ঃ কেবল ঐ কথার বা নির্দেশের জিদ্ যাহা হেদায়াতের পথে আহ্বানকারীর তরফ হইতে আসে। এইহেন তিন প্রকার জিদ্ প্রবণ ও হিংসুট মানুষ ঈমান হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকিবে। অনেক উলামা বলেন এই জগত ব্যতীত আরও একটি জগত রহিয়াছে যাহাকে 'আলমে আমছাল' কিংবা 'আলমে গায়েব' বলা হয়। যাহাকিছু এইজগতে হইতেছে কিংবা হইবে; ঐ সবকিছুই পূর্বেই হইয়াছে। জাহেরী জগত যেন বাতেনী জগতেরই ছায়া স্বরূপ। এক্ষণে, ইহাতে বুঝা যায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা বাতেনী জগতেই কাফের হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ, আযালী

কাফের। ঐদিক এই হাদীছ শরীফ ইশারা করিতেছে যাহাতে উল্লিখিত আছে যে, সমস্ত রুহ্ পিপিলিকার মতন হজরত আদম আলাইহিস্ছালামের পৃষ্টদেশ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহাদের কতক ছিল সাদা এবং কতক ছিল কাল রঙ্গের। মে'রাজের হাদিছে আসিয়াছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ছালামকে এই আবস্থায় দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ডাইন ও বাম দিকে বহু রুহু বিদ্যমান ছিল। ডাইন দিক দেখিয়া তিনি খুশী হইতেন এবং বাম দিক দেখিয়া তিনি চিন্তাযুক্ত হইতেন। হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ছালাম আরজ করিলেন যে, তাহারা হজরত আলাইহিস্ছালামের আওলাদের রুহুসমূহ। ডাইনদিকে অবস্থিত রুহুসমূহ মোমিনের আর বামদিকে অবস্থিত রুহু কাফেরদের। মোটকথা, ঐ আলমে দুই শ্রেণীর রুহু ছিল কতক মুমিনদিগের এবং কতক কাফেরদিগের। এইস্থানে ঐ কাফেরদের বুঝানো হইয়াছে। কিছু সংখ্যক উলামা বলেন– ইহাতে ঐ কাফেরদের বুঝায়; যাদের সম্বন্ধে এল্মে ইলাহীতে ছিল যে, তাহারা কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিবে এই বিষয়েও বহু হাদীছ রহিয়াছে যে, এমন বহুলোক আছে যাহারা এই সময় মুমিন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আল্লাহর এল্ম অনুসারে কাফের। আবার বহুলোক এমনও রহিয়াছে যাহারা জাহেরী আবস্থায় কাফের বটে, কিন্তু আল্লাহ্পাকের এল্ম অনুযায়ী মুমিন। ইহাদের শেষ পরিণতি আল্লাহ্পাকের এল্ম অনুযায়ী হইবে। ঐ সমস্ত লোক এইস্থানে বুঝাইতে আয়াতে মকছুদ এই হইবে যে, "হে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম! কোরআন ও আপনার কাজ হইল হেদায়াত করা, পথের সন্ধান দেওয়া; কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তন করা নহে। । যেরূপ, হেদায়াতকারীর শিক্ষা দ্বারা জানোয়ার কখনো মানুষ হয়না। তদ্রূপ, আযালী বদবখ্ত কখনো নেকবখ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ঐ জায়গায় নূর হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই জায়গায় তাহাদিগকে নূরানী করিতে পারে?

سواء এবং استواءُ একই অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বরাবর হওয়া। কিন্তু এইস্থানে سواءُ মাছদার, ইছমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত। ১০৪নং দ্বারা এই দিকে ইশারা হইতেছে যে, হে মাহবুব! আপনি তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করেন আর না করেন উভয়ই এক বরাবর, তাহারা কোন সময় ঈমান আনয়ন করিবে না; কিন্তু হে মাহবুব! আপনার জন্যে সমান কথা নহে, আপনি তবলীগের ফজিলত, দ্বীন প্রচারের মর্যাদা অবশ্যই লাভ করিবেন। এই তবলীগ আপনার জন্যে কল্যাণকর, আর ইহাদের জন্যে বৃথা। এইহেতু, হুজুরেপাক ছাল্লাল্লামু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাহাদের প্রতি তাহাদের অন্তিমকাল পর্যন্ত তবলীগ করিয়াছিলেন, যাদের মৃত্যু কুফুরীতেই সুনিশ্চিত ছিল। আবদুল্লাহ ইব্নে উবাই মুনাফিক দলপতির জানাজার নামাজ পড়াও হুজুর আলাইহিস্ছালামের জন্যে তবলীগের উদ্দেশ্যই ছিল। যার ফলে বহু সংখ্যক মুনাফিক মোখ্লেছ হইয়া গিয়াছিল। ঐ জানাজা ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ্

ইবনে উবাই জন্যে অনর্থক ছিল; কিন্তু হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার জন্যে উহা ফজিলতপূর্ণ মর্যাদার কারণ। উহা তাবলীগে আমালী ছিল। ডাক্তারগণ নিরাশ রোগীকেও শেষ পর্যন্ত ঔষধ দিতে থাকেন এবং ডাক্তারের ফিস ও ঔষধের মূল্য যথারীতি লাভ করিয়া থকেন; যদিও রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। বৃষ্টি সব জমীনে সমানভাবে বর্ষিয়া থাকে। যাদের জন্যে দুনিয়ায় ওয়াজ নছিহত অনর্থক, তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের অগ্নি সহ্য বা অসহ্য হওয়া একই কথা। যাহার জন্যে যৌবন ও বার্ধক্য, সুস্থতা ও অসস্থুতা, শান্তি ও কষ্ট, এবং জাহেরী ও বাতেনী গোনাহ্ এক সমান হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্বঅবস্থায় পাপকাজে লিপ্ত থাকে; এমন ব্যক্তির জন্যে আশংকা হয় যে, মৃত্যুর সময় তাহার তওবা করা আর না করা একই কথা। অর্থাৎ, তওবা করিলেও যাহা না করিলেও তাহা। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্-ওয়ালা লোকের সংশ্রব তাহার নছীব হওয়া বা না হওয়া একই বরাবর, এবং তাহার জন্যে সুপারিশ করা বা না করাও সমান কথা।

তফছীরঃ أَأَنْذَرْتَهُمْ আনজার হইতে গঠিত যার আভিধানিক অর্থ ভয়াবহ জিনিসের খবর দেওয়া, অর্থাৎ ভয় প্রদর্শন করা। শরীয়তে আল্লাহ্র আজাব হইতে ভয় প্রদর্শনকে আনজার বলা হয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার মছিবতে কাহাকে ভয় করে, শরীয়ত অনুযায়ী তাহাকে 'মানজার' বলা যাইবে না।

তত্ত্বকথা ঃ আল্লাহ্র নবী ভয় প্রদর্শনও করেন এবং সুসংবাদও দিয়া থাকেন। এইজন্যে তাহাকে নাজির এবং বাশীর বলা হইয়া থাকে। এ আয়াতে কেবল ভয় প্রদর্শনের কথাই ঘোষিত হইয়াছে, সুসংবাদের কথা নহে। এই জন্যে মানুষ ভয়ের কারণে অধিক বন্দেগী করিয়া থাকে। বড় বড় অপরাধী ব্যক্তিরা জেলখানার ভয়ে অপরাধ করে না। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দলীল প্রমাণ ঐ সময় কার্যকর হয় যখন কথায় কাজ হয় না। যখন ঐ সমস্ত বেদ্বীনদের জন্যে ভয় প্রদর্শনই কল্যাণকর নহে, তখন সুসংবাদের কি প্রয়োজন? এইহেতু, আয়াতে কারীমায় ভয়প্রদর্শনের সহিত সুসংবাদের কথা ঘোষিত হয় নাই।

অনুরূপভাবে, ভয় প্রদর্শনের কথা আগে এবং সুসংবাদের কথা পরে। যখন উহারা ঐ স্তর হইতে মোটেও উন্নীত হয় না, তখন তাহাদেরকে সুসংবাদ কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে?

لَا يُؤْمِنُوْنَ লাইউমিনুনার মধ্যে গায়েবের খবর। এবং এ খবর সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহারা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনে নাই। এই স্থানে বলা হইয়াছে যে, তাহারা ঈমান আনিবেনা এবং একথা বলা হয় নাই যে, তাহাদের ঈমান আনিবার শক্তিই নাই; যাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের কুফুরী ইচ্ছাকৃত ছিল, ঈমান আনিতে অপারগ ছিলনা। কেননা, আল্লাহ্পাক ইহা অবগত ছিলেন যে, তাহারা স্বেচ্ছায় খুশীমনে ইচ্ছাকৃতভাবে

কাফের থাকবে। যেরূপ তাদের কাফের থাকা সুনিশ্চিত, তদ্রূপ, অস্বীকার করাও তাদের ইচ্ছার উপর সুনিশ্চিত। অপারগ ও অসুবিধাগ্রস্ত লোক অর্থাৎ মাজুর ব্যক্তিকে আল্লাহ্পাক আজাব দেননা। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তকদীরের বড় মাছআলাও পরিষ্কার হইয়াছে। ইহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইন্শাআল্লাহ অন্য স্থানে করা হইবে।

ছুফিয়ানা তফছীর ঃ এই আয়াতে এই কথা বলা হইতেছে যে, যাহারা মিছাকের দিন 'বালা' বলিয়া আমার রবুবিয়াতের স্বীকৃতি দিয়াছে এবং পরবর্তী সময়ে নিজের দ্বীলের পরিষ্কার আয়নাকে বদ আমল দ্বারা এতদূর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছে যে উহাতে শানযন্ত্র প্রয়োগের যোগ্যতাও অবশিষ্ট রাখে নাই। আর যাহারা পরমআত্মারূপ পবিত্র পাখীকে দেহের পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হইবার পর পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দুনিয়াকে এতদূর উপভোগ করিয়াছে এবং উহাতে এতদূর নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা নিজের প্রকৃত বাসস্থানকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর নফ্ছে আম্মারা ও শয়তানের সংশ্রব ও প্ররোচনায় রুহ্ বা পবিত্র আত্মাকে এতদূর নষ্ট ও অপবিত্র করিয়াছে যে, তাহাদের নিজেদের ঐ পুরাতন বাসস্থানের বন্ধু-বান্ধব হইতে মুখ ফিরাইয়াছে। এক্ষণে, তাহাদের মধ্যে ঐ যোগ্যতাই নাই যে, ঐ পুরাতন বাসস্থানকে স্মরণ করিতে পারে। ছুফিয়ানে কেরাম আরও ফরমাইয়াছেন যে, 'ইনছান' শব্দটি 'ইনছুন হইতে গঠিত, যার অর্থ ভালবাসা। যেহেতু মানুষ তাহার সঙ্গী সাথীদিগকে ভালবাসে এবং ভালবাসার আকর্ষণ তড়াতাড়ি গ্রহণ করিয়া থাকে এইজন্যেই তাহাকে 'ইনছান' বলা হয়। অতএব, যাহার সঙ্গী-সাথী ভাল, সেই মানুষও ভালই হইয়া থাকে এবং খারাপ সঙ্গীর দ্বারা খারাপ হইয়া থাকে। এই কারণে বলা হয় মানুষ তাহার সঙ্গীর দ্বারা পরিচিত হয়।' মানুষকে আরবীতে 'নাছ'ও বলা হয়, যার অর্থ ভুল প্রবণ। ইহাও শয়তানের সংশ্রবে ও দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত হইবার ফলেই আল্লাহ্তায়ালাকে ভুলিয়া গিয়া থাকে। এইজন্যে মানুষকে 'নাছ' বলা হয়।

অনুরূপভাবে, ছুফিয়ানে কেরাম বলেন– রুহ্ বা পরমাত্মা দুইটি জিনিস দেখিয়া থাকে একটি দুনিয়া অপরটি আখেরাত। দুনিয়ার দর্শন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং পরকালের দর্শন বাতেনী ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা। এক্ষণে, যে ব্যক্তি সর্বদা দুনিয়ার ঐশ্বর্য কিংবা উহার চাকচিক্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকে, পরকালের দর্শন শক্তি তাহার বন্ধ হইয়া যায়। কোরআনে কারীম এই কারণে ফরমাইয়াছেন– اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

আম্ আলা-কুলুবিন্ আকফালুমা।

১নং প্রশ্ন ঃ যখন স্বয়ং আল্লাহ্পাক অবগত রহিয়াছেন যে, কাফেরসকল ঈমান কখনো আনিবেনা, তখন তাহাদের প্রতি তবলীগেরই বা কী প্রয়োজন? তাহাদের প্রতি তবলীগ না করাই বরং সঙ্গত ছিল।

উত্তর ঃ- তবলীগের দুইটি উপকারিতা রহিয়াছে– প্রথমত ঃ যিনি তবলীগ করেন তাহার জন্যে; দ্বিতীয়তঃ যাহার জন্যে তাবলীগ করা হয়। এইস্থানে একটি উপকারিতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অপর উপকারিতা অর্থাৎ মোবাল্লিগের ছওয়াব বাকী রহিয়াছে। এইজন্যে তবলীগ নিষ্ফল হয় নাই। আর এই তবলীগের কারণেই কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত কাফের দিগের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহারা তাহাদের নিজ নিজ অজ্ঞতার দরুন ওজরখাহী করিতে পারিবে না।

২নং প্রশ্নঃ- যখন আল্লাহ্পাকের জানা ছিল যে তাহারা ঈমান আনিবে না, তবে কেন তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইল না, যেরূপ হজরত নূহ্ আলাইহিচ্ছালামের কওমকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তর ঃ- এইজন্যেই যে, আমাদের নবীয়ে কারীম ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছিলেন স্বয়ং 'রাহমাতুল্লিল আলামিন।' তিনি বিশ্বের সর্বত্র হাজির ও নাজির। এমতাবস্থায়, দুনিয়ার বুকে আমভাবে আজাব নাযিল হইতে পারে না। পূর্বে রাব্বুল আলামিনের জালালিয়াতের প্রকাশ ছিল। এক্ষণে, রাহ্মাতুল্লিল আলামিনের বদৌলতে দুনিয়ার বুকে চির আমান বা পরম নিরাপত্তা তথা আমানের শান্তিদায়ক বাতাস প্রবাহিত হইতেছে। আর এ বিষয়ে কোরআনে কারীম উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ সাক্ষী রহিয়াছেন।

৩নং প্রশ্নঃ - যখন তাহাদের তকদীরেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিবে না তখন তাহাদের কুফুরীর দরুন তাহাদের শাস্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাহারা তাহাদের কুফুরীর ব্যাপারে তাহারা মজবুর বা অপারগ।

উত্তর ঃ- এই প্রশ্নে জানা যায় যে, প্রশ্নকারী তকদীরের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ। তকদীর আল্লাহতায়ালার এল্মের নাম। ঐ এল্মের মধ্যে যেমন অপরাধীর অপরাধ সামিল রহিয়াছে, তদ্রূপ অপরাধকারীর অপরাধের এখতিয়ার বা ক্ষমতাও সামিল রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে এই এলেম রহিয়াছে যে, তাহার ঈমান আনা বা না আনার এখতিয়ার তো থাকিবে। কিন্তু সে নিজের ইচ্ছামত ঈমান আনিবে না। কাজেই, যখন ক্ষমতা বিদ্যমান সত্ত্বেও ঈমান আনে নাই বরং কুফুরী এখতিয়ার করিয়াছে তখন তাহার শাস্তি হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ- যখন আল্লাহ্পাক তাহাদের কাফের থাকার ঘোষণা দিয়াছেন, তখন তাহাদের মুসলমান হওয়া অসম্ভব হইয়াছে, কেননা আল্লাহ্র ঘোষণা মিথ্যা হইতে পারে না। কাজেই, তাহাদের কুফুরীর উপর আজাব না হওয়া উচিত।

উত্তর ঃ যেরূপ আল্লাহ্পাকের তাদের সম্পর্কে অবগত থাকাতে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাদের কাফের হইতে বাধ্য করেন নাই, তদ্রূপ, আল্লাহ্পাকের খবর দেওয়াতেও তাদের কুফরীর মধ্যে কোন অপরারগতা নাই। কেননা, এখবরই দেওয়া হইয়াছে যে

ইহারা নিজেদের খুশীমত কাফের থাকিবে। এখবর দ্বারা তাদের ইচ্ছামত কাফের থাকা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। আর এই ইচ্ছার কারণে তাহারা এখ্তিয়ার প্রাপ্ত রহিয়াছে। অনুরূপভাবে, উক্ত খবর প্রদান এইরূপ যে, কোন ডাক্তার এক উদাসীন রোগীকে এই কথা বলিয়াছে যে, তোমার রোগ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, উহার চিকিৎসা সম্ভব নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে, 'তুমি রোগ সম্পর্কে উদাসীন ও বেপরোওয়া থাকায় এবং পথ্যাদি ও ঔষধ ঠিকমত ব্যবহার না করায় রোগবৃদ্ধি পাইয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, উহা চিকিৎসার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে রোগী নিজেই অপরাধী, চিকিৎসক নহে। তদ্রূপ, এইস্থানে এই ঘোষণা দেওয়া যাইতেছে যে এই কাফেররা নিজেদের কুফুরীকে এমন পর্যায়ে অর্থাৎ চরম সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং উহা তাহাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে উহা দূরীকরণ আর সম্ভবপর নহে। আর তাদের অন্তরে কুফুরী এতদূর সুদৃঢ় হওয়াও তাদেরই অসাবধানতার কারণে। এইহেতু তাহারা নিজেদের অপরাধের দরুণ নিজেরাই দায়ী। বস্তুত ঃ ইহাই দেখা যায় যে, কাহারও বিরোধীতা সামান্য হইতে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে শেষ পর্যন্ত খুন-খারাবীর রূপলাভ করিয়া থাকে।

৫নং প্রশ্ন ঃ যাহাদের সম্পর্কে কোরাআনে কারীম খবর দিয়াছেন যে, তাহারা ঈমান আনিবে না, এক্ষণে তাহাদের ঈমান আনা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? যদি বা ঈমান আনে তবে এ আয়াত মানিবে কিনা। যদি অস্বীকার করে তবে কাফের, কেননা আয়াতের অস্বীকার কুফুরী। আবার যদি মানে তবু কাফের; কারণ তাহাতে নিজেকে বেঈমান বলিয়া মানিতে হয়। এইহেতু যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তু ইহাই। আবার নিজেকে বেঈমান ধারনা করাও কুফুরী। এক্ষণে, তাহাদের ঈমান গ্রহণের কি ব্যবস্থা থাকিতে পারে? অন্যান্যদের জন্যে যেখানে কোরআনে কারীমকে মানন ঈমান সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্যে কুফুরী।

উত্তর ঃ ঐ শ্রেণীর লোক যাহারা ঈমান আনয়ন করে তাহারা এই আয়াতকে এইরূপে মানিবে। 'কতক লোক আযালী কাফের, আমরা তাহাদের অর্ন্তুক্ত নহি।' কেননা, এ আয়াতে কাহারও নামোল্লেখ পূর্বক ইরশাদ হয় নাই যে, 'অমুক কাফের।' আর আয়াতেকারীমার বিষয়বস্তুকে এইরূপে মানান নিশ্চয়ই কুফুরী নহে। এইহেতু, তাহাদের জন্যে এ আয়াত মানা কুফুরী হয় নাই। ইহার পূর্ণ আলোচনা তকদীর সম্পর্কিত আলোচনায় করা হইবে ইন্শাআল্লাহ্।

৭নং আয়াত

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

খাতামাল্লাহ্ আলা কুলুবিহিম্ ওয়া আলা ছাম্য়িহিম ওয়া আলা আবছারিহিম্ গেশাওয়াতুঁ ওয়ালাহুম আজাবুন আজীম।

অর্থঃ আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের দীলের উপর এবং তাহাদের কানের উপর

মহর মারিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের চোখের উপর পর্দা ঢালিয়া দিয়াছেন। আর তাহাদের জন্যে রহিয়াছে অবধারিত ভীষণ আজাব।

সম্পর্ক ঃ এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত এই যে, প্রথমত ঃ ঐ কাফেরদের ছিফাত বা গুণাবলী ও অবস্থা বয়ান করা হইয়াছিল। এক্ষণে, ইহার কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কিহেতু এই গুণাবলী পয়দা হইল। অথবা প্রথমোক্ত আয়াতে ঐ কাফেরদের ছিফাতের বর্ণনা ছিল, এবং ইহাতে তাহাদের ফলাফলের বর্ণনা। হয়ত পূর্বের আয়াতে তাহাদের রোগের বর্ণনা করা হইয়াছে আর ইহাতে ঐ রোগের কারণ বর্ণনা করা হইল। এবং প্রথমত ঃ তাহাদের রোগের বর্ণনা ছিল, এক্ষণে উহার ফলাফল বয়ান করা হইল।

তফছীর ঃ ختم اللهُ খাতামাল্লাহ্ আল্লাহপাক মহর মারিয়া দিয়াছেন। 'খাতাম শব্দের অর্থ গোপন করা, শক্ত করা এবং চরম সীমায় পৌঁছা। কোন জিনিসের উপর মহর লাগানকে খাতাম এইজন্যেই বলা হয় যে, ইহার ফলে ভিতরের জিনিসটি মানুষের নজর হইতে গোপনে থাকে। যেমন– কোন ব্যক্তি কোন কিছু পার্শ্বেল করতঃ পাঠাইবে; তখন উহা থলিতে ভরিয়া উহার মুখ বন্ধ করতঃ উহাতে মহর বা সীল মারা হয় যাহাতে রাস্তায় কেহ খুলিতে না পারে। এখানে খাতামার দ্বারা বুঝায় মোহর বা সীল লাগান্ আর দ্বীলের মধ্যে মোহর লাগাইবার তাৎপর্য এই যে, তাহাদের ধৃষ্টতা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে, যে তাহারা কুফুরী এবং গোনাহ্রের কাজকে ভাল মনে করিতেছে; ঈমান ও বন্দেগীকে খারাপ জানিতেছে। উপরন্তু ইহারা কাফের দলপতিদের সহিত মিলামিশা করিতেছে। আল্লাহ্র প্রিয়জন আম্বিয়া আওলিয়াগণের সহিত দুষমনি করিতেছে। অতঃপর ইহাদের দ্বীলের অবস্থা এমন জঘন্যতম হইয়া গিয়াছে যে, উহা হইতে কুফর দূরীকরণ সম্ভব হইতেছে না এবং হক বা আল্লাহ্র সত্যবাণীও উহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। যেমন– মোহ্র বা সীলযুক্ত পার্শ্বেল; যাহার ভিতরে না কিছু বাহির করা যায় এবং না উহার ভিতরে কিছু প্রবেশ করান যায়। কোরআনুল কারীমে এই অবস্থাকে এইস্থানে 'খাতামা-র দ্বারা বয়ান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ঃ জায়গায় এই অবস্থাকে طبع 'তাবাআ'-র দ্বারা বয়ান করা হইয়াছে। যথা- طبع الله على قلوبهم 'তাবায়াল্লাহু আলা কুলুবিহিম'- তৃতীয় জায়গায় এই অবস্থাকে اغفال আগ্ফাল বলা হয়। اغفالنا قلبه আগ্ফাল্না ক্বালবহু-যাহার অর্থ গাফেল করা, চতুর্থ জায়গায় اقساء বলা হইয়াছে। قلوبهم قاسيته যাহার অর্থ শক্ত বা দৃঢ় করা। পঞ্চম জায়গায় বলা হইয়াছে– رين 'রাইনা ران على قلوبهم

এইসমস্ত শব্দসমূহের মর্ম প্রায় একই রকম। দ্বীলের মধ্যে কুফুরীর 'সীল মোহর' লাগান; হাকীকতে আজাবে ইলাহী হইতেছে। على قلوبهم কুলুবুন

শব্দটি ক্বালবুনের বহুবচন। ক্বালবের অর্থ উল্টা হওয়া এবং বদলান। ছিড়া ফারা টাকাকে এই জন্যে قلب কাল্‌ব বলা হয়। যেন লোকেরা উহাকে উল্টাইয়া দেয় এবং উহা ফেরৎ দেয় ও বদল করিয়া লয়। মানুষের দ্বীলকেও ক্বালব্ এইজন্যে বলা হয় যে বাম স্তনের নীচে উল্টাভাবে লটকান আছে। এবং উহার অবস্থা সর্বক্ষণ বদলাইতে থাকে। হঠাৎ মোত্তাক্বী বনিয়া যায় এবং হঠাৎ বদকার। কোন সময় সুখী কোন সময় বড়ই চিন্তাযুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বস্তুটিকে ক্বালব্ বলি উহা একটি গোশ্‌তের টুকরা দেখিতে অনেকটা ফুলের কলির ন্যায় এবং উহা সীনার বামদিকে লট্‌কান রহিয়াছে। রুহ্ বা পরমাত্মা ঐ গোস্তের মধ্যে জন্মলাভ করে। উহা হইতে ছোট ছোট রগ রেশা বা শিরা উপশিরার মাধ্যমে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গে পৌঁছে ইহাই প্রত্যেক প্রাণীর জীবনের উৎস। কিন্তু শরীয়তে ঐ রাব্বানী লতিফার নাম যাহার সম্পর্ক ঐ গোস্তের টুকরার সহিত রহিয়াছে। এই হেন লতিফার উপর ইনছানিয়াত বা মানবতা নির্ভর করে। আর ইহার দ্বারাই আল্লাহ্‌তায়ালার গোলামী ও শরীয়তের পাবন্দী হইয়া থাকে। কোরআনে কারীমে কাল্‌বের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ অর্থই বুঝায় যেরূপ উহা গোস্তের সহিত জান কায়েম থাকে, সেইরূপ ঐ লতিফার সহিত ঈমান কায়েম থাকে। উহাতে আল্লাহ্‌র এল্‌হাম হইয়া থাকে। এবং ঐ লতিফার দ্বারা উহাকে কোরআনে কারীম কোন স্থানে 'কাল্‌ব' আখ্যা দিয়াছেন। যথা

لمن كان له قلب
.... 'লেমান কানালাহু কাল্‌বুন।' এবং কোন জায়গায় 'নফ্‌ছ' আখ্যা দিয়াছেন। যথা– و نفس و ما سواها ওয়া নাফ্‌ছিন্ ওয়ামা ছাওওয়াহা আবার কোথাও 'রুহ্' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যথা– قل الروح من امر ربى

ক্বুলিররুহ্ মিন্ আম্‌রে রাব্বী (তফছীরে আজিজী)। ইহাকে মাওলানা জামী রাহমাতুল্লা আলাই ফরমাইয়াছেন– "ইহা ফুলের কলির ন্যায় আকার বিশিষ্ট দ্বীল নহে, বরং ইহা তোতা পাখির পিঞ্জিরা সদৃশ দ্বীল। যদি তুমি এই পিঞ্জিরা এবং তোতা পাখীর মধ্যে পার্থক্য করিতে না পার তবে খোদার শপথ! তুমি মানুষ নামের অযোগ্য।"

ঐ স্থানে 'দ্বীল' দ্বারা ইহাই বুঝায় এবং ইহাই অর্থ যাহা ঐ আয়াতে বুঝাইতেছে। তাহা হইলে আয়াতের তাৎপর্য হইবে যে, ইহা আল্লাহ্‌র ফজল এবং যাহা প্রত্যেক মানুষকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের জন্যে দান করা হইয়াছিল। এবং যাহা জওক ও শওক তথা আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ও ভেদ-তত্ত্বের সাগর ছিল এবং যাহা ছিল ঈমানের অবস্থান ও পাত্র, যখন উহাতে কুফুরীর সীলমোহর লাগিয়া গিয়াছে এবং কুফুরী দ্বারা উহা এতদূর ভরপুর হইয়া গিয়াছে যে উহাতে ঈমানের জন্যে একটু স্থানও অবিশষ্ট নাই তখন তাহাদের ঈমানের কী আশাই করা যাইতে পারে?

و على سمعهم 'ওয়া আলা ছাম্‌য়িহিম' - কতকলোক বলে যে, ইহার সম্পর্ক কাল্‌বের সহিত। তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে তাহাদের দ্বীলের উপরও মোহর লাগিয়াছে এবং তাহাদের কানের উপরও আর তাহাদের চোখের উপরও পরদা পড়িয়াছে। আরও কতিপয় উলামা বলেন– ইহার সম্পর্ক আগে অর্থাৎ আবছারের সহিত। তবে এ আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, তাহাদের দীল আল্লাহ্‌পাক মোহর মারিয়া দিয়াছেন। এবং তাহাদের কান এবং চক্ষুতে পরদা ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রথম অভিমত বিশুদ্ধ; এইজন্যে যে, দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, ঐ জিনিস দ্বীল ও কান এবং পরদা কেবল চক্ষুতে। আর এই অর্থই এই স্থানে যথার্থ। কানের জন্যে মোহরই উপযুক্ত এবং চক্ষু জন্যে পরদা। কেননা, কান চারিদিকের আওয়াজ শুনিতে পায়, চক্ষু কেবল সামনের জিনিস দেখে। আর মোহর বা সীল প্রত্যেক রাস্তাই বন্ধ করিয়া দেয়। যেহেতু, পরদা কেবল সামনের রাস্তাকে বন্ধ করে এইহেতু, কান ও দ্বীল মোহরের উপযুক্ত এবং চক্ষু পরদার উপযুক্ত। মোহর দ্বারা আসল মকছুদ এই যে, বাহিরের জিনিস ভিতরে আসিতে পারে না। এইস্থানে মুফরাদের ছিগা ব্যবহৃত হওয়ায় খুব সুন্দর তরকিব হইয়াছে। যে দ্বীল ঈমান ও কুফুরীর ভাণ্ডার ছিল উহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। এবং কান ও চক্ষু ঈমানের রাস্তা কেননা, কানের দ্বারা কোরআনে কারীমের আয়াত এবং নসিহত ও হেদায়াত দ্বীল পর্যন্ত পৌছে। আর উহাকে কবুল করিয়া ঈমান আনে, এবং তদ্রূপ চক্ষুর দ্বারা হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের চেহারায়ে পাক ও মুজেজাত এবং আল্লাহ্‌পাকের কুদরতের নমুনা দেখা যায়। দ্বীলের দ্বারা তাহা উপলব্ধি করতঃ ঈমান আনয়ন করা হয়। লক্ষ্যণীয়, দীল যেন বাদশাহ্ স্বরূপ আর অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ উহার খাদেমতুল্য। কাজেই, বাদশাহ্‌র কথা আগে এবং খাদেমের আলোচনা পরে। আবার কান কয়েকটি কারনে উত্তম (১) কোন কথা বা খবর শ্রবণে বিঘ্ন ঘটে না।

و على ابصارهم ওয়া আলা- আবছারিহিম–এই বাক্য পৃথক এবং ইহার অর্থ–এই যে, তাহাদের চোখের উপরে পরদা। 'বাছারের' বহুবচন 'আবছার যার অর্থ দেখা; কিন্তু এখানে বুঝায় চক্ষু যাহাতে দেখিবার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। غشاوة এর দ্বারা বুঝায় ঐ পরদা ১২৬নং

و لهم عذاب عظيم 'আজাবুন' শব্দটি 'আজবুন'- শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– বাধা দেওয়া। মিষ্টি পানিকে এই জন্যে আজবুন বলা হয় যে, উহা পিপাসা নিবারণ করে। শাস্তিকে এই জন্যে আজাব বলা হয় যে, উহা মানুষকে অপরাধের কাজ হইতে বিরত রাখে। কোরআনে কারীমে আজাবকে শাস্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়। عظيم আজীমুন দুর্বলের বিপরীত, এবং বড় ছোট-র বিপরীত। হাকীরের অর্থ সর্বদিক দিয়া ক্ষুদ্র; আর আজীমের অর্থ

সর্বদিক দিয়া বড়। ছগীরের অর্থ এক অনুসারে ছোট, তবে কবীরের অর্থও এক অনুসারে বড়। যেহেতু, 'আজীম' কবীর হইতে বড় এক্ষণে, আয়াতের অর্থ হইবে। তাহাদের জন্যে ঐ আজাব যাহা সর্বদিক দিয়া বড়। বস্তুতঃ আয়াতে কারীমার মর্মকথা এই যে, "হে প্রিয়নবী! ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আপনি ঐ সমস্ত কাফেরদের ইসলাম গ্রহণ না করায় চিন্তাযুক্ত হইবেন না। এবং তাদের ঈমানের আশা রাখিবেন না। কেননা, ঈমান আনার দুইটি উপায় রহিয়াছে প্রথমত ঃ তাহাদের অন্তর বিশুদ্ধ হইতে হইবে এবং তাহারা নিজেরা আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন ও নবীয়ে করীমের মু'জেজা দেখিয়া ঈমান আনিবে। দ্বিতীয়ত ঃ তাদের নিজেদের তো জ্ঞান বুদ্ধি নাই, কিন্তু অন্যের তরফ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া ঈমান গ্রহণ করিবে। এই কাফের সকল উভয় প্রকার উপায় হইতেই বঞ্চিত। কেননা, হিংসার ফলে তাদের অন্তঃকরণ ঈমান গ্রহণের যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে, তাহারা কোন ভাল কথাও বুঝিতে অক্ষম।

বিচক্ষণ আলেমগণের মতে, গোনাহের মূল তিনটি জিনিস– (১) লোভ, (২) হিংসা এবং (৩) অহংকার। কয়েকটি বিষয় মানুষকে গফেল করিয়া দেয়। যথা– (১) অধিক আহার, (২) অধিক নিদ্রা, (৩) সর্ব অবস্থায় আরাম প্রিয়তা, (৪) সম্পদের মোহ, (৫) সম্মানলাভের আকাঙ্খা এবং (৬) ক্ষমতার লিপ্সা। অনেক সময় সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হইয়া মানুষ কাফেরে পরিণত হইয়া যায়।। ইহাও কথিত আছে যে, গোনাহের কারণে মানুষের দ্বীলে কাল রং-এর ছাপ পড়ে, অর্থাৎ উপর্যুপোরি গোনাহ্র কাজে মানুষের অন্তর ক্রমশঃ কালীমাযুক্ত ও কলুষিত হইয়া পড়ে। এবং কোরআনে কারীম তেলাওয়াত, রাসুলে পাকের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ, আল্লাহ্পাকের জিকির এবং মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ দ্বারা দ্বীলের ঐ কাল ছাপযুক্ত ময়লাকে দূরীভূত করা হয়। অর্থাৎ, তেলাওয়াত, দরূদ, জিকির ও মৃত্যুর স্মরণ অন্তরের কালিমাকে শানযন্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার করতঃ উহাকে আয়নার মত স্বচ্ছ করিয়া দেয় তদ্রূপ, অধিক হাসিতে দ্বীল রুগ্ন হইয়া পড়ে। আর 'খওফে ইলাহী' বা আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন ইহার চিকিৎসা। যে ব্যক্তি গোনাহ্র পর নেককাজ করিয়া থাকে তাহার কাল্ব বা দ্বীল ময়লাযুক্ত হইবার পরও পরিষ্কার হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি গোনাহ্র কাজে লিপ্ত থাকে, নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয় না তাহার দ্বীলের কাল রং বা কালিমাযুক্ত ময়লা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। অতঃপর একসময় তাহার কাল্ব্ সম্পূর্ণ কাল আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িবে। ইহারই হাদিছ শরীফে আসিয়াছে যে, ঐ সময় কাল্বের উপর লোহার ন্যায় মরিচা পড়িয়া যায়। এবং উহার দূরীকরণের উপায় দ্বীলকে পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত। ঐ দ্বীলের কাল আবরণকে অপসারণ করিতে একটি যুগের প্রয়োজন এবং যথেষ্ট পরিশ্রমও অত্যাবশ্যক। তবে হ্যাঁ, যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির 'নজরে করম বা দয়া-দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়া যায় ঐ কালীমাযুক্ত রুগ্ন দ্বীল তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া উঠে

এবং পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু যে দ্বীলের কালিমা আল্লাহ্ ওয়ালার নজরে দূরীভূত না হয়, বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয় ঐ দ্বীলে মোহর লাগিয়াছে। জানিয়া রাখিবেন, গোনাহ্র দ্বারা ক্রমশঃ দ্বীল কালিমাযুক্ত হইয়া পড়ে এবং এবাদতের দ্বারা ঐ কালিমাযুক্ত ও কলুষিত দ্বীল ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইতে থাকে। কিন্তু নবীর সহিত দুষমনি করিলে ঐ দ্বীলের উপর চিরতরে মোহর লাগিয়া যায়। শয়তানের দ্বীলে হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের সহিত হিংসার ফলে আশ্চার্য ধরনের মোহর লাগিয়াছে। পক্ষান্তরে, হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের সুদৃষ্টিতে ফেরাউনের যাদুকরদিগের দ্বীলের কালিমা আকস্মিকভাবে বিদূরীত হইয়া উজ্জ্বল রূপ লাভ করে। প্রতীয়মান হইল যে, নবীর সহিত দুষমনি জঘন্যতম কুফুরী; এবং ওলির নজর উৎকৃষ্ট নিয়ামত।

উপকারিতা ঃ বজুর্গানে দ্বীন বলেন– আল্লাহ্ ওয়ালাগণের সহিত দুষমনিতে দ্বীল কঠিন হইয়া যায়, এবং উহাতে মোহর লাগিয়া যায়। তখন ঐ ব্যক্তির ঈমান নছীব হয় না। এইজন্যে হাদিছে কুদ্সীতে আছে আল্লাহ্পাক বলেন যে কেহ আমার ওলির সঙ্গে দুষমনি রাখে, আমি (আল্লাহ্) তাহার সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দেই। এইজন্যে বলা যায়, ভালবাসা জনিত কুফুরী হইতে দুষমনিমূলক কুফুরী বেশী মারাত্মক। একদল কোন নবীর ভালবাসা প্রদর্শন করিতে গিয়া কাফের হইয়াছে। যেমন- ঈছায়ী বা খৃষ্টানজাতি। অপর একদল নবীর দুষমনি করিয়া কাফের হইয়াছে। যেমন– ইহুদী। এই উভয় ফেরকাই ইসলাম হইতে খারিজ ইছায়ীদের তুলনায় ইহুদীরা শক্ত কাফের। এইজন্যে ইহুদীরা আল্লাহ্তায়ালার নিয়ামত হইতে চিরতরে বঞ্চিত ইহাদের প্রসেঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে–

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

আজকাল দুনিয়াতে ইহুদীদের কোথায়ও বাদশাহী নাই। তদ্রূপ, রাফেজী সম্প্রদায় হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভালাবাসায় সীমা অতিক্রম করিয়া ঈমান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে বেয়াদবী ও গোস্তাখী দ্বারা সীমালঙ্ঘনকারী দেওবন্দী ফেরকা ইসলাম হইতে খারেজ হইয়াছে কিন্তু রাফেজীদের চাইতে দেওবন্দীরা মারাত্মক কাফের। কেননা, ইহারা নবীগণের সহিত দুষমনির কারণে কাফের হইয়াছে।

প্রশ্নঃ উক্ত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের জন্যে ঈমানের সকল রাস্তাই বন্ধ। কাজেই, তাহাদের জন্যে কাফের থাকা অপরাধ নহে, এক্ষণে, নিরাপরাধ লোকের শাস্তি কেমন করিয়া হইবে।

উত্তরঃ এই লোকসকল অপরাধী এই কারণে যে, ইহারা নিজেদের ঈমানের রাস্তা নিজেরাই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেননা, ইহারা নিজেরাই উহার উপাদান জমা রাখিয়াছিল। যেমন– কোন একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অত্যাচারের মাধ্যমে কাতল করিল, যদিও ঐ মকতুল বা নিহতের জান আল্লাহ্ই বাহির

করিয়াছেন। তবু জান বাহির করিবার অর্থাৎ খুন করিবার উপকরণাদি হত্যাকারী নিজেই সংগ্রহ করিয়াছে। অতএব, নিশ্চয় সে অপরাধী।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِيْنَ .

ওয়ামিনন্নাছে মাঁইয়্যাকুলু আমান্না বিল্লাহে ওয়াবিল ইয়াওমিল আখেরে ওয়ামাহুম বিমু'মিনিন্।

অর্থাৎ ঃ এবং কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিয়াছি।' অথচ তাহারা মুমিন নহে।

সম্পর্কঃ ইহার পূর্ববর্তী আয়াতে প্রকৃত মুমিন ও প্রকৃত কাফেরের সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে, এ আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হইতেছে। যাহারা অন্তরের দিক দিয়া কাফের ছিল এবং মুখে মুখে নিজেদের মুমিন বলিয়া প্রকাশ করিত। যেহেতু তাহাদের অবস্থা মুমিন এবং কাফেরের মধ্যবর্তী; এইহেতু, তাহাদের আলোচনাও উভয়ের পরে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইজন্যে মধ্যবর্তী জিনিসের সম্পর্কে পুরাপুরি জ্ঞান তখনই লাভ হয়, যখন দুই দিকের জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি হাছেল হয়। দ্বিতীয়ত ঃ উভয় আয়াতের সম্পর্ক এইরূপে হইতে পারে যে, প্রথমত ঃ প্রকাশ্য কাফেরদিগের আলোচনা ছিল, আর এক্ষণে গুপ্ত কাফেরদের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। বাতেনী কাফের জাহেরী কাফেরের তুলনায় খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। এইহেতু, তাহাদের কথা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

শানে নযুল ঃ মদীনা শরীফে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উবাই নামক এক ব্যক্তি ছিল, যাহাকে মদীনাবাসীরা ভাল জানিত এবং তাহাকে মদীনার সরদার বানাইবার ইচ্ছা পোষণ করিত। কিন্তু যখন ইসলামের দ্বীপ্ত রবি ছারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মদীনার আকাশে উদয় হইলেন এবং মদীনাবাসীর অন্তরে ঈমানের নূর বিকশিত হইল তখন তাহার (আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইর) ইজ্জৎ ও সম্মানের উপর বিরাট একটা কালছায়া পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি মদীনাবাসীগণের মনের টান আর রহিল না। যাহা পুর্বে ছিল। এই জন্যে তাহার অন্তরে হিংসা ও বিদ্ধেষের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে বড় চতুর ছিল সে ধারণা করিল 'যদি আমি প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান করি, তবে আমার মঙ্গল হইবে না।' এইজন্যে সে জাহেরী অবস্থায় মুসলমান হইল, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া সে মুসলমানদের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর সে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিল সে মুসলমানদের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রশংসা করিত এবং বলিত তিনি আখেরী জমানার নবী, যাঁহার সংবাদ তৌরিত কিতাবে দেওয়া হইয়াছিল। আর যখন কাফেরদের সহিত মিলিত হইত তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলোচনা করিত। আর এই ভাবিয়া খুশী

হইতে যে, উভয় দলই তাহাকে ভালবাসে। তাহার সহিত বেশ কিছু লোক মিশিয়া একটি পূর্ণদলে পরিণত হইল, যাহার নাম হইল মুনাফিক দল। এই লোকদের সম্বন্ধেই এই আয়াতে কারীমা নাযিল হইল।

তফছীর ঃ আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদের গুণাবলী প্রকাশ করিতে এই জায়গায় চারটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন এবং প্রকাশ্য কাফেরদের সম্পর্কে দুইটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন। কিন্তু মুনাফিকদের দোষ বর্ণনা করিতে তেরটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন। অর্থাৎ, তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের দোষ বর্ণিত হইয়াছে কারণ, মুনাফিকদল অত্যন্ত মারাত্মক ভয়াবহ ছিল; মুসলমানগণ ইহাদিগকে চিনিতে পারিত না। ইহাদের বহুবিধ নিশানা বয়ান করিবার পর ইহাদের পরিচয় সহজ হইয়াছে। অথবা এইজন্যে যে, ইহারা মুসলমানদের সহিত সম্পর্ক রাখিত, মুসলমানদের সাথে উঠাবসা করিত এবং মুসলমানদের সহিত নামাজে শামিল হইত। আর যেহেতু, তাহাদের ঈমানের কিছুটা আশা ছিল; এইহেতু, মানাফিকদের বেশী দোষের আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে ইহারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া খাঁটি মুমিন হইয়া যায়।

الـنـاس , 'আন্নাছ 'ইনছান'-এর বহুবচন। এবং ইহাকে নাছ এইজন্যে বলা হয় যে, ইহা نـسـى 'নাছিয়ুন' শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ ভুলিয়া যাওয়া। কেননা, ইন্ছান নিজেও পূর্বের ওয়াদা অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়াছে। এইজন্যে তাহাকে 'ইনছান' ও 'নাছ' বলা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এই ইন্ছান ও আল্লাহ্তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতকে তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায় এবং বিপদাপদকে স্মরণ রাখে। এই জন্য তাহাকে "নাছ" বলা হহইয়াছে। অথবা উহা انـس ইনছুন শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ দেখা বা জাহির হওয়া। কেননা, ইনছানকে দেখা যায় ও সে জমীনে অবস্থানকারী বা জমীনের অধিবাসী। এইজন্যে তাহাকে ইনছান বলা হয়। এবং জমীনের উপর গুপ্তভাবে অর্থাৎ জমীনের বাতেনী অংশে দৃষ্টির অন্তরালে যাহা বাস করে তাহাকে 'জিন' বলা হয়। কতক বিজ্ঞলোক বলেন যে, 'ইনছান' ও 'নাছ' উন্ছুন' শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– মুহব্বত বা ভালবাসা। ইন্ছান মানুষ নিজ জাতিকে বহুৎ ভালবাসিয়া থাকে। এই কারণেই তাহাকে ইন্ছান বলা হইয়াছে।
مَنْ 'মান' শব্দটি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। مَنْ 'মান' শব্দটি গঠন অনুযায়ী একবচন, আর অর্থের দিক দিয়া বহুবচন। এইজন্যে, ইহার একবচন ও বহুবচন উভয় প্রকার জমির বা সর্বনাম পদ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই আয়াতে يـقـول ইয়াক্বুলু ওয়াহেদের ছিগা বা একবচনের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। امـنـا আমান্না এবং هـم হুম এবং مـؤمـنـيـن মু'মিনীন্ এই সমস্ত বহুবচনের অবস্থায়। কেননা, مـن মান শব্দে উভয়ই রহিয়াছে। এই

আয়াতে দুইটি জিনিসের উপর ঈমান আনার কথা বলা হইয়াছে। যথা– (১) আল্লাহ ও (২) কিয়ামতের দিনের উপর। এইহেতু, ইহাই উভয় ঈমানের শেষ। মুনাফিকদল ঈমানের সমস্ত বিষয়বস্তুকে মানার দাবী করিত এবং বলিত যে আমরা আল্লাহ্ হইতে শুরু করিয়া কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ঈমান আনিয়াছি। আসমানী কিতাবসমূহ ও নবীগণ সবই ইহাতে শামিল রহিয়াছে। আবার হয়ত এইজন্যে যে, তাহাদের কথার মধ্যে ধোকা ছিল। কেননা, তাহারা পূর্বেও ইহুদী ছিল। আল্লাহ্ এবং কিয়ামত পূর্ব হইতেই মানিত। তাহারা এইস্থানে এমন শব্দ ব্যবহার করিয়া যদ্দারা দুইটি শাখা বাহির হয়। মুসলমান তো বুঝিতেই যে, তাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (২) এবং তাহারা নিজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া বলিত যে, আমরা মুসলমান হই নাই। আমরা আমাদের আসল আকীদার উপরই রহিয়াছি (তাফ্ছীরে রুহুল বয়ান শরীফ)।

بِمُؤْمِنِيْنَ 'ওয়ামা হুম বিমুমিনীন্'-এর মধ্যে ইহার খুবই সুন্দর নিয়মে 'তার্দিদ' করা হইয়াছে। কেননা, এই জায়গায় ইহাও বলা হয় নাই যে, তাহারা মু'মিনের জমাতেই নহে, মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নহে। অথবা এই যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষেই মু'মিন নহে।

খোলাছা তাফছীর ঃ এই আয়াতে কারীমায় মুনাফিকদের কথা নকল করা হইয়াছে যে, তাহারা বলিত আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং মুসলমান হইয়াছি। এ উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া দুনিয়ায় যেন লাভবান হইতে পারে। এবং তাহাদের জাহেরী ইসলামকে সামনে রাখিয়া সর্বপ্রকার বিপদাপদ হইতে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যেহেতু, তাহারা 'হাকীকী ঈমান্ এবং বিশুদ্ধ অন্তরের সহিত ঈমান তাহাদের ভাগ্যে ছিল না। কেবল মুখে মুখে ইসলামের দাবী করা আল্লাহ্ পাকের নিকট কোনও মূল্য নাই। এইহেতু, মুসলমানদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে কোরআনে পাকে ঘোষিত হাইয়াছে যে, ইহারা ধোকাবাজ, মুসলমান নহে। এই সমস্ত মুনাফিক ধোকাবাজদের অপকর্মের কথা কোরআনে কারীমে বিভিন্ন জায়গায় বয়ান হইয়াছে। এ আয়াতে আল্লাহ্পাক 'নেফাক' কপটতার মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন।

উপকারিতা ঃ এ আয়াতে কারীমায় কয়েকটি উপকারিতা হাছেল হয়। প্রথমতঃ মানবজাতির মধ্যে কয়েকটি দল হইয়াছে (১) যাহার মুখে ও অন্তরের সহিত ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনকারী তাহারা খাঁটি মুমিন, তাহাদিগকে মুখ্লেছ বলা হয়। (২) যাহারা জাহের-বাতেন উভয় অবস্থায় কাফের তাহাদিগকে মুজাহের বলা হয় এবং (৩) যাহারা অন্তরের সহিত কাফের, মুখে মুখে মুমিন ইহাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। যে ব্যক্তি অন্তরে মুমিন এবং জাহেরী অবস্থায় কাফের ইহার দুইটি স্বরূপ রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি অপারগতার কারণে কুফুরী করিয়া থাকে সে মুখলেছের মধ্যে গণ্য।

এমতাবস্থায়, অপারগতা দূর হইবা মাত্রই তাহার উচিৎ নিজের ঈমান প্রকাশ করা কিন্তু, যদি ভয়ানক অপারগতা ব্যতীত কুফুরী করে তবে সে শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমান নহে এবং তাহার উপর ইসলামী হুকুম বর্তেনা। কাফন-দাফন জানাজার নামাজ কিছুই নাই। কোন না কোন সময় মুক্তি পাইবার খুবই সম্ভবনা রহিয়াছে শাফাআতের হাদিছে বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্তীগণকে আদেশ দেওয়া হইবে যে, 'দোজখ হইতে ঐ সমস্ত লোকদিগকে বাহির করিয়া আন, যাহাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে। বেহেশতীগণ এই আদেশের উপর আমল করিবে। আল্লাহ্পাক আদেশ করিবেন شُفَعَاءُ শুফাআউ। বেহেশ্তীগণ আপন শাফাআত দ্বারা ক্ষমা করাইবে এইবার আল্লাহ্পাক জাল্লাশানুহুর পালা ঃ আল্লাহ্পাক স্বয়ং একটি লব্ ভরিয়া দোজখীদিগকে দোজখ হইতে বাহির করিবেন। তফছীরে রুহুল শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোকজন যাহারা শরীয়ত অনুসারে কাফের ছিল এবং অন্তরের দিক দিয়া মুমিন ছিল। সম্ভবতঃ হজরত আবু তালেব ও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ইহয়া থাকিবে। শরীয়ত অনুযায়ী যাহারা ঈমানদার তাহারাতো شُفَعَاءُ শুফাআউ-র মাধ্যমেই দোজখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এর মধ্যে ঐ লোকজন থাকবে যাহারা শরয়ী ঈমানদার নহে। 'মুনফিক' শব্দটি 'নেফাকুন্' শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে যাহার অর্থ পৃথক হওয়া। যেহেতু, মানুফিকদের দীল ও জবান মুখ ও অন্তর পৃথক পৃথক ছিল। এইজন্যে তাহাদিগকে মুনাফিক বলা হয়। 'নেফাক' বা কপটতা কয়েক প্রকার ঃ- যেমন (১) মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দিবে কিন্তু, অন্তরে স্পষ্ট অস্বীকার বরিবে। (২) মুখে ঈমান প্রকাশ করিবে, অন্তরেও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু বদমজহাব হইবে। (৩) মুখে ইসলাম কবুল করিবে এবং অন্তরেও বিশ্বাস করিবে, কিন্তু দুনিয়ার ভালবাসা এত বেশী হইবে যে, দুনিয়ার স্বার্থকে ঈমানের চাইতে অধিক প্রাধান্য দিবে। ইহারা দুনিয়ার স্বার্থে ইসলামী লস্করের মোকাবেলা করিতে কিংবা ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্টসাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্মের অবমাননা ইহাদের নজদিক কোন বালাই নহে। যে কোন কাফের ইচ্ছা করিলে কিছু টাকা পয়সার মাধ্যমে ইহাদের দ্বারা যে কোন অপকর্ম করাইতে পারে। উক্ত তিন শ্রেণীর লোক শক্ত কাফের। দোজখের সমস্ত তবকের নীচের তবকে ইহাদের বাসস্থান। (৪) এই শ্রেণীর লোকজন এত নির্লজ্জ নহে; কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ কথাবার্তা অনুযায়ী নহে। অর্থাৎ, মুখে এক কথা অন্তরে আরেক চিন্তা। ইহাকে তাকিয়া বলে। আর ইহা হইল শিয়া ফেরকার ধর্মীয় মূলমন্ত্র। এই ধরনের নেফাক বা কপটতাও মুনাফিক সম্প্রদায়ের অন্যতম রীতি ছিল। ঈমানের সত্যতা ও গণ্ডী হইতে ইহা বহুদূরে অবস্থান করে। যাহার সাধারণ জ্ঞান রহিয়াছে সেও ইহাদিগকে ভাল জানেনা। হাদিছ শরীফে কিছু গোনাহ্কেও নেফাক বলা হইয়াছে। যেমন– বর্ণিত আছে, মুনাফিক লোকের কয়েকটি আলামত রহিয়াছে। যথা– (১) যখন কথা বলিবে মিথ্যা বলিবে, (২) কাহারও

সহিত ঝগড়া হইলে গালি-গালাজ করিবে। (৩) ওয়াদা পূরণ করিবে না, (৪) কেহ যদি কিছু আমানত রাখে তবে খেয়ানত করিবে। এই সমস্ত আমালী নেফাক বা মুনাফেক লোকদের কাজ, এতেকাদী নেফাক বা আন্তরিক কপটতা নহে। এই কাজসমূহ মুনাফিকদের কর্মজীবনের নমুনা ছিল।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ এই আয়াত শরীফ মর্মে প্রতীয়মান হইল যে, যত ফেরকা বা দল ঈমানের দাবী করে অথচ কুফুরী আকীদাও পোষণ করে সবাই ইসলাম হইতে খারিজ। কেননা, শুধু দাবীদার হইলে কেহ ঈমানদার প্রমাণিত হয় না। ঈমানদারের জন্যে বিশুদ্ধ আকীদার প্রয়োজন, যাহা অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা হয়।

তৃতীয় উপকারিতা ঃ– মুনাফিকদিগকে من الناس 'মিনান্নাছ' বলা হইয়াছে যদ্বারা ঐ দিকে ইশারা হইয়াছে। যে, এই লোকসকল বাহ্যিক ছুরতে মুসলমান যাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহারা মানবিক পূর্ণতা বা কামালাত ও গুণাবলী হইতে এতদূর খালি যে, তাহাদের কথা বলাই বাহুল্য; বরং এ পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহারাও মানুষ। এক্ষণে, ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, কাহাকেও শুধু মানুষ তাহার সর্ব প্রকার গুণাবলী, মর্যাদা ও কামালাতকে অস্বীকার করা হয়। এইহেতু, কোরআনে কারীমে জায়গায় জায়গায় নবীগণকে যাহারা মানুষ বলিয়া উক্তি করিয়াছে তাহাদিগকে কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা, এই শব্দটি মূলত: নবীগণের শানে বেয়াদবীপূর্ণ; এবং ইহা কাফেরদের রীতি (তাফ্ছীরে খাজায়েনুল এরফান)।

চতুর্থ উপকারিতা ঃ- এ আয়াত শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, মুনাফিক সম্প্রদায় প্রকাশ্য কাফেরের চাইতেও জঘন্য ও নিকৃষ্টতর। ইহার কয়েকটি কারণ রহিয়াছে। যথা– (১) কাফের তো কেবল কাফেরই; কিন্তু মুনাফিক কাফের এবং ধোকাবাজ বা প্রবঞ্চকও বটে (২) কাফের তো শুধু কাফের কিন্তু মুনাফিক কাফের এবং মিথ্যাবাদী (৩) কাফের কেবলই কাফের কিন্তু মুনাফিক কাফের এবং ইসলামের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপকারী।

প্রথম প্রশ্ন ঃ– মুনাফিক দল আল্লাহ্তায়ালা এবং কিয়ামতকে দ্বীলের দ্বারা মানিত। তবু, কোরআনে কারীম তাহাদের এই বিশ্বাসকে কেন অস্বীকার করিল?

উত্তর ঃ– এইজন্যে যে মুনাফিকদল আল্লাহ্ ও কিয়ামতকে ভ্রান্ত উপায়ে মানিত। আল্লাহ্পাককে আওলাদ বিশিষ্ট এবং কিয়ামতের দিনকে তাহাদের মুক্তির দিনরূপে মানিত। আর এ উভয় ধারণাই তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামাকে মানা ব্যতীত অন্য কিছুকে মানা আল্লাহ্পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহাই প্রকৃত তাওহীদ যাহা নবুওয়ত-রেছালাতের স্বীকৃতিসহ কবুল করা হয়। মুনাফিক দল তদনুরূপ নহে। কেননা, তাহারা ছরকারে দো-আলম হুজুর পোরনূর মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে অস্বীকৃতির অবস্থায় আল্লাহ্কে স্বীকার করিত। এইহেতু, বলা

হইয়াছে যে ইহারা আল্লাহ্‌কেও মানে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ– কিয়ামতকে দিন কেন বলা হয়, দিন তো সূর্যের দ্বারা হয়? আর ঐদিন তো সূর্য বিলুপ্ত ইহয়া যাইবে?

উত্তর ঃ– কিয়ামত আসিবার পূর্বে সীমাবদ্ধ দিন ছিল, এবং ইহা কিয়ামতের আগমনে সমাপ্ত হইয়া গেল। এক্ষণে, ইহার সীমা অনন্তকাল পর্যন্ত। এইজন্যে ইহাকে শেষ দিন বলা হয়। কিয়ামতের দিনের সীমা সম্পর্কে দুইটি মত রহিয়াছে। কতিপয় উলামার মতে ঐ দিন মৃত ব্যক্তিদের পুণরোত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া। আল্লাহ্‌পাকের ফায়সালার উপর উহার সমাপ্তি ঘটিবে। অর্থাৎ, যখন সমস্ত বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং কাফেররা দোজখে থাকিয়া যাইবে তখন ঐ দিনের শেষ হইবে। আবার কতিপয় জ্ঞানীজন বলেন– এই দিবসের শেষ নাই (তাফছীরে কবীর)।

يَخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ ط

অর্থঃ– তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং ঈমানদারদিগকে ধোকা দিতেছে অথচ তাহারা নিজেদেরকে ব্যতীত (অন্যকে) ধোকা দিতেছে না। বস্তুত: তাহারা উপলব্ধি করিতেছে না।

সম্পর্কঃ– এই আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত দুইভাবে রহিয়াছে। প্রথমত ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের বেঈমানী সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এক্ষণে, তাহাদের অপকর্মের আলোচনা বয়ান করা হইতেছে। কেননা, কুফরকে আমলের উপর মোকাদ্দম বা অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। অর্থাৎ, কুফুরীর কথা আগে বলিয়া আমলের কথা পরে বলা হইয়াছে। এইজন্যে কুফুরীর আলোচনা আগে; আমলের কথা পরে। **দ্বিতীয়ত ঃ–** পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদিও তাহারা ঈমান প্রকাশ করে তবু তাহারা মুমিন নহে। আর এই আয়াতে ইহা কবুল না হইবার কারণ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তাহাদের ঈমান প্রকাশ বিশুদ্ধ ছিল না বরং উহা ছিল ধোকা দেওয়ার উদ্দেশে। এইহেতু, উহা কবুল হয় নাই। ছোব্‌হানাল্লাহ্! কী সুন্দর ফায়সালা! একমাত্র বিশুদ্ধ ব্যক্তিগণই কালেমা পাঠ করতঃ মুমিন হইতে পারে। এবং মুনাফিক সম্প্রদায় এ কালেমা পাঠ করিয়াই অধিকতর বেদ্বীন হইয়াছে। কেননা, শব্দসমূহে নিয়তের সম্পর্ক বড়ই গভীর। মাখন বাহির করা দুধ যদিও রঙ্গ ও ছুরতে দেখিতে দুধের মতই দেখা যায়, কিন্তু বাজারে ইহার এক পয়সাও মূল্য নাই। তদ্রূপ, বিশুদ্ধ নিয়ত মাখনের ন্যায়। কাজেই, শুধু মুখের ভাল ভাল কথা যাহার মধ্যে আন্তরিক বিশুদ্ধতা নাই, তাহার কোনও মূল্য নাই।

তাফছীর ঃ– يخدعون 'ইউখাদিউনা' خدع খাদউন শব্দ হইতে বাহির হাইয়াছে। যাহার আভিধানিক অর্থ গোপন করা। এইজন্যে

'খাজানা' বা ব্যাংককে আরবীতে مُخْدَعْ মুখ্দা' বলা হয়। কেননা, উহাতে টাকা-পয়সা গোপনে রক্ষিত থাকে। এবং গর্দানের গোপন রগকে اخدعين বলাহয়। পারিভাষিক অর্থে خدع খাদাআ শব্দ দ্বারা বুঝায় ধোকা অর্থাৎ, মন্দকে অন্তরে গোপন রাখিয়া ভালকে প্রকাশ করা। .... الله ... আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্ তায়ালার জাত বা সত্ত্বাকে। তবে يخدعون ইউখাদিউনার দ্বারা বুঝায় ধোকা দিবার চেষ্টা করে। কেননা, আল্লাহ্পাককে ধোকা দিতে পারে না। হয়ত আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা বুঝায় রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। কেননা, কোরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বুঝান হইয়াছে যেন মানুষের মধ্যে রাসুলেপাকের মর্যাদার পরিচয় প্রকাশ পায়। মানুষ যেন বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্পাকের দরবারে রাসুলে পাকের এতদূর সম্মান। তাঁহার গোলামী, স্বয়ং আল্লাহ্পাকেরই গোলামী। পক্ষান্তরে, হুজুরে পাকের বিরোধীতা আল্লাহ্পাকেরই বিরোধীতা। হুজুরে পাককে ধোকা দেওয়া আল্লাহ্পাককে ধোকা দেওয়ারই নামান্তর। কোরআনে কারীমের একজায়গায় আছে– আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন– হে মাহবুব! যে ব্যক্তি আপনার নিকট বয়াত গ্রহণ করিবে অর্থাৎ মুরীদ হইবে সে যেন আল্লাহ্র নিকট বয়াত গ্রহণ করিল অর্থাৎ মুরীদ হইল। আল্লাহ্র হাত রসুলে পাকের হাতের উপর। আরেক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে– পাথর নিক্ষেপ নবীয়ে পাক করেন নাই, স্বয়ং আল্লাহ্পাক নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই রীতি অনুসারে বলা হয় যে, মুনাফিকদল আল্লাহ্কে অর্থাৎ, রাসুলে পাককে ধোকা দিবার চেষ্টা করে। (তাফছীরে কবীর, তাফছীরে রুহুল বয়ান ও তাফছীরে আজিজী ইত্যাদি।

انفسهم আনফুছাহুম– "আন্ফুছ" শব্দ নফ্ছের বহুবচন। নফ্ছ শব্দের কয়েকটি অর্থ– (১) জাত, (২) রুহ্, (৩) দ্বীল, (৪) দ্বীলের রক্ত এবং (৫) পানি। এইস্থানে প্রথম অর্থই বুঝায়। অর্থাৎ মুনাফিকরা প্রকৃত পক্ষে নিজেকেই ধোকা দিতেছে। কারণ, যে ব্যক্তি উত্তম জিনিস ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ জিনিস গ্রহণ করে এবং নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে সে বড় বেকুফ। অতঃপর সে মস্তবড় ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং মুনাফিক সম্প্রদায় দ্বীন ছাড়িয়া দুনিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাতে বড় আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়াও তাদের হাতে আসিল না, বরং যাহা মিলিল তাহা বড়ই নিদারুণ অপমাণ, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা। পরিণামে ইহারা নিজেদেরকেই ধোকা দিল প্রতারণা করিল। পক্ষান্তরে, ছাহাবায়ে কেরাম ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও উহার মাল-আসবাব বা ধন-ঐশ্বর্য তথা উহার মোহ ও আরাম-আয়েসকে হাসিমুখে বর্জন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও রাসুলকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের রেজামন্দি বা সন্তুষ্টির পথে– জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন দুনিয়াও কুলটা রমণীর ন্যায় তাঁহাদিগের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে, এইসকল মহাত্মাগণ ও তাঁহাদের পদাংক অনুসারীরা পরম সফলতার পথে রহিয়াছে।

و ما يشعرون ওয়ামাইয়াশ্‌উরুন– 'ইয়াশ্‌উরুন্' শব্দ 'শুউর' শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। শুউর বলা হয় অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করাকে। এইজন্যে অনুভূতিকে আরবীতে মাশায়ের বলা হয়। শে'র বলা হয় চুলকে, এবং যে পোশাক শরীরকে স্পর্শ করিয়া থাকে তাহাকেও শেয়ার বলা হয়। কবিতাকে এইজন্যে শে'র বলা হয় যে, উহার ভাল-মন্দ, উহার ছন্দের মিল বা শুদ্ধা-শুদ্ধ অনুভূতি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আয়াত শরীফের মকছুদ এই যে, ঐ কম-বখ্‌তদের অনুভব শক্তি এতদূর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহারা এই হেন প্রকাশ্য জিনিসকেও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্যে, ইহারা দিবা-নিশী লক্ষ্য করিতেছে যে, ইহাদের এত গোপণীয় বিরোধীতার ফলেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কোন বিঘ্ন ঘটিতেছে না বরং; দিনের পর দিন উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হইতেছে। ইহাও পরিলক্ষিত হইতেছে যে, মুসলমানগণ এখন আর ইহাদেরকে কোনক্রমে বিশ্বাস করিতেছে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইহাদের অন্তরের খারাপ ধারণা, বা কপটতার অবসান হয় নাই। ইহাদের (মুনাফিকদের) তুলনা জামাদাত্ অর্থাৎ হট-পাথরের ন্যায় জড় পদার্থের সহিত। কেননা, জানোয়ারদেরও অনুভব শক্তি রহিয়াছে।

খোলাছা তাফছীর ঃ– এই আয়াতের খোলাছা তাফছীর এই যে, মুনাফিকরা যাহা বলে– "আমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনিয়াছি; তাহাতে তাহাদের ধারণা যে, 'আমরা আল্লাহ্, রাসুল ও মুমিনগণকে ধোকা দিতেছি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজেদেরকেই ধোকা দিতেছে। কেননা, আল্লাহ্‌পাক 'আল্লামুল গুয়ুব'- যিনি সর্বক্ষণ সকল গায়েবী সংবাদ অবগত, তাঁহার নিকট কোন কিছুই গোপণীয় নহে। সে ধোকা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে যে হাকীকত হইতে তিনি না-ওকেফ– আর একথা হইতেই পারে না। শানে আজমতের খেলাফ। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্‌পাকের খলিফায়ে আজম– শ্রেষ্ঠতম খলিফা। আল্লাহ্‌পাক আপন হাবীবকে সমস্ত গায়েবের এলে্ম দান করিয়াছেন। আর হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তো সর্ব প্রথম বা সৃষ্টির আউয়াল হইতেই সকলের হাকীকত ও পরিণাম সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। কেননা, মে'রাজের রজনীতে সমস্ত কাফের ও মুমিনগণকে হুজুরেপাক দেখিয়া আসিয়াছেন। ছাহাবাগণকে, মুমিনগণ ও কাফেরদের নামসহ উহাদের তালিকা দেখিয়া আসিয়াছেন। হুজুরেপাক বড় বড় কফেরদের ঈমানের সংবাদও প্রদান করিয়াছেন পরবর্তী সময়ে যাহারা মুমিন হইয়াছিল। এবং বড় বড় পরহেজগারদিগের দোজখী হইবার খবরও দিয়াছিলেন– যাহারা অবশেষে দোজখী হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। হুজুরেপাক আরও সংবাদ দিয়াছেন যে, হজরত হাসান এবং হোসাইন বেহেশ্‌তে যুবকগণের সরদার

হইবেন। হুজুরেপাক ফরমান– আমার কলিজার টুকরা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বেহেশ্‌তী রমণীগণের সদরদার হইবেন। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে– আবু তালেব দোজখের মধ্যে নহে বরং দোজখের জিরের মধ্যে থাকিবে। তাহার পায়ের তলে দোজখের ১টি ফুরুঙ্গী থাকিবে।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহেও ওয়াছাল্লাম বেহেশ্‌তী ও দোজখীদিগকে চিনিতেন। তাহাদের সম্মান ও অপমান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এইহেতু, মুনাফিকরা তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে না। তদ্রূপ, মুসলমানও নিজ ঈমানের নূর দ্বারা মুমিন ও কাফের চিনিতে পারে। যেমন– হাদিছ শরীফে আসিয়াছে– মুসলমানের জেহানাত্‌কে ভয় কর, কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা দেখিয়া থাকে। উপরন্তু, আল্লাহ্-ওয়ালাগণের নিকটে কোন জানোয়ার আসিলে সেও কাফেরের পার্থক্য করিতে পারে। হজরত ছফিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে একটি বাঘ আসিয়াছিল। তিনি সে বাঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন– 'হে বাঘ! আমি রাসুলে পাকের গোলাম।' তৎক্ষণাৎ, সে বাঘ ইহা শ্রবণ করতঃ কুকুরের ন্যায় লেজ নাড়িতে লাগিল। মেশকাত শরীফ, বাবুল কেরামত দ্রষ্টব্য। আবু লাহাবের পুত্র উতবা হুজুরেপাকের সহিত বেয়াদবী করিয়াছিল; সেই কারণে এক বাঘ তাকে বহু লোকের মধ্য হইতে মুখ সুঙ্গিয়া বাহির করতঃ চিড়িয়া ফেলিল। এইহেতু, মুনাফিকদল মুসলমানদিগকেও ধোকা দিতে সক্ষম নহে। কিন্তু যেহেতু, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং মুসলমানগণ তাদের দোষ ও নেফাক প্রকাশ করেন নাই; এইহেতু, মুনাফিকরা ধারণা করিয়াছে যে, 'আমরা ধোকা বা প্রতারণা করিয়া সফল হইয়াছি।' প্রকৃতপক্ষে ইহারা না পারিয়াছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুলকে ধোকা দিতে এবং না পারিয়াছে মুসলমানদিগকে ধোকা দিতে, বরং তাহাতে নিজেরাই ধোকায় পড়িয়াছে– প্রতারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা এই রহস্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, ইহাদের প্রলাপোক্তিতে মুসলমানগণ নীরব থাকার তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে তাদের দোষ গোপন রাখা। যাহার মধ্যে হাজার হাজার রহস্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু, এই ধোকা বা প্রতারণার প্রভাব উল্টাভাবে মুনাফিকদের নিজেদের উপরই পড়িয়াছে; এইহেতু, অবশেষে ইহারা দুনিয়ায় দারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হইয়াছে। অতঃপর, পরকালে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আজাবেরযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু, তাহাদের অনুভব শক্তিতে ত্রুটি আসিয়াছে, এইজন্যে তাহারা ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ছুফীয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন– মানুষের নিকট এ তিনটি দলই মওজুদ রহিয়াছে। রূহে ইনছানী খাঁটি মুমিন এবং শয়তান প্রকাশ্য কাফের। কিন্তু নফ্‌ছে আম্মারা মুনাফিক যাহা দ্বীলের সহিত মিশিয়া নিজেকে উহার বন্ধুরূপে জাহির করিয়া থাকে। কিন্তু যে দ্বীলে আল্লাহ্ তায়ালার দয়া থাকে ঐ দ্বীলে নফ্‌ছে আম্মারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বরং অবশেষে নিজেই অপারগ হইয়া অনুগত হইয়া যায়।

১নং প্রশ্ন ঃ– يخدعون ইউখাদিউন مخادعت মুখাদাআত্ হইতে বাহির হইয়াছে, যাহার অর্থ একজন আরেকজনের সহিত ধোকাবাজি করা। যেহেতু, এই আয়াতের অর্থ এই হইয়াছে যে, মুনাফিক আল্লাহ্কে এবং মুসলমানকে ধোকা দেয় এবং আল্লাহ্ও মুসলমান তাহাদিগকে ধোকা দেয়। এবং কাহাকেও ধোকা দেওয়া আল্লাহ্র শানের খেলাফ এবং মুসলমানদেরও।

উত্তর ঃ– ইহার প্রথম উত্তর এই যে, কয়েক জায়গায় বাবে মুফালিয়াত্ শিরকাত্ হইতে খালি হইয়া থাকে। যেমন– سافرت 'ছাফার্তু' অর্থ– আমি ছফর করিয়াছি। عاقبت اللص 'আকাব্তুল্লুচ্ছা' অর্থ– চোরকে সাজা দিয়াছি। ইহার অর্থ– এই নয় যে, চোরও আমাকে সাজা দিয়াছে। এই জায়গায় এই অর্থই বুঝায়।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ– এই স্থানে শিরকাতের জন্যেই এবং আয়াতের অর্থ হইবে যে, মুনাফিকরা নিজের ঈমান জাহির করিয়া মুসলমানকে ধোকা দিতে চায়, এবং মুসলমানও তাহাদের ঈমানের হাকীকত অবগত হইতে পারিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে– তাহাদের সহিত জেহাদ করে না। এবং তাহাদের উপর জিজিয়া নামক কর প্রয়োগ করে না। যাহার দ্বারা মুনাফিকরা বুঝিয়া নেয় যে, তাহাদের কৌশল সফল হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা মস্তবড় ধোকায় নিজেদেরকে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফেও এই জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মুনাফিক সম্প্রদায় দোজখে এক যুগ পর্যন্ত অবস্থান করিবে তখন হঠাৎ একদিন দোজখের দরজা খুলিয়া যাইবে। যাহা দ্বারা বুঝিতে পারিবে যে গুনাহ্গার মুসলমানের মত আমাদরেও বাহির হইবার সময় হইয়াছে। এবং যখন দরজায় গিয়া পৌঁছিবে তখন দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। আর তাহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া তাহাদের পূর্বের জায়াগায় পুনরায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে কোরআনে পাকে ইরশাদ হইয়াছে– يخدعون الله و هو خَادعهم ۔

এবং ইহাদের ধোকাবাজীর শাস্তি ইহাই। এবং অপরাধীর অপরাধের শাস্তি দেওয়া কোন দোষের কাজ নহে।

২নং প্রশ্ন ঃ– এই জায়গায় বলা হইয়াছে যে. মুনাফিকরা জানেনা. অপর এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, ... تكتمونَ الحق و انتم تعلمون ۔ তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্য গোপণ করিয়া থাক। যাহার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তাহারা সবকিছুই জানে। এক্ষণে, এ উভয় আয়াতের সমন্বয় সাধন কিরূপে হইবে?

উত্তর ঃ– মুনাফিক সবকিছু জানিত; কিন্তু ইহাতে আমল করিত না। এই কারণেই যে, তাহারা জাহেল ছিল। আমল না করার কারণে এই জায়গায় তাহাদিগকে জাহেল বা মূর্খ বলা হইয়াছে। যেমন– কাফেরদিগকে অন্ধ, বধির,

বোবা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। বে-আমল আলেমকে জাহেলের ন্যায়, বখিল মালদারকে ফকির সমতুল্য; কাজেই মুনাফিকদিগকে জাহেল আখ্যা দেওয়া তাদের আমলের অভাব হেতু। আর তাহাদিগকে আলেম তাহাদের এল্‌মের প্রেক্ষিতে। مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ط بِمَا
فِىْ قُلُوْبِهِمْ كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

অর্থঃ– তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে ব্যাধি, আর আল্লাহ্‌পাক তাহাদের এ ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাদের জন্যে রহিয়াছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাহাদের মিথ্যাচারের কারণে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ– পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের বদ আমলের আলোচনা ছিল, এক্ষণে, এ আয়াতে তাহাদের বদ-আমলের কারণ বর্ণিত হইতেছে। অর্থাৎ, তাহাদের এই ধোকাবাজির একমাত্র কারণ ইহাই যে, তাহাদের অন্তঃকরণ রোগাক্রান্ত; আর এই রোগ-ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। অথবা ইহা হইতে পারে যে, প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের বদ-আমলের কথা ছিল, এক্ষণে, ইহার ফলাফল বর্ণনা করা হইবে। অর্থাৎ, ইহারা এই ধরণের কাজে লিপ্ত রহিয়াছে যার ফলে তাহাদের সুস্থ্য হওয়ার পরিবর্তে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। যেমন– কোন ডাক্তার বলে যে, অমুক রোগী পথ্য ঠিক না রাখার কারণে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত বা পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের কথা ও কাজের বর্ণনা ছিল, আর এ আয়াতে তাহাদের অন্তরের অবস্থা বয়ান করা হইবে। কেননা, এইস্থানে তাহাদের কওল ও ফেইল অর্থাৎ কথা ও কাজের প্রভাব যে তাহাদের অন্তরে বিস্তার লাভ করিতেছে– ইহারই বর্ণনা। এইহেতু, দ্বীলের অবস্থাকে এতদুভয়ের পরেই বর্ণিত হইয়াছে।

তাফছীর ঃ مرض মারাদুন দেহের ঐ অসুস্থ অবস্থাকে বলা হয়, যার ফলে শারীরিক কাজ-কর্মের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। যেমন- জ্বর শরীরের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে বাধা দান করে। কিন্তু আপতঃ সৃষ্টিতে আত্মার অসুস্থ অবস্থাকেও রোগ বলা হয়। যাহার ফলে, আত্মার কামালাত বা বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। যেমন– জেহালত বা অজ্ঞতা, বদ-আকীদা বা ভ্রান্ত-বিশ্বাস হিংসা-বিদ্বেষ, দুনিয়ার ভালবাসা বা সংসারাসক্তি এবং মিথ্যা ও জুলুম ইত্যাদি। এই সমস্ত রুহানী ব্যাধির ফলে আত্মার কামালাত বা পূর্ণতা বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে, এই সকল ব্যাধি কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিতে বাধ্য করে– যাহা আত্মার জন্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এবং ইহার অনিবার্য পরিণতি রুহানী মৃত্যু।

অন্তরের রোগ কয়েক প্রকার ঃ– (১) যাহার সম্পর্ক ধর্মের সহিত রহিয়াছে। যথা– বদ-আকীদা, (২) কুফুরী, (৩) যাহার সম্পর্ক চরিত্রের সহিত রহিয়াছে। যেমন– হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি। (৪) যাহার সম্পর্ক কাজ-কর্মের সহিত রহিয়াছে; যেমন– খারাপ ধারণা ইত্যাদি। এইস্থানে প্রথম প্রকারের ব্যাধি বুঝায়। অর্থাৎ

তাহাদের অন্তঃকরণে বদ-আকীদা এবং কুফুরী তো পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে, উহা দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, আয়াতে কারীমায় এ তিন প্রকারের ব্যাধিই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, মুনাফিকদের অন্তরে বদ-আকীদা, বদ-চরিত্র ও বদ আমল রহিয়াছে। এবং এইসব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ ফাযাদা– যাদা লাজেমও হয় এবং মু'তাদি ও অর্থাৎ, বেশী হওয়া। এবং বেশী হইয়াছে। এইস্থানে মুতাআদীর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্পাক তাহাদের ব্যাধিকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এই বৃদ্ধি কয়েকটি প্রণালীতে হইয়া থাকে। যথা– (১) তাহারা (মুনাফিকদল) ইসলাম ও উহার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া চিন্তিত হইত। আল্লাহ্তায়ালা ইসলামের প্রচার ও বিজয় দ্বারা তাহাদের চিন্তাকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। (২) তাহাদের অন্তরে বদ-আকীদা ও নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রতি দুষমনি ছিল। আল্লাহ্পাক তাহাদের অন্তরে এমনি ধরনের মোহর মারিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের অন্তঃকরণে ওয়াজ-নছিহত বা সদুপদেশের কোন প্রভাব না পড়িতে পারে। (৩) আল্লাহ্পাক তাহাদের কুফুরীকে বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহা এইরূপে যে, যে পরিমাণ শরীয়তের আহ্কাম বৃদ্ধি পায়, তাহাদের অস্বীকার ও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন– দশ খানা আয়াত নাযিল হইয়াছে আর তাহারাও দশ খানাই অস্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে, আরও পাঁচ খানা আয়াত আসিলে পনরটি অস্বীকার বা কুফুরী হইবে। উহা হয়ত এইভাবে যে, প্রথমতঃ এবাদতের আয়াত আসিয়াছিল– তাহা তাদের মাথার উপর মস্ত বোঝা স্বরূপ ছিল। এক্ষণে, শাস্তি ও জেহাদের আয়াত যখন আসিল তখন তাহাদের উপর বিপদ চাপিয়া গেল। আল্লাহ্র শান! যে, শরীয়তের আহ্কাম এবং কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইতে মুসলমানদিগের ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হয়। পক্ষান্তরে, কুফ্ফারদের কুফুরীর সংক্রামক ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন– বৃষ্টির পানি নাপাক ও অপবিত্র বস্তুতে পড়িলে উহার নাপাকীও অপবিত্রতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং পাক-পবিত্র বস্তুতে পড়িলে উহার পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। আয়াতে কারীমার তাৎপর্য ইহাই। অথবা উহা এইরূপে যে, তাহারা যখন প্রকাশ্য কাফের ছিল তখন তাহাদের বাহাদুরী প্রকাশ পাইত। কিন্তু যখন ইসলামের জয়কার দেখিতে পাইল তখন তাহার অন্তর দুর্বল হইয়া পড়িল। যাহার ফলে মুনাফিক হওয়ায় তাহারা দুর্বল হইয়াছে। এবং দুনিয়ায় যেমন– তাহাদের রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি পরকালে তাদের আজাব বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে মুসলমানদের ছওয়াব ও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

عذاب اليم আজাবুন আলীম– اليم আলীমুন الم আলামুন হইতে বহির হইয়াছে যাহার অর্থ কষ্ট এবং দুঃখ। আলীম শব্দের অর্থ– যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টদায়ক। কাফেরের আজাবকে আজীম বলা হইয়াছে এবং

মুনাফিকের আজাবকে আলীম বলা হইয়াছে। এইজন্যে যে, কাফেরদের তুলনায় মুনাফিকদের আজাব অধিক হইবে। কারণ, কাফেররা ঈমানের স্বাদ মোটেই পায় নাই। আর জাহেরী ঈমানের অনুভূতি পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে ছিল না। তাদের এ খবরও ছিল না যে নামাজের মধ্যেই বা কি এবং ঈমানের মধ্যেই বা কী রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু মুনাফিক ঈমানের দ্বারপ্রান্তেও উপনীত হইয়াছিল। এবং ঈমানের সুমধুর আস্বাদ তাহাদের মুখ ও তালুতে লাগিয়াছিল বটে কিন্তু উহার ফল উপভোগ করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই, বঞ্চিতের বঞ্চনার কী নিদারুণ যাতনা তাহা অনুভব করিবে। যেমন– এক ব্যক্তি ভাল ফলের আস্বাদ গ্রহণ করে নাই; অপর এক ব্যক্তি ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পায় না। তবে না পাওয়ার যন্ত্রণা বা অনুতাপের অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেননা, সে স্বাদ গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে। (তফছীরে আজিজী)।

প্রকাশ্য কাফেররা তো শুধু দোজখের আজাব ভোগ করিবে। আর মুনাফিকদের আজাবও হইবে এবং বিদ্রোপও হইবে। এইজন্যে তাহাদের কষ্টও বেশী হইবে। কেননা, তাহারা দ্বীন ও ঈমানকে মিথ্যা জানিয়াছিল, মিথ্যা বলিয়াছিল। এইহেতু তাহাদিগকে দোজখের সব চাইতে নীচের তবকায় রাখা হইবে। সেথায় দোজখের অন্যান্য তবকা হইতে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি নীচে আসিবে এবং ইহা তাহাদিগকে পান করান হইবে, কুফুরীর কারণে আজাব হইবে, এবং ধোকাবাজীর কারণে এ যন্ত্রণা ও কষ্ট হইবে। يكذبون ঐ দিকে তাহাদের উপর বিপদ মিথ্যার কারণেই পতিত হইয়াছে। يكذبون ইউকজ্জিবুনা كذب কিজ্‌বুন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ– মিথ্যা। মিথ্যা কায়েক প্রকার ঃ– (১) কথা-বার্তায় মিথ্যা এইরূপে যে, আসল ঘটনার বিপরীত সংবাদ দেওয়া। (২) কার্যকলাপে মিথ্যা ব্যবহার। যেমন– আসল কথার বিপরীত কাজ করা। অর্থাৎ, মুখে এককথা আর কাজে আরেকটা প্রকাশ করা। (৩) আকীদার মাঝে মিথ্যা আচরণ, যেমন– গলত্ব আকীদা বা ভ্রান্ত-বিশ্বাস পছন্দ করা। যথা– আল্লাহ্ এক; আবার কাহারও আকীদা আল্লাহ্ অনেক এ আকীদা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। প্রত্যেক মিথ্যাই খারাপ ও নিন্দনীয়। আকীদার মিথ্যা অত্যন্ত খারাপ ও জঘন্য আর মুনাফিকদের সর্বদিক দিয়াই মিথ্যা ছিল। বর্ণিত আয়াত শরীফের মর্মে জানা গেল যে, মিথ্যা খুবই জঘন্য অপরাধ ও গোনাহ্। এবং অশ্লীলতা দোষ বটে, কিন্তু উহা সহস্র প্রকার গোনাহের মূল। যদি কেহ মিথ্যা না বলিবার অঙ্গীকার করে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ বহুবিধ গোনাহ্ হইতে সে রক্ষা পাইবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম সমস্ত গোনাহ্ হইতে বিশেষতঃ মিথ্যা হইতে সম্পূর্ণ মাহ্‌ফুজ, মাসুম, সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিষ্পাপ। যাহারা নবীগণকে মিথ্যা জানে বা নবীগণের শানে আজমতের মাঝে মিথ্যা আরোপ করে তাহারা বেদ্বীন ও বেঈমান। হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামের সম্বন্ধে যাহা আসিয়াছে তিনি

মাআজাল্লাহ্ তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলেন। আসলে উহা মিথ্যা ছিল না। উহা ছিল মিথ্যার স্থলে তা'রিজ বা অস্পষ্ট কথা। যাহা ছিল দুইটি অর্থ প্রকাশক বাক্য; সংক্ষেপে দ্যর্থবোধক বাক্য। এই তা'রিজ জরুরী প্রয়োজন বশতঃ জায়েজ হইয়া থাকে। যেমন– হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামে ছারাহ-র সম্বন্ধে এক সময় এক জালিম বাদশা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভাবিলেন– 'যদি বিবি বলিয়া প্রকাশ করি তবে এ জালিম তাহাকে জোর পূর্বক ছিনাইয়া নিবে।' কাজেই তিনি উত্তরে বলিলেন 'আমার ভগ্নি।' জালেম বাদশা বুঝিয়া নিল 'আপন ভগ্নি,' আর তিনি ধারণায় রাখিয়াছিলেন 'ধর্মীয় ভগ্নি।' অনুরূপভাবে, নবীয়ে দো-জাহাঁ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার হিজরতের সময় হজরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাছুলে পাকের সঙ্গে গমণকালে জনৈক কাফের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল– 'হে আবু বকর! তোমার সঙ্গে ইঁনি কে?' হজরত আবুবকর উত্তর দিয়াছিলেন– 'ইঁনি আমার রাহ্বর– পথপ্রদর্শক।' তিনি আসল রহস্য গোপণ রাখিয়া আল্লাহ্র রাহের রাহবর বা দ্বীনের পথ প্রদর্শক ধারণা করিয়াছিলেন। আর ঐ কাফের কিন্তু দুনিয়ার পথের প্রদর্শক বুঝিয়াছিল। ইহা মিথ্যা নহে; ইহারই নাম তা'রিজ। জরুরী, দরকার বশতঃ ইহা জায়েজ।

নোটঃ– মিথ্যা সর্বঅবস্থায় নিষিদ্ধ। তবে কয়েক জায়গা ব্যতীত। যথা– (১) খুবই অপারগ অবস্থায়, (২) মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ মিমাংসার সময়, (৩) নিজের বিবিকে রাজী করাইবার সময় এবং (৪) জেহাদের ময়দানে প্রয়োজন বশতঃ (তফছীরে রুহুর বয়ান, এবং জগৎ বিখ্যাত শামী কিতাব)। মোটকথা, মিথ্যাচারের দরুন। যেমন– পরকালে আজাব হয়, তেমনি দুনিয়াতেও মছিবত আসিয়া থাকে।

খোলাছা তাফছীর ঃ– ইহার খোলাছা তাফছীর বা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকদের ফিত্রাত বা স্বভাবের মধ্যেই কোন মঙ্গল নিহিত নাই। তাহাদের অন্তঃকরণ মিথ্যার দরুন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে যে উত্তম বাণী বা বার্তা নবীয়ে পাকের উপর নাযিল হইত উহার বিরোধীতার ফলে তাহাদের রোগ-ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেরূপ শারীরিক ব্যাধির শেষ পরিণতি মৃত্যু, তদ্রূপ, রুহানী-ব্যাধিরও অন্তিম পরিণতি ভয়াবহ আজাব। বৃষ্টিপাতের ফলে সকল বৃক্ষ ও গাছপালা বৃদ্ধি পায়। যেসব বৃক্ষের বীজ খারাপ উহাতে কাঁটা জন্মে এবং উহার ফল হয় টক ও বিশ্বাদ। আর যেসব বৃক্ষের বীজ উত্তম উহাতে উত্তম ফল-ফুল জন্মে। অনুরূপভাবে, কোরআনে কারীমের আয়াত রহমতের বৃষ্টিতুল্য– যাহা দ্বারা মুমিনগণ শেফা বা আরোগ্য লাভ করে, আর যাহার ফিত্রাত বা স্বভাবের মধ্যেই দোষ রহিয়াছে, সেই কাফের ও মুনাফিকদের আত্মার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। ইহার দরুন তাহারা নিজেরাই দায়ী ও অপরাধী, কোরআনে পাক নহে।

ছুফীয়ানা তাফছীর ঃ– মানুষের অন্তরে সাধারণতঃ ভাল-মন্দ উভয় ধারণা বা খেয়ালেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। উত্তম ধারণা-কল্পনা যাহা রহমানী এল্হামরূপে

অভিহিত উহার জন্যে একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছে। আর মন্দ ধারণা বা খেয়াল শয়তানী ওয়াছ্‌ওয়াছা বা কুমন্ত্রণার ফলেই হইয়া থাকে। যে হৃদয়ে আল্লাহ্ তায়ালার অপার করুণা রহিয়াছে সে হৃদয়ে এল্‌হাম বেশী হয়, ওয়াছ্‌ওয়াছা-কুমন্ত্রণা কম হইয়া থাকে। বরং কিছু কিছু আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দা এমনও রহিয়াছেন যাহারা উক্ত ওয়াছ্‌ওয়াছা-কুমন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র রহিয়াছেন। আর যাহাদের অন্তরে রোগ-পীড়া বিদ্যমান, তাহাদের এল্‌হাম কম হয় এবং ওয়াছ্‌ওয়াছা অধিক হইয়া থাকে। যদি কোন উপযুক্ত রুহানী চিকিৎসকের দ্বারা ঐ রোগের চিকিৎসা করান হয় অন্তর সুস্থ হইয়া যায়। নতুবা ঐ রোগ বৃদ্ধি পাইয়া এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যখন হৃদয়ে ভাল ধারণা উদয় হওয়া তো দূরের কথা মন্দ ধারণাও খেয়াল সে হৃদয়ে দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া যায়। অতঃপর, এমন রুগ্ন-দ্বীলের অধিকারী ব্যক্তি মন্দকাজকে ভাল এবং ভাল কাজকে মন্দ জানিতে শুরু করে। আর বদ্‌কার লোকদিগকে বন্ধুভাবাপন্ন এবং নেক্‌কার লোকদিগকে ঘৃণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না বরং উহাতে অভ্যস্ত হইতে থাকে। ইহাকেই আত্মার মৃত্যু বলা হয়।

কখনো কখনো দ্বীল হইতে গায়েবী আওয়াজ আসিয়া থাকে, যার বদৌলতে মানুষ মন্দ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে সমর্থ হয় এবং খারাপ কাজের জন্যে তিরস্কার করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় বান্দাগণের এ আওয়াজে বড়ই শক্তিশালী হইয়া থাকে, আর মন্দ পথে তাঁহারা কখনো পা বাড়ায় না। অপরদিকে গোনাহের আধিক্যতাহেতু দ্বীলের ঐ অদৃশ্য আওয়াজ বড়ই দুর্বল হইয়া থাকে, বরং উহা অসংলগ্ন হইতে বন্ধ হইয়া যায়। তারপর গলত্ব ও ভ্রান্ত আওয়াজ আসিতে থাকে। যার ফলে গোনাহ্‌র কাজে বড়ই আনন্দ ও স্বাদ পাইতে থাকে। ইহাও কাল্‌ব্ বা আত্মার মৃত্যু। আর বর্ণিত আয়াতে কারীমায় এইসমস্ত ব্যাধির আলোচনাই আসিয়াছে।

যেরূপ, কোন কোন ঔষধ ও কোন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানের আবহাওয়া দৈহিক ব্যাধির নিরাময় সুস্থতা আনয়নে সহায়ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ, কিছু কিছু আমল ও কিছু সংখ্যক পবিত্র জায়গার রুহানী আবহাওয়া রুহানী সুস্থতা বা আত্মার নিরাময় সাধন করিয়া থাকে। আওলিয়াগণের জিয়ারত এবং তাঁহাদের মাজার শরীফে হাজির হওয়ার হুকুম এ কারণেই। তথাকার নির্মল রুহানী আবহাওয়া ঈমানের জন্যে বড়ই উপকারী। যেরূপ, কোন রুগ্নবক্তি ছফর করতঃ ডাক্তারের কাছে গিয়া থাকে; তদ্রূপ গোনাহের কারণে রুগ্নব্যক্তি যদি কোন রুহানী বিশেষজ্ঞের নিকট গমন করে তবে তাহাতে দোষের কি থাকিতে পারে? বুজর্গানে দ্বীনের ওরছমোবারকে যোগদানের ছফর ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাজারশরীফ জিয়ারতের উদ্দেশে ছফরের রহস্য ইহাই। এ বিষয়ে অধিকতর অবগতির জন্যে শামী জিল্‌দে আওয়্যাল, জিয়ারাতুল্ কবুর অধ্যায়, আশ্‌য়াতুল্‌লোম্‌আত্ এবং জাআল্ হক ও অপরাপর তাছাওয়োফের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।

যেরূপ কিছু কিছু রোগ-জীবাণু বায়ুর সাথে উড়িয়া আসিয়া মানুষের দেহে

প্রবেশ করে এবং সংক্রামিত হইয়া রোগ বিস্তার করে তদ্রূপ, রুহানী রোগ পীড়াও মানুষের অন্তরে বাহির হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রবেশ করে। এইজন্যে, বদমজহাব ও বেদ্বীনদের সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করা একান্ত জরুরী।

হেকায়াত ঃ– একদা এক ব্যক্তি কোন এক হাকিম সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল– 'হাকিম সাহেব! আমার গোনাহের ঔষধ দরকার।' এতদশ্রবণে হাকিম সাহেব পেরেশান হইয়া গেলেন। তাঁহার কম্পাউন্ডার ছিলেন একজন আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি। তিনি বলিতে লাগিলেন– 'তওবা নামক বৃক্ষের পাতা, শোকরের ফুল, এবাদতের বীজ, রিয়াজতের মূল সমপরিমাণ লইয়া মোজাহিদার হামানদস্তায় পিশিয়া লও। অতপর চক্ষের পানি দ্বারা উহা ভিজাইয়া ছবরের অগ্নিদ্বারা পাকাইয়া লও। অত:পর এখলাছের চিনি উহাতে মিশ্রিত করিয়া দ্বীলের পাখার বাতাস দ্বারা ঠাণ্ডা করতঃ পান করিও। ইন্শাআল্লাহ্! আরোগ্য লাভ করিবে।' তখন ঐ ব্যক্তি ইহার পথ্য কি তাহা জানিতে চাহিল। তিনি বলিলেন– 'নিজের দ্বীলকে নশ্বর দুনিয়ার আবর্জনা হইতে মুক্ত রাখিবে, যেন বন্ধুর আসন সেই জায়গায় স্থাপিত হইতে পারে। আর তাহার রাস্তা ও দরজাকে এবাদতের ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কার রাখ; গোনাহের আবর্জনা হইতে এতদূর পরিচ্ছন্ন করিবে যেন বন্ধুর আগমনের উপযুক্ত হইয়া যায়। মোটকথা, নিজ নফ্ছ আম্মারার গলায় কোন কামেল পীরের গোলামীর পাট্টা লাগাও যেন উহা মারা না যায়। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্বক আমলের তৌফিক দান করুন।

প্রশ্ন ঃ– এই জায়গায় فى قلوبهم কেন বলা হইল? সংক্ষিপ্ত এবারত এই ছিল قلوبهم مرض অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে রোগ ছিল।

উত্তর ঃ– ইহাতে ঐ দিকে ইশারা করা হইতেছে যে, তাহাদের এই রোগ আরেজী, আছ্লী নহে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لا قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ۰

অর্থ– এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয়– তোমরা দুনিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিও না; তখন তাহারা বলে যে, একমাত্র আমরাই সংশোধনকারী।

সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছিল যে, এই মুনাফিকদের অন্তরের রোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে; আর এক্ষণে, তাহার লক্ষণ বয়ান করা হইতেছে যে, তাহারা ভাল-মন্দের তমিজ করিতে বা পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। বরং সকলকে ভুল বুঝিয়া থাকে। যেমন– চিকিৎসক রোগীকে রোগের লক্ষণসমূহ জানাইয়া দেয় তদ্রূপ, এইস্থানে মুনাফিকদের ঐ রোগের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াত যেন পূর্বের আয়াতের ফলাফল স্বরূপ। ইহার বিপরীতও হইতে পারে। অর্থাৎ, তাহাদের অনুভবশক্তি এতদূর নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা নেক-কাজকে খারাপ এবং বদকাজকে ভাল জানিতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং

তাহাদের জন্যে অনিবার্যরূপে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আজাব রহিয়াছে। ইহাও হইতে পারে যে, পূর্বে মুনাফিকদের বদআকীদা, খারাপ আমল এবং কটু-উক্তি বা প্রলাপোক্তির আলোচনা ছিল। এক্ষণে, তাহাদের বদ কার্যকলাপের বয়ান করা হইতেছে। অর্থাৎ, তাহাদের রোগাক্রান্ত অন্তর, মিথ্যা তাহাদের কথা-বার্তা এবং গলত্ব তাহাদের এবাদত; এবং অত্যন্ত খারাপ তাহাদের কার্যকলাপ। যেহেতু, এবাদত মোয়ামেলাতের আগ্রবর্তী, এইহেতু ইহার আলোচনাও পূর্বেই আসিয়াছে। এবং পরবর্তীতে আসিয়াছে মোয়ামেলাতের প্রসঙ্গ।

যে আমলের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার সহিত উহাকে এবাদত বলা হয়। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। আর যে আমলের সম্পর্ক বান্দার সহিত থাকে উহাকে মোয়ামেলাত বলা হয়। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদি কাজ-কর্ম। মুনাফিকদের উভয় প্রকার আমলই খারাপ ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত আমলের আলোচনাই এই জায়গায় করা হইয়াছে।

তাফ্ছীর ঃ- و اذا قيل ওয়া ইজা ক্বিলা قيل ক্বিলা ক্বওল শব্দ হইতে বাহির করা হইয়াছে। যাহার কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে। যথা - (১) কথা, (২) বলা, (৩) দ্বীলের ধারণা, (৪) রায় এবং (৫) মজহাব। এইস্থানে, বলা বুঝায়। রায় দেওয়া, ইহাতে কয়েকটি বিষয় রহিয়াছে। আল্লাহ্পাক তদীয় হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মাধ্যমে মুনাফিকদেরকে এইকথা বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত ঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম স্বয়ং, তৃতীয়ত ঃ সাধারণ মুমিনগণ, চতুর্থ ঃ ঐ মুসলমান যাহাদের সহিত উহারা ফেতনার আলোচনা করিত। لا تفسدو লা-তুফছিদু ফাছাদ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যাহার অর্থ বিকৃত করা কিংবা কোন জিনিসের সীমা অতিক্রম করা। এবং উপকারের যোগ্য না থাকা। উহার বিপরীত হইতেছে ছোলাহ্ যাহার অর্থ সংশোধিত হওয়া এবং উপকারের যোগ্য হওয়া এই ফাছাদ ও ছোলাহ্র মধ্যে বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ফাছাদ দুই ব্যক্তির মধ্যে হয়; কোন শহরের ফাছাদ, কোন দেশের ফাছাদ; এবং জমীনের উপর ফাছাদ।

فى الارض. ফিল আর্‌দে-র ঘোষণায় একথা বুঝা যায় যে, এইস্থানে ফাছাদ হইতেছে চরম ফাছাদ বা চূড়ান্ত অশান্তি। তবে মুনাফিকদের বলা হইতেছে যে, যদি তোমরা নিজেরাই বিগড়াইয়া গিয়া থাক তবে অন্যের উপর মেহেরবানী কর। এবং আল্লাহ্র জামীনের উপর অশান্তি সৃষ্টি করিও না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকদের রোগবেশী; অর্থাৎ, ইহারা দুনিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করিত। এক্ষণে, এইস্থানে ফাছাদ দ্বারা কি বুঝায় এবং ইহাতে কয়েকটি কথা রহিয়াছে। ছাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অভিমত এইযে, এইস্থানে 'ফাছাদ' দ্বারা বুঝায় প্রকাশ্যে গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। কেননা, প্রকাশ্যে গুনাহের দ্বারা আল্লাহ্র রহমত বন্ধ হইয়া যায় এবং

আজাব নাযিল হয়। কাতল বা হত্যা, খুন-খারাবী, ধ্বংস-লীলা প্রভৃতি আরম্ভ হয়। যেহেতু ঐলোক সকল সুযোগ লাভ করিয়া প্রকাশ্য গোনহের কাজে লিপ্ত হইত; এইহেতু, তাহাদিগকে বাধা প্রদান করা হইয়াছে। জানিয়া রাখিবেন। ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের ফায়েজ ও ছোহ্বতের দ্বারা এতদূর পাক-সাফ ছিল যে, প্রথমতঃ তাহাদের কোন গোনাহ্ই ছিল না। যদি কোন সময় দৈবাৎ গোনাহ্র কাজ ঘটিয়া যাইত তবে তাহারা উহা গোপন করিবার কোন প্রকার চেষ্টা করিত না। বরং রাসুলে পাকের দরবারে গিয়া স্বীকার করতঃ শাস্তি গ্রহণ করিত। পক্ষান্তরে, মুনাফিক ঐ মরদুদ-আযালী বদ্-বখ্ত ছিল যে, এই পবিত্র আস্তানায় আসিয়াও দুরস্থ হইল না, সংশোধিত হইল না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদিগকে বলা হইতেছে– তোমাদের নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নামে কলংক রটাইও না। ফাছাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করিও না। দ্বিতীয়ত ঃ ফাছাদের দ্বারা বুঝায় কাফেরদের।

সহিত মিলামিশা করা, তাহাদের সহিত নম্রব্যবহার, তাহাদের সহিত সম্প্রীতি ও খোশামোদপূর্ণ ব্যবহার করা। ইহাতে যেন এই নির্দেশ করা হইতেছে যে, 'হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা একটি দিক অবলম্বন কর, তোমাদের এই প্রতারণামূলক কাজে ফাছাদ বা অশান্তির সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ ফাছাদের দ্বারা বুঝায় মুসলমানদের গোপন তথ্য কাফেরদের নিকট পৌঁছান। কেননা, মুনাফিকদল মুসলমানদের সহিত উঠাবসা করিত। এইজন্যে, তাহারা মুসলমানদের যুদ্ধের খবরা-খবর অবগত হইত। এবং তাহারা কাফেরদিগকে এখবর গোপনে প্রচার করিত। এই দূর্নীতি হইতে তাহাদিগকে প্রতিহত করা হইল। চতুর্থতঃ মুনাফিক সম্প্রদায় মুসলমানদের সহিত গোপন সূত্রে মিলিত হইয়া মুসলমানদের দ্বীলে ইসলামের বিরুদ্ধে শোবাহ্ সন্দেহ জন্মাইয়া দিত। তাহারা এই ধারণা করিত যে, যখন পুরাতন মুসলমান ইসলামের উপর পূর্ণ ভরসা হারাইয়া ফেলিবে তখন ইসলামের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা খারাবী আসিয়া পৌঁছিবে। এই জায়গায় ফাছাদের দ্বারা মুনাফিকদের এ দুর্নীতি বুঝায়। এবং তাহাদিগকে এই দূর্নীতি হইতে প্রতিহত করা হইতেছে। قَالُوا কালু ইহা খুবই স্পষ্ট যে, একথা মুনাফিক দিগের; এবং তাহাদিগকে ফাছাদ সৃষ্টি হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কথার মর্ম এই যে, আমরা ফাছাদ করিনা বরং সংশোধন করি। অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! যাহাকে ফাছাদ বলিতেছ উহাকে আমরা সংশোধন জানি। কেননা, তোমাদের ইসলাম ফাছাদ, এবং ইহাকেই আমরা সংশোধন করিতে চাই।" ইহাও হইতে পারে যে, مصلحو শব্দ দ্বারা বুঝায় মিমাংসা করা। অর্থাৎ মুনাফিকরা বলিত যে, আমরা কাফেরদের সহিত এই উদ্দেশ্যে মিলিত হই যেন, তোমাদের ও কাফেরদের মধ্যে মিমাংসা হইয়া যায়। মদীনা পাকে মাটি যেন, রক্তপাত দ্বারা রঞ্জিত না হয়। হে মুসলমানগণ! তোমাদের চেষ্টা যে, এই জায়গায় খুন-জখম ও রক্তপাত হয়।

একমাত্র আমরাই সংশোধনকারী। এইজন্যে, তাহারা انما বলিয়াছে। যাহা হাছারের জন্যে আসে। কোরআনে কারীমে অন্য এক জায়গায় ঐ মুনাফিকদের কথা এইভাবে নকল করা হইয়াছে- قالو ان اردنا الاحسان

খোলাছা তাফছীর ঃ আয়াতে কারীমার সার-সংক্ষেপ এই যে, মুনাফিকদের অন্তরে রোগ-পীড়া এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ইহারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিত না। কেননা, যখন তাহাদিগকে বলা হইত চোগলখুরী। অর্থাৎ পরনিন্দা পরচর্চা প্রভৃতি অপকর্মের দ্বারা দুনিয়ায় ফাছাদ সৃষ্টি করিও না। তখন তাহারা উত্তর দিত "আমরাতো ভালই করিতেছি।" ইহারা গোনাহ্‌ের কাজকে ভাল জানিত। যেমন- কতিপয় রোগীর নিকট তিক্ত জিনিস মিষ্টি লাগে এবং মিষ্টি জিনিস তিক্ত অনুভূত হয়। ইহাই মুনাফিকদের অবস্থা। মানুষ যখন মন্দকে ভাল, দোষকে গুণ এবং অন্যায়কে ন্যায় বিবেচনা করিতে শুরু করে, তখন ইহাদিগকে হেদায়াতের পথে চালিত করা বড়ই মুশকিল হইয়া পড়ে। আর ইহাদেরকেই বলা হয় নিরেট মূর্খ।

নোটঃ ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রেণীর লোক পূর্বে ছিল, বর্তমানে নাই এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। বর্তমানেও এ শ্রেণীর লোক যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূত-পূজা, গঙ্গার স্নান ও চন্দ্র-সূর্যের উপাসনা প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণাই ফলশ্রুতি। মোবারকবাদ ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি যাহারা দুনিয়ায় অবস্থান করলে হাকীকতের অবস্থা অবগত হইতে সক্ষম হয়। আর ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে। নতুবা, মৃত্যুর পরে তো অবশ্যই সে বোধশক্তি লাভ হইবে।

এই আয়াতের উপকারিতা ঃ এ আয়াতে কারীমায় কতিপয় ফায়দা বা উপকারিতা লাভ হয়। যথা- (১) কুফুরী, প্রকৃতপক্ষে, ফাছাদেরই নামান্তর। কেননা, উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত দুষমনি বা খোদাদ্রোহীতাই প্রমাণিত হয়। এবং বাদশাহ্‌র সহিত দুশমনি বা শত্রুতা পোষণের চাইতে জঘন্যতম ফাছাদ আর কিছুই নহে। (২) ইসলাম ও শরীয়তের অনুসরণ ও বন্দেগী জমীনের এছলাহ্ বা সংস্কার। কেননা, ইহা ওয়াফাদারী বা কৃতজ্ঞতা। যদি কোন ব্যক্তি কুফুরীর দ্বারা খুন-খারাবী বন্ধ করিবার প্রয়াস পায়, তবে সে ব্যক্তি ফাছাদকারী এবং তাহার কুফুরীমূলক প্রয়াস ফাছাদ বলিয়া পরিগণিত। অপরদিকে এক আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি ইসলাম প্রচার ও হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যদি জোহাদ ও কেতাল সংঘটিত করে, তবে সে ব্যক্তি মুছলেহ্ আর তাহার কর্মকাণ্ডের নাম এছলাহ্ ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক রোগীর দেহের কোন অঙ্গে পচনশীল ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় ডাক্তার উহা কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক। কেননা ঐ পচনশীল ক্ষতের দ্বারা শরীরের অন্য অঙ্গ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু নির্বোধ রোগী যদি উক্ত চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অস্ত্রোপাচার হইতে বাঁচিতে চায় এবং বলে "অপারেশন দ্বারা অঙ্গ-ছেদ হইবে; শরীর নষ্ট হইবে; আমি প্রত্যক অঙ্গ সঠিক

অবস্থায় রাখিতে চাই, আমি তো সংশোধন কামনা করি।'' যদিও বাহ্যিক অবস্থায় উক্ত চিকিৎসক রোগীর শরীর নষ্ট করিতে ইচ্ছুক, এবং রোগী অপারেশন জনিত ক্ষতির ফাছাদ হইতে বাঁচিতে চায় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ডাক্তারই 'মুছলেহ্' বা সংশোধনকারী আর রোগী নিজেই অনিষ্টকামী ও ফাছাদকারী। এইহেতু বলা হয় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ব্যাধিগ্রস্তই হইয়া থাকে। মুনাফিকরা শরীরের এছলাহ্ কামনাকারী, অথচ ইহারা উভয় কালে সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল ছিল। অতএব, প্রয়োজনের সময় জেহাদ না করা ফাছাদ, আর জেহাদ করা এছলাহ্। (৩) কাফেরের সহিত মিলামিশা করা, তাহাদের ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে পছন্দ করা, তাহাদের সহিত ভালবাসা রাখা, তাহাদের প্রতি খোশামেদ তোষামোদ প্রকাশ করা, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্যে তাহাদের সহিত মিলিয়া থাকা কিংবা তাহাদের সংশ্রব বর্জন না করা এবং হক কথা প্রকাশ না করা এই সমস্ত মুনাফিক লোকের কর্ম। এবং উহা সম্পূর্ণ হারাম। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল এই রীতিকে বহুলোকেই পছন্দ করিয়া নিয়াছে। জানিয়া রাখিবেন, মুসলমানের উন্নতি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নহে, বরং হক প্রতিষ্ঠার দ্বারা। কেহ যদি এক তোলা আতরের মধ্যে এক বোতল পেশাব মিশ্রিত করিয়া দেয়, তবে উহাতে আতরের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়না বরং আতর ধ্বংস হইয়া যায়। আতর যদিবা এক তোলা ছিল তবু উহা বিশুদ্ধ আতরই ছিল। বোতল পরিপূর্ণ করিতে নাপাক জিনিস মিশ্রিত করায় আতরের দশা শেষ হইয়া গেল।।

একতা নিঃসন্দেহে ভাল, কিন্তু কাহার সহিত একতা? নিশ্চয়ই মুসলমানদের সহিত। আবার তান্‌জীম্ বা সংগঠন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; কিন্তু কাহার সংগঠন? নিশ্চয় মুসলমানদের সংগঠন। ভ্রান্ত সংগঠনের উচ্ছেদসাধন মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান ফরুজ। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দুনিয়ায় ভ্রান্ত সংগঠনকে উচ্ছেদ করিয়াছেন। অতঃপর ছাইয়্যেদুশ শোহাদা শহীদে কারবালা হজরত ইমাম হোছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এজিদের গলত্ তানজীমকে ফুঁক দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিজেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও বিপুল সংখ্যক শত্রুর মোকাবেলা করিতে মোটেও পরওয়া করেন নাই। বর্তমান সময়ের তান্‌জীম বা সংগঠনকারীগণ এবং একতার স্লোগান দাতাগণ যাহারা ইসলামী তান্‌জীমকে ছাড়িয়া ভুল রাজনীতির পিছনে ধাবিত হইতেছেন তাহাদের উদ্দেশ্য মুসলমান, শিয়া খারেজী, দেওবন্দী-ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, বাহায়ী বরং হিন্দু এবং ঈছায়ী প্রভৃতি মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া। এই রকম কখনও হইতে পারে না। আলো এবং অন্ধকার, কুফুরী এবং ঈমান কোনও সময় এক হয় নাই, এবং হইতে পারিবেওনা। যদি তাহারা নিজেদের মনগড়া তানজীমের স্থলে খাঁটি মুসলমানদের সত্যিকার সংগঠন কায়েম করিত তবে নিশ্চয়ই বহু উন্নতি সাধন করিতে পারিত। আর ছোট ছোট দল-উপদল যথা– দেওবন্দী, কাদিয়ানী প্রভৃতি নির্মূল হইয়া পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ইসলামী

সুশিক্ষা তথা বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়া সংঘবদ্ধ হইত। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার কারণ একমাত্র ঐ অর্থহীন তান্‌জীমের উদ্দেশ্যবিহীন চিৎকার। পাঠকবৃন্দ! আমার উদ্দেশ্য এই নহে যে, মুসলমান সর্বক্ষণ সকলেরই সঙ্গে সংগ্রামলিপ্ত থাকুক। বরং ইহাই আমার বক্তব্য যে, মুসলমান সর্বদা হকের অনুসারী থাকিয়া বাতিল দলের সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করুক যেন বাতিলের খপ্পরে পড়িয়া কোন সময় নিজের দ্বীন ও ঈমানকে সমূলে বিনাশ করিতে না হয়। আর ঈমান ও কুফুরের মধ্যে যেমন আপোষ চলে না তদ্রূপ, কাফের মুশরিক তথা বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকার সহিত কখনও ঘনিষ্টতা ও বন্ধত্ব রাখা যায় না। ইহারই প্রেক্ষিতে কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে-

لاَ يَتَّخِذ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرُوْنَ اَوْلِيَاءَ..

অর্থাৎ, হে মুসলমান! কখনও কুফ্‌ফারদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে তৌফিক দান করুন।

ছুফিয়ানে কেরামের তাফছীর ঃ ভাল জমীনে যে প্রকারের বীজ বপন করা হইবে বীজ অনুসারেই উহার চারা বা বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। যে ব্যক্তি ফলবান বৃক্ষ ব্যতীত কাঁটাদার বৃক্ষের বীজ বপন করিবে সে ভাল জমীনকে নষ্ট করা ছাড়াও নিজেকে জমীনের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত রাখিবে। অনুরূপভাবে, মানুষের দ্বীল সবকিছু গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত থাকে। যদি উহাতে ঈমানের বীজ বপন করা হয় তবে ভাল ফল পাইবে। আর যদি কুফুরীর বীজ বপন করে তবে হাতে কাঁটার আঘাত লাগিবে। কাজেই, এই জায়গায় এই কথাই ঘোষণা করা হইতেছে– 'হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমাদের অন্তরে কুফর ও নেফাকের বীজ বপন করিয়া উহা নষ্ট করিওনা; বরং উহাতে ঈমানের বীজ বপন করতঃ এবাদতের পানি ও নেক সংশ্রবের বাতাস দ্বারা ফলবান বৃক্ষ তৈয়ার কর।' কিন্তু তাহারা তাহাদের বেকুফীর দ্বারা কাঁটাদার বৃক্ষের বীজ বপন করতঃ ফলের আশা পোষণ করে।

প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য করণীয় যে, নিজের অন্তঃকরণ রূপ শস্যক্ষেত্রে ঈমানের উত্তম বীজ বপন করতঃ ইহাকে খারাপ সংশ্রব হইতে মুক্ত রাখিয়া কুফুরীর অন্ধকার হইতে বাঁচাইয়া রাখে। তাহা হইলে, জিন্দেগীর অবসানে নাজাতের উত্তম ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রশ্ন ঃ এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মুনাফিকরা বেঈমানী প্রকাশ করিত; এবং মুসলমানদের বুঝাইবার পর এ ধরনের অবান্তর উত্তর দিত। এমতাবস্থায়, ইহারা কেমন করিয়া মুনাফিক রহিল,বরং প্রকাশ্য কাফেরই তো হইয়া গেল?

উত্তর ঃ মুনাফিকরা গোপনে এত অপকর্ম করিত এবং কোন মুসলমানের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইত আর ঐ ব্যক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিত তখন তাহারা নীরব হইয়া যাইত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ভাবিত 'আমাদের ধারণাই সঠিক।'

আল্লাহ্পাক এ আয়াতে কারীমায় তাহাদের অন্তরের গোপন তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্মরণীয় যে, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার জমানায় মুনাফিকদের উপর তরবারীর জেহাদ ছিল না, যদিও তাহাদের দ্বারা কুফুরের আলামত প্রকাশ পাইত হুজুরেপাকের পরে তাহাদের হুকুমেই এই–হয় ঈমানদার নতুবা কাফের। কেননা নেফাক কোন বিষয় নহে। আজকাল যে কলমাগোর দ্বারা কুফুরের আলামতসমূহ হইতে কোন আলামত প্রকাশ পাইবে সে মুরতাদ হইয়া যাইবে এবং তাহাকে কাতল করা ওয়াজিব। যেমন–মেশকাত শরীফ, শেষ অধ্যায়, আলামতে নেফাকের মধ্যে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হার আদেশ এবং ইহার শরাহ্ 'লো-মআতে' এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি নিজের নেফাক বা কপটতাকে এছলাহ্ (সংস্কার) বলে সে মুরতাদ।

১২ নং আয়াতঃ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ۰

অর্থ ঃ- খবরদার! নিশ্চয়ই তাহারা গোলযোগ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না।

সম্পর্ক ঃ পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের প্রলাপোক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে, ইহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। কিন্তু যতদূর দৃঢ়তার সহিত ইহারা নিজেদের প্রশংসা করিয়াছিল; ইহার চাইতেও অধিক পরিমাণে তাহাদের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে।

তাফছীর ঃ اَلاَ আলা শব্দ 'হরফে তাম্বী।' কখনো গাফেল বা অমনোযোগী লোকদেরকে সতর্ক করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যাহার অর্থ– খবরদার কিংবা সাবধান অথবা মনে রাখিবে ইত্যাদি। যদি কালামের লক্ষ্যস্থল মুনাফিকদের দিকে হয়, তবে এই গাফেলদিগকে সচেতন করিবার জন্যে। আর যদি মুসলমানদিগের প্রতি সম্বোধন হইয়া থাকে তবে যেহেতু তাহারা পূর্ব হইতে সতর্ক রহিয়াছেন এইহেতু কেবল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যে। اِنَّهُمْ ইন্নাহুম اِنَّ ইন্না ঐ জায়গায় ব্যবহার করা যায় যেথায় ঐ কথার অস্বীকারকারী কিংবা অস্বীকারের সম্ভাবনা থাকে। কেননা ঐ বিষয়ের মুনাফিক ও কাফেরগণ মুনকির বা অস্বীকারকারী ছিল। আর দুর্বল ঈমানদারগণেরও অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, জাহেরী অবস্থায় জানা যায় যে, মুনাফিক সম্প্রদায় শান্তি পছন্দ করে এবং সংশোধন কামনা করে। আর মুসলমানরা ঝগড়া ও গোলযোগ পছন্দ করে। এইহেতু, এইস্থানে ইন্না ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং ইরশাদ হইয়াছে– নিশ্চয়ই এই সমস্ত লোকজন মীমাংসা পছন্দ করে না, গোলযোগ সৃষ্টির মূল।

দুইবার 'হুম' ব্যবহার করায় হাছারের অর্থই বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ,

মুনাফিকরাই ফাছাদকারী, মুসলমানরা নহে। মুনাফিকরা তাদের নিজের কথার ইন্নামা ব্যবহার করিয়া বলিত– 'মিমাংসা করাই আমাদের কাজ, মুসলমানদের নহে।' কিন্তু هم 'হুম' শব্দ আসায় বুঝাইয়াছে যে, ফাছাদ করা মুনাফিকদেরই কাজ মুসলমানদের নহে المفسدون। আল্‌মুফ্‌ছিদুনার মধ্যে বহু কিছু নিহিত রহিয়াছে। কেননা, ইহার অর্থ বিকৃতকারী। কাজেই, এই মুনাফিকদল নিজেদের জবান, ধ্যান-ধারণা তথা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে কুফুরী দ্বারা বিকৃত করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এবং লোকদিগকেও ঈমান হইতে ফিরাইয়া নষ্ট করে এবং কাফেরদিগকে কুফুরীর মধ্যে দৃঢ় ও মজবুত করতঃ নষ্ট করে। আর জমিন হইতে আল্লাহ্‌র জিকির বন্ধ করিয়া উহা নষ্ট করিয়া দিতেছে। এইহেতু তাহারাই সর্বদিক দিয়া ফাছাদ সৃষ্টিকারী।

شعر শুউর অনুভূতির দ্বারা জানাকে বলা হয়। কাজেই, ইহাতে ঐদিনকে ইশারা করা হইতেছে যে, মুনাফিকদলের মুফছিদ বা গোলযোগকারী এতদূর স্পষ্ট যে, ইহারা চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছে, তবু অনুভব করিতে পারে না। দুই দিকে যে চলাফেরা করে কিংবা দুই মতাদর্শের যে অনুসারী তাহাকে সকলেই নিন্দা করে। মুনাফিকরা এতই অন্ধ যে তাহাদের নিজের প্রকাশ্য খারাবী উপলব্ধি করিতে পারে না। অপারগ অবস্থায় মুখে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করা এইরূপ দুরুস্ত যেন জান বাঁচাইতে গিয়া শুকরের মাংস ও শরাব খাওয়া।

ছাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ্‌পাক হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ছোহ্‌বত কোরআনে কারীম জমা' বা একত্রীকরণ ও ইসলাম প্রচারের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। স্নেহময় পিতা নিজ সন্তানকে খারাপ লোকের সংশ্রব হইতে বাঁচায়। অপরদিকে দয়াময় আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় মাহবুব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে আছহাবগণের জন্যে মেনোনীত করিয়াছেন।

তাফছীর ঃ এই জায়গায় বলা হইয়াছে যে, দেখ এই শ্রেণীর লোক সকল প্রথম শ্রেণীর 'মুফছেদ' বা গোলযোগ সৃষ্টিকারী এবং একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর অজ্ঞ বটে। আর তাহাদের ফাছাদ ও এছলাহের কোন তমিজ নাই। অর্থাৎ গোলযোগ ও মিমাংসার তারতম্য করার বোধশক্তি তাহাদের নাই। অন্তরচক্ষু অন্ধ হইয়া গেলে জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বেকার বা নিষ্ফল হইয়া যায়। মুনাফিকদের দশা অনুরূপই ছিল।

ছুফিয়ানা তাফছীর ঃ মানুষের সম্পর্ক দুনিয়ার সহিতও রহিয়াছে এবং দ্বীনের সহিতও। কিন্তু দ্বীন ও দুনিয়া পরস্পর বিপরীত। দুনিয়াকে লাভ করিলে দ্বীন নষ্ট হইয়া যায়। আর দ্বীনের সংশোধন দুনিয়া ধ্বংসের দিকে যায়। হাকীকতের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী ধর্মীয় চেতনায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হয়; এবং অধিকাংশ সময় ধর্মের মোকাবেলায় দুনিয়াকে বিকৃত করিয়া লয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ দুনিয়াকে দ্বীনের উপর-মোকাদ্দম বা অগ্রবর্তী ধারণা করিতেছে এবং

দুনিয়ার প্রশ্চাতে ধাবিত হইয়া দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দেয়। মানুষের মধ্যে মুনাফিক লোক সকল এমনই ধরনের ছিল, যাহারা চরম পর্যায়ের দুনিয়াসক্ত। এইজন্যে তাহারা নিজেদের কর্মকে এছলাহ্ বলিত। এবং আল্লাহ উহাকেই ফাছাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কেননা, তাহারা দুনিয়া অর্জন করিয়া ধর্মকে বরবাদ করিতেছে। কাজেই, চিরস্থায়ী জিনিস ছাড়িয়া দিয়া অস্থায়ী জিনিস গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ফাছাদ বটে। জানিয়া রখিবেন, ছুফিয়ানে কেরামের নিকট দুনিয়া ঐ জিনিস যাহা আল্লাহ্ ভুলাইয়া দেয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্ত্রী-পুত্র এবং অন্যান্য হালাল কাজ করবার যদি রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার গোলামী সহায়ক হয় তবে এই সমস্তই আসল ধর্ম।

প্রথম উপকারিতাঃ এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, কেহ যদি আল্লাহ্ ওয়ালাগণের মোকাবেলা করিতে উদ্যত হয়, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্পাকের মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত হইল। আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার প্রতিবাদ যেন স্বয়ং আল্লাহরই প্রতিবাদ। কেননা, মুনাফিকরা কেবল মুসলমানদের প্রতিবাদ করিয়াছিল, আল্লাহর উপর নহে; কিন্তু প্রতিউত্তর স্বয়ং আল্লাহ্পাকই দিয়াছেন। যাহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্পাক ঐ প্রতিবাদকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। যেমন– বহুবার নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রতি প্রশ্ন করা হইয়াছে, আর উত্তর দিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্পাক।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ আয়াত শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, কেহ যদি আল্লাহ্র হইয়া যায় আল্লাহ্ও তাহার হইয়া যায়। অর্থাৎ, যে কেহ দুনিয়ায় আল্লাহ্র ওয়াকিল হইয়া যায়, আল্লাহ্র আহ্কাম প্রচারে সচেষ্ট হয় তখন আল্লাহ্পাক তাহার ওয়াকিল হইয়া যান। তাহার কোন মুছিবত উপস্থিত হইলে আল্লাহ্পাক স্বয়ং উহা দূরীভূত করেন। এইজন্যে ইরশাদ হইয়াছে–

فاتخذواه و كيلا বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এবাদতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, আল্লাহ্পাক তাহাকে দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তা হইতে মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় উপকারিতাঃ ছাহাবয়ে কেরামকে ফাছাদকারী বলিয়া উক্তি করা মুনাফিকদের কাজ। মুনাফিকরা বলিত– "আমরাই একমাত্র মুছলেহ্" বা মিমাংসাকারী অর্থাৎ ভাললোক, আর ফাছাদকারী তোমরাই প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন–'মুনাফিকরাই ফাছাদকারী, কোন ছাহাবা ফাছাদসৃষ্টিকারী নহে।' প্রতীয়মান হইল যে, ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্য ঝগড়া প্রকৃতপক্ষে ফাছাদ ছিলনা। এমনকি তাহা নফছানীও ছিল না। পক্ষান্তরে মুনাফিকদের নামাজও ফাছাদ ছিল। কেননা, সে নামাজ ছিল নফ্ছানী, রহমানী নহে। দেখুন, আল্লাহ্পাক হজরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের ভ্রাতৃগণকে কাফের কিংবা ফাছাদী বলেন নাই, বরং তাহাদিগকে হেদায়তের তারকা বলিয়াছেন–

انّی رئیت احد عشر کوکبا

ইন্নি রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবা এ আয়াত মর্মে।

প্রশ্ন ঃ এ আয়াতের হাছারের দ্বারা জানা গেল যে, শুধু মুনাফিকরা মুফছেদ বা ফাছাদকারী। তবে কি অন্যান্য কাফের বেদ্বীন মুনাফিক ফাছাদকারী ছিল না কি?

উত্তর ঃ ইহার দুইটি উত্তর (এক) এই হাছার মুসলমানদের মোকাবেলায়, অর্থাৎ মুসলমান ফাছাদকারী নহে। এইহেতু যে, এই হাছার 'হাছারে এজাফী' হাছারে মত্বলক নহে। (দুই) এইস্থানে ফাছাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র মুনাফিকরা ফাছাদ সৃষ্টিকারী। এই ধরনের ফাছাদ আর কেহ করেনা। তবে এই হাছার ঐ ফাছাদের অনুসারেই

১৩নং আয়াতঃ مِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ ا السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় যে, অন্যান্য লোকজন যেরূপ ঈমান আনিয়াছে তদ্রূপ তোমরাও ঈমান আনয়ন কর। তাহারা (মুনাফিকদল) উত্তর দিত যে, বোকার দল যেরুপ ঈমান আনিয়াছে আমরা কি সেইরূপ ঈমান আনিতে পারি? সাবধান! ইহারাই বোকা, কিন্তু তাহারা জানে না।

সম্পর্কঃ পূর্বের আয়াতের সহিত এ আয়াতের কয়েকটি সম্পর্ক রহিয়াছে। যথা- (১) উহাতে প্রথমতঃ মুনাফিকদের দুই প্রকার মন্দ-স্বভাবের বর্ণনা ছিল এক্ষণে, তিন প্রকারের কু-স্বভাবের বয়ান করা হইতেছে। (২) পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানগণ তাহাদিগকে ফাছাদ হইতে বিরত থাকিতে বলে, আর তাহারা তাহা অমান্য করে। আর এক্ষণে, বলা হইতেছে যে, মুসলমানগণ তাহাদিগকে প্রকৃত ঈমানের দিকে আহবান করিতেছে এবং তাহাই তাহারা প্রত্যাখান করিতেছে। কেননা, পূর্ণ তাবলীগ ইহাই যে, পথভ্রষ্ট লোকদিগকে খারাপ কর্ম হইতে ফিরাইয়া রাখা, এবং মঙ্গলের দিকে আহ্বান করা। তাই, মুসলমানদের তাবলীগের অংশ 'খারাপ কাজ হইতে বাধা প্রদান' পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে আর দ্বিতীয় অংশ- 'হাকীকী বা প্রকৃত ঈমানের দিকে আহ্বান পরে বর্ণিত হইয়াছে। এইস্থানে মুসলমানের তাবলীগের পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে- 'খারাপ কর্ম হইতে বিরত রাখা ভাল কর্ম সম্পদানের আগে।' অতএব, 'ফাছাদ' হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রকৃত ঈমানের পূর্বশর্ত। এইহেতু, সর্বপ্রথম ইহারই আলোচনা আসিয়াছে, তারপর ঈমানের কথা।

তাফছীরঃ قِيل কিলা এইস্থানে ও ঐ বিষয় যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। হয়ত এই কথা আল্লাহ্পাকের অথবা নবীয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অথবা কেবল মুসলমানদের। اٰمنوا আমেনু-তে ঈমানের আদেশ রহিয়াছে। অথচ তাহারা পূর্ব হইতেই মুমিন ছিল। যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, কেবল জবানী ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। এই জায়গায় ঈমানের

তো আদেশ মাত্র; কিন্তু এই কথার উল্লেখ নাই যে, কিসের উপর ঈমান আনিবে। তবে পরবর্তী এবারতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহার উপর সমস্ত মানুষ ঈমান আনিবে। তাহার উপর তোমরাও ঈমান আনয়ন কর। النس আন্নাছ- আন্নাছের দ্বারা বুঝায় মানবজাতি তাহা হইলে অর্থ হইবে- 'তোমরা মানবের মত ঈমান আন। সুতরাং যাহারা বিশুদ্ধ অর্থে মুমিন নহে তাহারা হাকীকতে মানবই নহে, বরং' চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধম। জানোয়ারতো উহার মালিককে চিনে কিন্তু ইহারা আপন প্রতিপালককে চিনে না। অথবা ইহাতে খাছ মানুষ বুঝায়। আর ঐ খাছের মধ্যে কয়েকটি প্রকার রহিয়াছে। হয়ত হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও তাহার সমস্ত ছাহাবাগণ; অথবা ঐ মুনাফিকদের পরিবারস্থ অপরাপর মুখলেছ বা সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোকজন। অথবা তাঁহাদের নিকটবর্তী ঘনিষ্ট লোকজন যাহারা মুমিন ছিলেন। যেমন- হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ছালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাফছীরে আজিজীতে ছাইয়্যেদেনা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন- 'এই জায়গায় আন্নাছ দ্বারা বুঝায় হজরত আবু বকর ছিদ্দিক, হজরত উমর ফারুক এবং হজরত ওসমান জিন্নুরাঈন ও হজরত মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। কেননা, ঐ জমানায় এই সমস্ত মহাত্মাগণ খাঁটি ঈমানদারগণের মধ্যে মশহুর ছিলেন। এইজন্যে তাহাদের ঈমান এবং অন্যান্য লোকজনের ঈমানের পরিমাপের মানদণ্ড হইয়াছিল যে, 'যাহাদের ঈমান ঐ মহাত্মাগণের ঈমানের সাথে তুলনীয় হয় তবে তাহারা মুমিন, নতুবা নহে। যেমন- এই কথা বলা হইতেছে যে, হে মুনাফিকসম্প্রদায় তোমরা জাহেরী ঈমান আনিয়াছ; কিন্তু ইহা নিষ্ফল। যদি মঙ্গল চাও, তবে ছিদ্দিক ও ফারুক-ওয়ালা ঈমান আনয়ন কর। বাজারে সাধারণতঃ ঐ জিনিসের চাহিদা ও দর বেশী যাহার মধ্যে কারখানার সিল্‌মোহর থাকে। তদ্রূপ, ভালবাসা বা প্রেমের বাজারে ঐ ঈমানের মূল্য রহিয়াছে যাহার উপর মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সিলমোহর রহিয়াছে- ইহাই ছিদ্দিকী ও ফারুকী ঈমান।

السفها ، আচ্ছুফাহাউ سفه ছাফ্‌হুন শব্দ হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ হাল্‌কা। আরববাসীগণ বলেন- سفها تريح ছাফাহাতুররিহু অর্থাৎ, উহাকে বাতাসে উড়াইয়া নিয়াছে। পরিভাষাগত অর্থ- বেকুবী এবং আহ্‌মকী বা বোকামী। ইহাতেও আক্বল বা জ্ঞানের হাল্‌কাপনা বুঝায়। ইহার বিপরীত হইল এলেম এবং আনাতুন বা ধৈর্যগুণ ও দুশ্চিন্তা। মুনাফিকরা খাঁটি মুসলমানদিগকে কতিপয় কারণে বোকা বলিয়াছেন। যথা- (১) তৎকালে মুসলমানগণ অধিকাংশই গরীব ও মিছকিন অবস্থায় ছিলেন। আর মুনাফিকরা মালদার বা সম্পদশালী ছিল। মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতে গিয়া তাহাদের সম্পর্কে ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। (২) মুনাফিকরা ইসলামকে বাতেল ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস রাখিত এবং কুফুরীকে সত্যধর্ম হিসাবে মানিত। আর যাহারা

বাতেল ধর্ম গ্রহণ করে তাহারাইতো বোকা। এইজন্যে ইহারা মুসলমানদিগকে এ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করিয়াছে। (৩) মুসলমানগণ দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ বর্জন করিয়াছিলেন। মুনাফিকরা বুঝিয়াছিল দুনিয়ার ফায়দা নগদ এবং ধর্মের ফায়দা বাকী। আর এ বাকী এমনই ধরনের বাকী যে, মউত এবং কিয়ামতের পূর্বে পাওয়া যাইবে না। তবে যাহারা নগদ ছাড়িয়া বাকী গ্রহণ করে তাহারাই মুনাফিকদের নিকট বোকা ছিল। (৪) মুনাফিকদের ধারণায় দুনিয়ার সুখ-শান্তিই বিশ্বাসযোগ্য ছিল আর ধর্মীয় ফায়দা– বেহেশ্‌ত তথা বেহেশ্‌তের নিয়ামত ইত্যাদি কেবল ধারণা ও কল্পনার বস্তু ছিল। তাহাদের ধারণায়– 'প্রথমতঃ ইহাইত জানা নাই যে, ইহার কিছু হাকীকত আছে কিংবা নাই, যদি কিছু থাকিয়াই থাকে তবে তাহা পাওয়া যাইবে কি পাওয়া যাইবে না অথবা যদি পাওয়া যায় তবে কবে বা কখন পাওয়া যাইবে সে কথারই-বা নিশ্চয়তা কি? কাজেই কাল্পনীক বস্তুর আশায় ঐ বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত বস্তুকে বর্জন করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। (৫) কাফেররা সর্বদা মদীনা শরীফের সহিত সম্পর্ক রাখিত। তাহারা মনে করিত– 'আমরা এইস্থানে চিরদিন থাকিব। ইসলাম বিদেশী ধর্ম, মুসলমানরা মুছাফির। আর ধর্ম টিকিবে কিনা ইহারই নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং বিদেশী মানুষও বিদেশী ধর্মের ভালবাসায় নিজেদের প্রকৃত বন্ধু-বান্ধবদের শত্রুতে পরিণত করা বোকামীই বটে।' মুনাফিক দল ভাবিত যে, তাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং শয়তানও তাহাদের নিকট পরাজিত হইতে বাধ্য। কেননা, উভয় দলকেই তাহারা সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকে। তাহা এইরূপে যে, যদি মুসলমানরা জয়লাভ করে তবে তাহারা মুসলমানদের সহিত মিলিত হইবে; আর যদি কাফেররা জয়লাভ করে তবে তো তাহাদেরই বিজয় হইবে। অতএব, মুনফিকদের পক্ষে উভয় দলের সমর্থনই জ্ঞানের কাজ। আল্লাহ্‌পাক জাল্লা শানুহু মুনাফিকদের মিথ্যা ধারণার খুবই সুন্দর জওয়াব দিয়াছেন। أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ আলা ইন্নাহুম হুমুচ্ছুফহাউ আলা, ইন্না, এবং হুম এই তিনটি শব্দের বিশ্লেষণ আগেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাক ঐ মুনাফিকদেরকে কয়েকটি কারণে বেকুফ আখ্যা দিয়াছেন। যথা– (১) তাহারা ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মোহে চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং যাহারা চিরস্থায়ী জিনিসের মোকাবেলায় ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে গ্রহণ করে তাহারা নিরেট বোকা। (২) এইহেতু যে, তাহারা শক্তিশালী দলীলের মোকাবেলায় নিজেদের বাতেল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে স্থান দিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত বেকুফ। (৩) তাহারা দুই ঘরের মেহমান সাজিয়াছে, এবং দুই ঘরের মেহমান সর্বদাই উপবাস থাকে। অর্থাৎ, তাহারা এই ধরনের কার্যকলাপের দরুন মুসলমানগণের নিকটেও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইয়াছে এবং কাফেরদের নিকটও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে (৪) এইহেতু যে, মুনাফিকদের চালাকী ঐ সময় কার্যকর ছিল যখন মুসলমানগণ তাহাদের হাকীকতের খবর রাখিত না, অথচ

আল্লাহ্পাক তাহাদের হাকীকত প্রকাশ করিয়া দিলেন, গোমর ফাঁস করিয়া দিলেন। (৫) তাহারা হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সহিত দুষমনি করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা ছিল স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালারই সহিত দুষমনি। আল্লাহ্র সহিত দুষমনি পোষণ করতঃ কেহ কোন সময় ভাল ফললাভ করিতে পারে না, উভয় জাহানের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ব্যতীত। ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, কোন নির্বোধ লোক রোগ যাতনা হইতে আরোগ্য লাভের উদ্দেশে সর্পের দ্বারা দংশিত হইতে প্রস্তুত হয়।

لَا يَعْلَمُوْنَ লাইয়া'লামুন। পূর্বের আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে–

لَا يَشْعُرُوْنَ লা-ইয়াশউরুন অর্থাৎ, তথায় মুনাফিকদের অনুভবশক্তির অস্বীকার ছিল। আর এইস্থানে لَا يَعْلَمُوْنَ লা-ইয়ালামুন দ্বারা তাহাদের বোধশক্তির অস্বীকার ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি হেকমত রহিয়াছে। যথা– (১) ঐ জায়গায় ফাছাদের কথা ছিল যাহা অনুভূতির দ্বারা জানা যায়। (২) মুনাফিকরা মুসলমানদিগকে বোকা বলিয়াছে। ফলতঃ আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে নিরেটমূর্খ আখ্যা দিয়াছেন। (৩) আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের বেকুফ বলিয়াছেন; আবার ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের নিজেদের বেকুফীর খবরও তাহাদের নাই কেননা, এলেম তো আক্লের দ্বারাই হাছেল হইয়া থাকে। যখন আকলেরই কোন খবর নাই, তখন এলেম কিরূপে লাভ হইতে পারে? তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে এই জায়গায় বর্ণিত আছে,– হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের জন্মলাভের পর হজরত জিবরাইল আমীন তাঁহার খেদমতে তিনটি সামগ্রী লইয়া হাজির হন। যথা–(১) এলম্, (২) হায়া বা লজ্জা, (৩) আক্কল বা বুদ্ধি। তারপর জিবরাঈল আমীন আরজ করিলেন 'আপনি এই তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করুন।' হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম আক্বলকে গ্রহণ করিলেন। জিবরাঈল আমীন এলেম ও হায়াকে বলিলেন, 'তোমরা ফিরিয়া যাও।' উভয়ে আরজ করিল, 'আমরা আলমে আর ওয়াহ্ বা রুহের জগতে ও আক্বলের সঙ্গে ছিলাম, এক্ষণে এইস্থানেও আক্বলের সঙ্গেই অবস্থান করিব। অতঃপর আক্বল হজরত আদাম আলাইহিচ্ছালামের মস্তিস্কে, এলেম অন্তঃকরণে এবং হায়া চক্ষুতে কায়েম হইয়া গেল।

খোলাছা তাফছীর ঃ এ আয়াতে কারীমার সারসংক্ষেপ এই যে, যখন কোন ভাললোকের পক্ষ হইতে মুনাফিকদিগকে বলা হইত 'তোমরা হাকীকি ঈমানদারগণের ন্যায় ঈমান আনয়ন কর। যাহার ফলে, ফেতনা ফাছাদ বন্ধ হইয়া যায়। এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখেরাতের সহিত ভালবাসা স্থাপিত হয়। আর তোমাদেরকে যেন আখেরাতের মধ্যে শামিল করা যায় এবং ঐ লোকদের মধ্যেও শামিল করা যায়। যাহারা প্রকৃত মানুষকে তখন মুনাফিকেরা উত্তর দিত– "আমরা কি ঐ সমস্ত বোকাদের ন্যায় ঈমান আনিব যাহারা কাল্পনিক বেহেশ্তের আশায় দুনিয়ার শান্তিকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ওহে ভাই! দুনিয়া ধর্মের আগে পরকাল কে

দেখিয়াছে, আর বেহেশ্‌তের নিয়ামতেরই বা কি খবর? উপস্থিত সুখ-শান্তি ও ভোগের সামগ্রীকে অনাগত অজানা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ও তথাকথিত পরকালের নিয়ামতের আশায় বর্জন করিয়া দেওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নহে। এই বোকাদের দুনিয়ার জ্ঞান নাই, তাহারা পরকাল চায় এবং অন্ধভাবে সেই দিকেই ছুটিতেছে। আমরা তাহাদের মত নহি, দুনিয়াদারী সম্পর্কে আমরা তাহাদের শিক্ষা দিতে পারি। আমরা এমন ধরনের চাল চালিয়া নিব যাহাতে কোন ক্ষতি আমাদিগকে কখনো স্পর্শ করিবে না। আমরা উভয় পক্ষেই রহিয়াছি, যদি মুসলমানের জয়লাভ হয় তবে তাহাদের সঙ্গে আর কাফেরদের জয়লাভ হইলে তবু আমাদেরই বিজয়। কতক নিঃস্ব ও গরীব লোকদের কারণে সমস্ত বড় বড় লোকদিগকে আমরা নারাজ করিতে পারিব না।" মুনফিকদের এইসব প্রলাপোক্তির প্রতিবাদে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করিলেন– 'ইহারা নিরেট জাহেল ও বেকুফ।' বস্তুতঃ তাহাদের এ ধরনের টাল বাহানা সর্বদিক দিয়াই মারাত্মক। এমনও সময় আসিবে যখন তাহাদের কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর বৃষ্টির ধারার ন্যায় লা'নত বর্ষিত হইতে থাকিবে।

উপকারিতা ঃ এই আয়াত শরীফের দ্বারা কতক উপকারিতা হাছেল হয়। ১নং ধর্মীয় আলোচনায় আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দাগণের পাইরুবী বা অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এই জায়গায় ইরশাদ হইয়াছে– 'মকবুল বান্দাগণের ন্যায় তোমরাও ঈমান আনয়ন কর।' ২নং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, 'মজহাবে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' সত্য ও নির্ভুল। এইহেতু যে, উহাতে সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং ছল্‌কে ছালেহীনগণের পাইরুবী বা অনুসরণ রহিয়াছে। ৩নং নজদী-ওয়াহাবী-দেওবন্দী প্রভৃতি বাতেল ফেরকাসমূহ গোমরাহ্‌ বা পথভ্রষ্ট। কেননা, ইহারা গায়েরে মোকাল্লেদ মজহাব আমান্যকারী। ইহাদের মতে 'তাক্‌লীদ' করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ওয়ালা গণের রাস্তায় তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলা খারাপ ও নিন্দনীয়। বরং দেওবন্দী সম্প্রদায় ঐ সমস্ত ভাল কাজকে শিরিক বলিয়াও প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। যাহার উপর আরব ও আজমের সমস্ত মুসলমানদের আমল নির্ভরশীল। ৪ নং প্রতীয়মান হয় যে, ছালেহীন গণকে খারাপ জানা মুনাফিকদের কাজ। আজও রাফেজী বা শিয়া সম্প্রদায় খোলাফায়ে রাশেদীন এবং খারেজীরা হজরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহুকে খারাপ জানিয়া থাকে। বরং ইহা রাফেজীদের ঈমানের মূল বিষয়। আর মুনাফিকদের কাজওতো ইহাই ছিল হুজুরে পাকের ছহাবাগণকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করা। গায়ের মোকাল্লেদ সম্প্রদায় হজরত ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়া থাকে। দেওবন্দী ফেরকা সর্বযুগের আওলিয়ায়ে কেরামকে এবং উলামাগণকে মুশরেক ও কাফের ধারণা করিয়া থাকে। কেননা, তাহাদের মতে, মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা, হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের তারিফ প্রশংসা করাকে শিরিক বলিয়া থাকে। এমতাবস্থায় তামাম

জাহানের কোনও আলেম ও আওলিয়া এ শিরিক হইতে রক্ষা পান নাই। যদি কুখ্যাত ওহাবীদের ধর্ম-পুস্তক 'তাকবিয়াতুল্ ঈমানের' শিরিকের কাণ্ড কারখানার প্রতি নজর দেওয়া যায় তবে স্বয়ং ইসলামকে মানাই শিরিকের পর্যায়ভূক্ত হইয়া পড়ে। কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবীগণকে ছাহাবাগণকে এবং সমস্ত মোহাদ্দেসগণকে বরং সমস্ত শীর্ষস্থানীদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে। এই আয়াতে কারীমার দ্বারা প্রমাণিত হয় এই সমস্ত ফেরকা ও সম্প্রদায় বাতেল ও পথভ্রষ্ট। 'তাফছীরে খাজায়েনুল এরফান' দ্রষ্টব্য। ৫নং ইহাতে ঈমানদার উলামাগণের জন্যে সন্ত্বনার বাণী রহিয়াছে যে, বেদ্বীনদের কটুউক্তির জন্যে যেন দুঃখিত না হয়। আর এ বোধশক্তি যেন জন্মলাভ করে যে, সর্বযুগে বাতিলদের একই রীতি অনুসৃত হয়।

তাফছীরে মাদারেক ঃ হক কথা এই যে, উলামায়ে কেরাম দ্বীনে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার হেফাজতকারী এবং চৌকিদার স্বরূপ। কেননা চৌকিদারের উপস্থিতিতে চোর কখনও তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে বা চুরি করিতে পারে না। সেইহেতু চোর প্রথমেই চৌকিদারের উপর হামলা করিয়া থাকে। তদ্রূপ, অদ্যাবধি যেই বেদ্বীন ধর্মের নাম নিয়া আত্মপ্রকাশ সেই সর্বপ্রথম আলেমগণের উপর হামলা করিয়া থাকে। আলেমগণকে ঠাট্টা বিদ্রোপ করিয়া থাকে কেননা, তাহারা জানে যে, আলেমগণ মওজুদ থাকতে ইহারা দ্বীনে মোস্তফা মধ্যে চুরি করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু, তাহাদের জানা উচিত যে, চৌকিদারের শাহেন্‌শাহ্‌র হাত রহিয়াছে এবং সমস্ত রাজ্যের আমলাগণ সহায়ক রহিয়াছেন। অনুরূপভাবে, দ্বীনে মোস্তফার চৌকিদারের প্রতি অর্থাৎ উলামায়ে দ্বীনের প্রতি শাহেন-শায়ে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার রহমতের হাত রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ ফেরেশতাগণ তাহাদের সাহায্যকারী। এইজন্যে বড় বড় বাতিল শক্তি যেমন- খাকছার, দেওবন্দী-ওয়াহাবী প্রভৃতি ফেরকা সময় সময় উলামায়ে দ্বীনের সহিত ঝগড়া-ফাছাদ করিয়া থাকে। এমনকি হাক্কানী উলামাগণকে সুযোগমত পাইলে নির্মমভাবে হামলা করিয়া বসে। কিন্তু অবশেষে, নগন্য হইতে নগন্য বস্তু তুলার ন্যায় বাতিল ও ভ্রান্ত শক্তি বায়ুতে উড়িয়া যাইবার মতন উড়িয়া যায়। বাতিল কখনো হকের মোকাবেলায় টিকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, উলামায়ে হক্কানী যাহারা সত্যিকার নায়েবে নবী তাঁহাদের মর্যাদা ও সম্মান কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। বরং তাঁহাদের শান ক্রমশঃ বাড়িয়াই থাকে। অতএব, আলেমগণের উচিত সত্যধর্মের খেদমতে জীবন দান করা। যদি আলেমগণ দ্বীনে মোস্তফার খেদমতগার ইহয়া যায় তবে দুনিয়া তাঁহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে।

ছূফীয়ানা তাফছীরঃ- ছুফিয়ানে কেরাম বলিয়াছেন– দুনিয়ায় মানুষ মুছাফীরের অবস্থায় আছে। নিজের আসল ঠিকানায় আলমে আরওয়াহ্ বা রুহের জগত হইতে আপন প্রতিপালক প্রভুর নিকট কিছু অঙ্গীকার করতঃ কিছু অর্জন করিতে এই বিদেশে মুছাফীরের জীবন অতিবাহিত করিতেছে। কিন্তু এ জগতের

ফল-ফুল ইত্যাদির বাগানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ নিজের প্রকৃত বাসস্থান এবং জিন্দেগীর আসল মকছুদকে ভুলিয়া গিয়াছে। অতঃপর, সেই আপন বাসস্থান হইতে সময় সময় চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম কিংবা পিয়ন সমন নিয়া আসিয়া থাকে। আর জানাইয়া দেয়– ওহে বিদেশী! বিদেশ হইতে উপার্জন করতঃ আপন দেশে পাঠাইতে থাক, যেথায় তুমি চিরকাল বাসবাস করিবে। এমন মূল্যবান সময় আর সুবর্ণ সুযোগ তুমি আর কখনো পাইবে না। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান রোকেরা এই সংবাদে হুশিয়ার হইয়া যায়। এবং নিজের আসল বাড়ীর জন্যে সম্বল সংগ্রহে প্রস্তুত হইতে লাগিয়া যায়। কিন্তু গাফেল বা অলস লোকেরা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সৌন্দের্যে এতই মত্ত হইয়া থাকে যে, ঐ খবরেও গাফলতীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। উপরন্তু, কোন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যদি তাহাদের আলস্যর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে এবং জ্ঞানীগণের অনুসরণে সুদীর্ঘ ছফরের পুরাপরি সম্বল সংগ্রহ করিতে অনুপ্রেরণা জোগাইবার প্রয়াস পায় তখন ইহারা উপদেশ-বাণী শ্রবণতো দূরের কথা, বরং উল্টাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করিয়া থাকে। এবং আল্লাহতায়ালার প্রিয়বান্দাগণকে পাগল-দেওয়ানা বলিতে থাকে। বিদেশের মাল-আসবাবের প্রতি এতদূর নিমগ্ন থাকে যে, নিজের চিরস্থায়ী বাসভবনের কোন খবরও রাখে না। তাহারা আল্লাহ-ওয়ালা ব্যক্তিগণের চিহ্ন বেশ-ভূষা, এবং জরদ-রঙ্গের চেহারা দেখিয়া তাহাদের দ্বীলের নূর এবং সীনার খাজানা হইতেও বে-খবর রহিয়াছে। এই আল্লাহ্ ওয়ালাগণ মাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্যে দুনিয়ায় আসিয়াছেন।

ছূফিয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন- এলেম দুই প্রকার : (১) এলমে জাহের ও (২) এল্‌মে বাতেন বা এলমে লাদুনী । ইহার কারণ এই যে, ক্বাল্‌ব বা আত্মার দুইটি দরজা রহিয়াছে– একটি জাহেরী এবং অপরটি বাতেনী। জাহেরী দরজা জাহেরী অনুভব শক্তির দ্বারা হাছেল হয়। আর বাতেনী দরজা দ্বারা এলহাম যাহার মাধ্যমে এলমে বাতেন হাছেল হয়। যে ব্যক্তি কেবল জাহেরী দরজার উপর ভরসা করিয়া বাতেনী দরজা বন্ধ করিয়া রাখে সে ব্যক্তি জাহেল যদিও সে খুবই লেখাপড়া শিখিয়া থাকুক। এই মুনাফিক সম্প্রদায় বড়ই চালাক এবং ইহারা ধর্মও বুঝিত কিন্তু, ইহারা যেহেতু এলমে লাদুনী বা এলমে বাতেন হইতে অন্ধ ছিল এইহেতু তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে– لَا يَعْلَمُوْنَ লাইয়া'লামুন। আর যে ব্যক্তি জাহেরী এল্‌মের উপর আমল করে এবং তাহার ক্বাল্‌বের দরজা না খুলে সে এলমের নূর হইতে বঞ্চিত থাকে। বরং অধিকাংশ সময় তাহার এই এলেম তাহার জন্যে হেজাব বা পরদা স্বরূপ হইয়া থাকে।

১ নং প্রশ্ন ঃ ঐ যুগে মুনাফিকদের এতদূর প্রভাব কিরূপে ছিল যে ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দিতে সাহস করিত, আর মুসলমানগণ তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারিত বর্তমান যুগে কোনও বেদ্বীনের এতদূর সাহস নাই যে, কোন ছাহাবীর শানে কোন প্রকার কটুক্তি করে।

উত্তর ঃ মুনাফিকদের ঐ কটুক্তি মুসলমানদের সম্মুখে ছিল না। বরং ঐ

দুষ্টামি ছিল তাহাদের বিশেষ বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্‌পাক তাহাদের এই গোমর ফাঁস করিয়া দিয়োছেন। আর্থাৎ মুনাফিকদের কপটতার পর্দা উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান জমানার গোমরাহ্ ফেরকাসমূহও তাহাদের বাতিল আকিদাসমূহ মুসলমানদের নিকট গোপন রাখে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তাহাদেরই লেখনী ও পুস্তকাদির মাধ্যমে তাহাদের আন্তরের কালিমা পূর্ণ জঘণ্য আকীদা যাহা গোপনে পোষণ করিত তাহা প্রকাশ করিয়া দেন। এ আয়াতে কারীমা দ্বারা মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন বেদ্বীনদের মৌখিক সুন্দর সুন্দর কথায় প্রতারিত না হয়।

২নং প্রশ্ন ঃ আকায়েদের মধ্যে তাক্বলীদ করা নিষিদ্ধ এবং তাক্বলীদি ঈমানে এতেমাদ্‌নাই। কিন্তু এ আয়াতের মর্মে জানা যায় ধর্মে তাক্বলীদ জরুরী দরকার। কেননা, এই জায়গায় ইরশাদ হইয়াছে– 'মুসলমানদের মত তোমারা ঈমান আনয়ন কর।'

উত্তর ঃ ইহা তাক্বলীদি ঈমান নহে। 'তাক্বলীদি ঈমান' উহাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি ঈমানের কোন খবরই রাখেনা, কেবল এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, যে– 'অমুকের যে ঈমান আমারও সেই ঈমান।' অথচ নিজে ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের সম্পূর্ণ বে-খবর রহিয়াছে। আর ইহারই প্রকাশ করে যে, 'ইসলাম সত্য কি মিথ্যা আমার জানা নাই, কেবল অমুকের দেখাদেখি মুসলমান হইয়াছি।' এ উভয় প্রকার ঈমান কবুল হয় না। এ আয়াতে কারীমায় ইহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে যে, ঈমান ঐ জিনিস যাহা গভীর চিন্তা ও অনুধ্যান সহকারে উপলব্ধি করতঃ অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা হয়।' কিন্তু শর্ত এই যে, 'তাহা আল্লাহ্‌-ওয়ালাগণের পথ-নির্দেশের মাধ্যমে হইবে। তবেই তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

৩নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌পাক যখন মুনাফিকদের কুফুরী প্রকাশ করিয়াছেন; তবে তাহাদের উপর মোরতাদ হইবার আদেশ জারী করেন নাই কেন? অথচ তাহাদের মুখে বহুবার কালেমায়ে কুফর বাহির হইয়া যাইত। যথা– এই দল ইয়া মুহাম্মাদু' ইত্যাদি। আজকাল এ ধরনের উক্তিতে উক্তিকারী মোরতাদ ও কাতলের যোগ্য হইয়া যায়।

উত্তর ঃ ঐ যুগে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। কাজেই, মুনাফিকদের উপর এই ধরনের নরম আদেশ জারী ছিল যেন ইহারা কিছু দিনের মধ্যে মুখলেছ বা খাঁটী হইয়া যায়। যখন ইসলামের প্রভাব বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে, মুসলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইসলাম শক্তিশালী হইয়াছে এবং পবিত্র ইসলাম হইতে নেফাক বা কপটতার অবসান হইয়াছে, এক্ষণে হয়ত মুমিন হইবে নতুবা কাফের। যদি গোস্তাখী বা বেয়াদবীপূর্ণ একটি শব্দও কাহার মুখ হইতে শোনা যাইবে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে কাতল করা যাইবে। যেরূপ, হজরত খাদিজা রাদিয়ল্লাহু আনহুর হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪ নং আয়াত ঃ اٰمَنُوْا قَالُوا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থঃ এবং যখন তাহারা ঈমানদারগণের সহিত মিলিত হইত তখন বলিত আমরা তোমাদেরই সহিত রহিয়াছি, আর যখন শয়তানদিগের নিকট একাকী থাকিত তখন বলিত– 'আমরাতো তোমাদেরই সহিত রহিয়াছি। আমরা কেবল তাহাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছি মাত্র।'

সম্পর্ক ঃ এ আয়াতের পূর্বের আয়াতের সহিত কয়েকটি সম্পর্ক রহিয়াছে। যথা- (১) ইতিঃপূর্বে, মুনাফিকদের তিনটি দোষের আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে, চতুর্থ দোষের কথা বর্ণিত হইতেছে। (২) প্রথমতঃ মুনাফিকদের ধর্মীয় অবস্থা এবং শুধু মুসলমানদের সহিত তাহাদের ব্যবহারের বয়ান ছিল। এক্ষণে, মুমিন এবং কাফেরের সহিত তাহাদের কাজ কারবার কেমন ছিল তাহা বর্ণিত হইতেছে। (৩) এই আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ। কেননা ঐ জায়গায় ইরশাদ হইয়াছে যে, মুনাফিকরা নিজেরদেরকে খুব বুদ্ধিমান ধারণা করিত এবং মুসলমানদিগকে বেকুফ বলিত। এক্ষণে, তাহাদের সেই ধোকাবাজী ও প্রতারণার কথা উল্লিখিত হইয়াছে যাহা তাহাদের বিবেচনায় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের কাজ ছিল।

হেদায়াত ঃ কেহ কেহ বলেন ইহা আয়াতে মুকার্রার যাহার দ্বারা পুনরালোচনা করা হয়। কেননা, মুনাফিকদের ঈমানের হাল জাহির করিবার পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে- و من الناس من يقول امنا অর্থাৎ, হে নবী! কিছু লোক আপনার নিকটে আসিয়া বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।

এক্ষণে, ঐ বিষয়েরই বয়ান হইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত এবং মিথ্যাচর্চা মাত্র, যাহার কোনও মূল্য নাই। ঐ স্থানে তাহাদের ধর্মীয় আবস্থার বিবৃতি ছিল আর এক্ষণে, তাহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা করা হইতেছে। অর্থাৎ পূর্বে মুনাফিকদের আকীদা-বিশ্বাসের উল্লেখ হইয়াছে আর এখন তাহাদের প্রতারণার কথা বর্ণিত হইতেছে।

শানে নযুল ঃ- এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই মুনাফিক প্রভৃতি মুনাফিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হইয়াছে। একদা ইহারা ছাহাবায়ে কেরামের এক জমাত আসিতে দেখিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই যে মুনাফিকদের দলপতি ছিল, সে তাহার সঙ্গীদের বলিতে লাগিলো 'তোমরা লক্ষ্য কর, আমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করি।' যখন এই মহাত্মাগণ তাহাদের নিকটবর্তী হইলেন তখন আবদুল্লাহ্ প্রথমে হজরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত মুবারক ধরিয়া বলিতে লাগিল– 'আপনি জনাব ছিদ্দিক বনী তামীম গোত্রের সর্দার, শায়খুল ইসলাম রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার 'গারে হেরার সাথী' আপন জান ও মালকে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রতি কোরবান করিয়াছেন। আবার হজরত উমর ফারুক রদিয়াল্লাহু আনহুর হস্ত মোবারক ধারণ

পূর্বক বলিতে লাগিল ছোব্হানাল্লাহ্! আপনি বনি আদীর সর্দার, ফারুক আপনার উপাধি নিজের জান ও মাল আপনি রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ছাল্লামার উপর কোরবান করিয়াছেন। তৎপর, সে হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হস্ত মোবারক ধরিয়া বলিতে লাগিল– মাশাআল্লাহ্! আপনি রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ভাই, বনি হাসেমের সর্দার এবং হুজুরের জামাতা তখন মাওলা আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু বলিলেন– হে আবদুল্লাহ্, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কপটতা ছাড়, নিশ্চয়ই মুনাফিক বা কটপ বিশ্বাসী লোক সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ উত্তরে বলিল হে আলী! আপনি কেন এইরূপ বলিতেছেন, আমাদের ঈমানওত আপনাদের মত? অতঃপর ছাহাবায়ে করামগণ এইস্থান ত্যাগ করতঃ রওয়ানা হইয়া গেলেন। আবদুল্লাহ্ তাহার জমাতের সহিত বলিতে লাগিল– 'তোমরা দেখিলেত আমি কিরূপ চাল চালিয়াছি?' তখন সেই জমাতের লোক আবদুল্লাহ্‌র খুবই প্রশংসা করিল তারপর এ আয়াতে কারীমা নাযিল হইল ('তাফছীরে রুহুল বয়ান' তাফছীরে খাজায়েনুল্ এরফান' দ্রষ্টব্য)।

তাফছীর ঃ لقوا লাকু এই শব্দ لَقْوٌ লাকাবুন হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– মোলাকাত করা , সম্মুখে আসা। এই জায়গায় উভয় অর্থই বুঝাইতে পারে। الذين امنوا আল্লাজিনা আমানু-র মধ্যে খাঁটী মুসলমান বুঝায়। মৌখিক দাবীর মুসলমানত মুনাফিকও রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা এই ধরনের চালবাজি বা প্রতারণা খাঁটী মুসলমানদের সহিত করিত।

امنا, আমান্নার মধ্যে হাকীকী ঈমান বুঝায়। তাহাদের মৌখিক ঈমানের মধ্যে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু হাকীকী ঈমান সন্দেহপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত লোকেরা বারবার শপথ করিয়া নিজেদের ঈমান ও এখলাছের প্রত্যয়ন করিয়া থাকে। কথায় বলে– বিলাতী ঘি-র নাম আসল ঘি। আজকাল বেদ্বীন লোকদের মধ্যে এই রীতি পরিলক্ষিত হয় যে, বেশী বেশী কছম খাইয়া নিজেদের ঈমান ও খাঁটীত্ব জাহির করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, প্রকৃত সন্দেহ প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহে। তদ্রূপ, খাঁটী মুসলমানদের শপথের প্রয়োজন হয়না। তাহার ঈমানের নূর আপন জ্যোতিতে জ্যোর্তিময় এবং উহা স্বয়ং বিকশিত। خلوا খালাও শব্দ খালবুন হইতে বাহির হইয়াছে, যাহার অর্থ একাকী হওয়া। قد خلت ক্বাদ খালাত।' এবং ঠাট্টা করা। এইস্থানে প্রথম অর্থই বুঝাইয়াছে যখন মুনাফিক দল নিজেদের শয়তান দিগের নিকটে একাকী গমন করিত যেখানে কোন মুসলমান না থাকিত তখন ইহারা কথাবার্তা বলিত। شيطينهم

শায়াত্বিন শয়তানের বহুবচন। শয়তান শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আউযুবিল্লাহ তাফছীরে করা হইয়াছে। আর ইহার হাকীকত ইন্‌শাল্লাহু পরে বয়ান করা হইবে। কিন্তু এইখানে তাহাদের দোস্ত বুঝায়। অথবা মুনাফিকদের দলপতি যে সে শয়তানের মত দুষ্টু ও পথভ্রষ্ট। আরববাসীগণ প্রত্যেক পথভ্রষ্টকেই শয়তান বলিয়া

আখ্যায়িত করিয়া থাকে। ضحاك দাহাক বলিয়াছে– এই জায়গায় শায়াত্বিন দ্বারা বুঝায় কাফেরদের গণক, পণ্ডিত ইত্যাদি। কেননা, তাহাদের নিকট শয়তানের আনা-গোনা হইত; আর তাহারা সংখ্যায় কয়েকজন ছিল। বনি কুরায়জার কা'ব ইবনে আশ্‌রাফ্ বনি আছ্‌লামের আবু বুর্‌দা' এবং আবু জুহিনা, আবদুর দারদা এবং বনি আছাদের মধ্যে আউফ ইব্‌নে আমের এবং মুলকে শামের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ছওদা' যাহার বিষয়ে আরববাসীগণের এই ধারণা ছিল যে, এই লোক গায়েবের খবর অবগত রহিয়াছে। এবং সে রোগের চিকিৎসা করে। انا معكم এর দ্বারা বুঝায় যে, আমরা তোমাদের সাথী। অর্থাৎ, মুনাফিকরা ঐ সরদারগণের নিকট গিয়া বলিত– আমরা দ্বীন, আকায়েদ ও আমালের মধ্যে তোমাদের সাথী, অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছি। জানিয়া রাখিবেন যে, মুনাফিকরা মুসলমানের সহিত কেবল امنّا আমান্না বলিয়াছে অর্থাৎ, আমরা ঈমান আনিয়াছি জুমলায়ে ফেইলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে আর ইহার সহিত কোন তাকিদ ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা, তাহারা বুঝিত যে, মুসলমানরা সাদা-সিদা লোক; কেবল আমরা বলিলেই মানিয়া লইবে। এবং আমাদের কথায় কোন সন্দেহ প্রকাশ করিবে না। এইজন্যে, তাকিদ ব্যতীত কথা বলিয়াছে। এবং ইহাও বলিয়াছে যে, আমরা মুসলমান হইয়াছি। অর্থাৎ, পূর্বে কাফের ছিল এখন মুমিন হইয়াছে। এবং কাফেরদের সম্বন্ধে তাহাদের খেয়াল ছিল যে, ইহারা চালাক লোক, বিনা তাহ্‌কিকে আমাদের কথা মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যে, ইন্না দ্বারা তাহাদের কথার তাকিদ করিত। জুমলায়ে ইছ্‌মিয়া ব্যবহার করতঃ বলিত– আমরাও তোমাদের সহিত রহিয়াছি এবং থাকিব। কিন্তু, তথাপি তাহাদের সন্দেহ হইত যে, ইহারা মুসলমানদের সহিত নামাজে যায়, তাহাদের ওয়াজ-মাহফিলে যোগদান করে এবং জিহাদে শামিল হয়। তাহারাই আবার আমাদের সঙ্গে কিরূপে এই সন্দেহ দূর করিবার জন্যে বলে যে,

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ, হে বন্ধু! আমাদের জাহেরী ব্যবহারের দ্বারা তোমরা ধোকা খাইওনা। আমরাতো কেবল মুসলমানদিগকে বেকুফ বানাইবার উদ্দেশে এই ব্যবহার করিয়া থাকি। আন্তরিকভাবে আমরা তোমাদেরই সহিত রহিয়াছি। এই জাহেরী ব্যবহার শুধু তাহাদের সহিত থাকিয়া আমাদের জান-মাল ও আওলাদের হেফাজত এবং গণিমত হাছিল করিবার উদ্দেশ্যে। উপরন্ত মুসলমানদের গোপনীয় সংবাদাদি তোমাদের নিকটে পৌঁছাইতে সমর্থ হইব। مستهزءون মুছ্‌তাহ্‌যিউন هزو হাযবুন হইতে বাহির হইয়াছে যাহার অর্থ হালকা যে ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যু বরণ করে তাহাকে 'হাযী' বলে। আর যে জন্তু অতি দ্রুত বেগে চলে উহাকে الستهزا ইছতিহ্‌জার' বলে। অর্থ– কাহাকেও জাহেল বানান বা তাহার সহিত হাসি-ঠাট্টা করা; অথবা আপমান করা। এইস্থানে এই তিনটি অর্থই হইতে পারে। আবার যখন নিজেদের সর্দার এবং সঙ্গী বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইত তখন অতিশয়

দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া বলিত যে, 'আমরা সর্বদিক দিয়া তোমাদের সঙ্গে আছি। বরং আমরা কেবল মুসলমানদিগকে ঠাট্টা করিবার উদ্দেশেই তাহাদের সামনে কালেমা উচ্চারণ করিয়া থাকি। আর তাহারাত বেকুফ। আমাদের কাথাকে সত্য বলিয়া ধারণা করতঃ আমাদিগকে তাহাদের খাছ মজলিছে শরীক করিয়া থাকে। যার ফলে, আমরা তাহাদের দ্বীলের অবস্থা এবং খাছ পরামর্শ অবগত হইয়া তোমাদিগকে জানাইতে পারি। হে কাফের সকল! আমাদের এই নীতি তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক ও উপকারী। কাজেই আমাদিগকে সাহায্যকারী বলিয়া গণ্য করা তোমাদের কর্তব্য।

উপকারিতা ঃ- এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি উপকারিতা পাওয়া যায়। (১) ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কিংবা হাসি-তামাসার উদ্দেশে কালেমা শরীফ উচ্চারণ করা কুফুরী। কেননা, কোরআনে কারীমে এই ধরনের ঈমান প্রকাশ করাকে কুফর প্রমাণিত হইয়াছে। (২) নবীগণের সহিত কিংবা ধর্মের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করাকে কুফুরী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। (৩) ছাহাবায়ে কেরাম এবং ইমামগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফুরী। (খাজায়েনুল এরফান)। বরং প্রত্যেকটি ধর্মীয় জিনিস যথা– কোরআনে পাক, মসজিদ, উলামায়ে কেরাম, রমজান শরীফ আওলিয়া-আল্লাহ্গণের মাজার শরীফসমূহ ইত্যাদির অবমাননা কুফুরী; আর এই সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানস্বরূপ। পরহেজগারীর আলামত সম্পর্কে কোরআনে কারীমের ফরমান এই যে, যে কেহ শাআয়েরুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে সে ওলি ও পরহেজগার।' (৪) বদমজহাবীদের সহিত একই মজালীছে বসা এবং বদআকীদা সম্পন্ন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গণ্য করা মুনাফিকদের রীতি। আজকাল এই বিমার (ব্যাধি) মুসলমান সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করিয়াছে। (৫) মানুষকে ঠাট্টা করা খুবই খারাপ কাজ। কোরআনে কারীমে আছে– لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ 'লাইয়াছখার্ কাওমুন মিন কাওমিন' 'তোমরা কোন এক জাতি অন্য জাতিকে ঠাট্টা করিও না।' হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামকে বনি ইসরাইল সম্প্রদায় বলিয়াছিল– 'আপনি আমাদের ঠাট্টা করুন।' তিনি উত্তরে বলিলেন– 'আল্লাহ্ আমাকে উহা হইতে রক্ষা করুন যেন আমি জাহেদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাই।' ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, কাহারও সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হওয়া জেহালত বা অজ্ঞতা। মনে রাখিবেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর খোশ-তাবাঈ অর্থাৎ মৃদু হাসি-রসিকতা (যাহা নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ) কখনও এক কথা নহে। খোশ-তাবাঈকে مزاح মাযাহ্ বলে। এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঠাট্টার মধ্যে কাহাকেও অবমাননা কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য থাকে। আর খোশ-তাবাঈর মধ্যে কাহারো দ্বীলকে খুশী করা কিংবা চিন্তামুক্ত করার চেষ্টা ও তদবীর থাকে। কোন কোন খোশ-তাবাঈ জায়েজই নহে, বরং সুন্নত বলিয়া প্রমাণিত। কিন্তু ইহাতে শর্ত এই যে, কোন প্রকারের মিথ্যার আশ্রয় যেন না

থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ঠাট্টার আরম্ভ নিষিদ্ধ। কেহ যদি ঠাট্টা করে তবে ইহার প্রতি উত্তর দেওয়া যাইবে। হ্যাঁ, ঠাট্টার জওয়াবে মুসলমানকে ছাড়িয়া দেওয়া আর কাফেরের প্রতিবাদ করা সুন্নতে ছাহাবা। হজরত হাছান রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারের না'ত পরিবেশক ছিলেন, তিনি কাফেরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সমুচিত প্রতিবাদ করিতেন। এবং হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাহার জন্যে দোয়া করিতেন।

প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ্‌পাক ঐ আয়াতে মুনাফিকদের ছুগলী মুসলমানদের সামনে করিয়াছেন এবং তাহাদের গীবতও করিয়াছেন। এই উভয় কর্মই দূষনীয় এবং আল্লাহ্‌র শানের খেলাফ।

উত্তর ঃ- ইহার কয়েকটি উত্তর রহিয়াছে। যথা– (১) এই জিনিস বান্দার জন্যে নিষেধ, কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্যে নহে। তিনি বান্দার মালিক যেভাবে খুশী সেভাবেই তিনি বান্দার স্মরণ করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে খারাবীর সহিত অথবা ভালায়ীর সহিত স্বীয় বান্দাকে উল্লেখ করিতে আলোচনার বস্তুতে পরিণত করিতে পারেন। আমরা কাহাকেও হত্যা করিলে অপরাধ হইবে কিন্তু আল্লাহ্‌পাক মৃত্যু দান করিয়া থাকেন। হ্যাঁ, মুসলমানের গীবত ও ছুগলী খারাপ কিন্তু কাফেরের বেলায় নহে। দেখুন, আবু জাহেল, আবু লাহাব এবং ইবলিছকে অদ্যাবদি খারাপ বলা হইতেছে। শত্রুতা ও ফাছাদ সৃষ্টিতে গীবত ও ছুগলী খারাপ। কাহাকেও গোনাহ্ হইতে রক্ষাকল্পে অথবা সংশোধনের উদ্দেশে কাহারও পিছনে সমালোচনা করা বা খারাপ কোন গীবত কিংবা ছুগলী নহে। বরং উহা এছলাহ্ বা সংশোধন। এই জায়াগায় মুসলমান মুনাফিকদের শয়তানী হইতে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য আর মুনাফিকদের এছলাহ্ বা সংশোধনও কাম্য ছিল। আজও হাদীছের রাবীগণের আয়েব বর্ণনা করা হয় ফাছাদকারীদের শয়তানী হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশে ঐ দোষের চর্চা হয় যেন তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা না করা হয়। শাগরিদের অভিযোগ উস্তাদের সঙ্গে করা চলে।

ছুফিয়ানা তাফছীর ঃ দুনিয়া ও আখেরাত এক জিনিস নহে। উভয়ই একত্র সমাবেশও হইতে পারে না। মুনাফিকদের বাসনা ছিল যে, তাহারা মুখে মুখে দ্বীনদার থাকিয়া এবং অন্তরে কাফের থাকিয়া এ উভয় জিনিস দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্র সম্মিলিত করিবে। কিন্তু পরিণামে, কিছুই হইল না, সবই নিস্ফল। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি ভাবে যে, অন্তরে ধর্ম আর মুখে দুনিয়া এবং এতদুভয়ের একত্র সমাবেশ করিবে সে ভুলের জগতে বাস করে। দুনিয়ার অর্থ ও উহার হাকীকত পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। ছুফিয়ানে কেরামের আমল এই যে, পানির মধ্যে আবস্থানকারী নদীতে মাছের ন্যায় সাঁতার কাটে; কিন্তু বাতাসে পাখি-হইয়াই উড়িয়া যায়। মেয়েলোক কলসী নিয়া রাস্তা অতিক্রম করে; তাহাদের অবস্থা এই যে, নজর তাহাদের রাস্তার দিকে কিন্তু খেয়াল থাকে কলসীর দিকে। কিন্তু, 'মর্দে ময়দান ঐ ব্যক্তি যে, বাড়ীতে সাংসারিক কাজে দুনিয়াদার বলিয়া মনে

হয় আর মসজিদে দ্বীনদারগণের সর্দার। দুনিয়ার সর্বকাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু খেয়াল থাকে সর্বক্ষণ দ্বীনের প্রতি। মোটকথা, তারেকে দুনিয়া কমজোর; কিন্তু তারেকে দ্বীন বা দ্বীন বর্জনকারী বেঈমান।

১৫ নং আয়াতঃ

اللهُ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ·

অর্থঃ- আল্লাহ্ তাহাদের সহিত উপহাস করিতেছেন এবং তাহাদিগকে ঢিল দিয়াছেন। যেন তাহারা নিজেদের কুফুরী ও নাফরমানীতে হয়রান পেরেশান থাকে।

সম্পর্ক ঃ ইতি:পূর্বে, মুনাফিকদের ৪র্থ ধোকার বয়ান করা হইয়াছে। এক্ষণে, তাহাদের শাস্তির বয়ান করা হইতেছে। যাহাতে শ্রবণকারীরা ইহার দ্বারা নছিহত গ্রহণ করিতে পারে। আর এহেন জঘন্য কার্য্যকলাপ হইতে বিরত থকিতে সমর্থ হয়।

তাফছীর ঃ- এ আয়াত আল্লাহ্র নামে শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মুসলমানদের পক্ষে মুনাফিকদের ঠাট্টার প্রত্যুত্তর দিবার কোন আবশ্যক নাই। বরং তাহাদের পক্ষ হইতে স্বয়ং আল্লাহ্পাক সে উত্তর দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাকের ঠাট্টার মোকাবেলায় মুনাফিকদের ঠাট্টার কোন অর্থই নাই। যেমন– কোন শক্তিশালী পক্ষ কোন দুর্বল প্রতিপক্ষকে বলে– 'তুমি কি প্রতিশোধ লইবে প্রতিশাধ তো আমি লাইব।' يَسْتَهْزِى ইয়াছ্তাহ্যিউ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ঠাট্টার তিনটি অর্থ জাহের বানান, অপমান করা এবং হাস্য করা। এইস্থানে প্রথমোক্ত দুইটি অর্থ প্রযোজ্য, তৃতীয়টি নহে। কেননা, আল্লাহ্পাক ছুবহানাহু তায়ালা হাস্য হইতে পবিত্র। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই হইতেছে যে, 'আল্লাহপাক তাহাদেরকে জাহেল সাব্যস্থ করিলেন অথবা আপমান করিলেন। এই জায়গায় يَسْتَهْزِى ইয়াছ্তাহ্যিউর মধ্যে তিনটি এহ্তেমাল রহিয়াছে। যথা– (১) উহার অর্থ হাল বা বর্তমান কালের রূপ হইবে। অর্থাৎ, মুনাফিক সম্প্রদায় দুনিয়ায় অপমান অপদস্থ হইতেছে। কোনও জায়গায় সম্মান নির্ধারিত নহে। (২) মুস্তাক বেলের অর্থ হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কিংবা দোজখে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হইবে। মুনাফিকদল মুসলমানদের সহিত অবস্থান করিবে আর কাফেরদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। আল্লাহ্পাক সেদিন সকলের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিবেন। মুমিনবৃন্দ সেজদায় অবনত হইবে। কিন্তু মুনাফিকদের পিট এতদুর শক্ত হইয়া যাইবে যে, ইহারা সেজদার পরিবর্তে উল্টাভাবে পিছনের দিকে ঢলিয়া পড়িবে। তখন তাহাদিগকে কুকুরের ন্যায় দেজাখে নিক্ষেপ করা হইবে। মুনাফিকরাত একবারই মুসলমানদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তাহাদের সহিত সর্বত্র ন্যানাভাবে বার বার ঠাট্টা করিতে থাকিবেন। দুনিয়ায়,

মৃত্যুর সময়, কবরে, এবং কিয়ামত দিবসে। ফলকথা, সর্বস্থানে ইহাদের সহিত ঠাট্টা চলিতে থাকিবে।

و يَمُدُّهُمْ ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম-ইয়ামুদ্দু হয়ত مد মাদুন হইতে অথবা مدد মাদাদুন হইতে নিষ্পন্ন। অর্থ– সময় দেওয়া। আর মাদাদ এর অর্থ বৃদ্ধি করা, শক্তি দেওয়া, এছলাহ্ করা। যদি ইহা মাদুন হইতে হয়, তবে আয়াতের অর্থ হইবে 'আল্লাহ্‌পাক ঐ মুনাফিকদেরকে ঢিল দিয়াছেন যেন ইহারা অপরাধ অধিকমাত্রায় করিতে থাকে।' তাহাদিগকে ধরা হয় না।' এবং যদি মাদাদুন হইতে হয় তবে অর্থ হইবে– 'আল্লাহ্‌পাক তাহাদের নাফরমানী ও গোমরাহী বৃদ্ধি করিয়াদেন। এবং ইহাকে শক্ত ও মজবুত করিয়া দেন যেন, ইহারা এইরূপ বুঝিয়া লয় যে, আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর নারাজ থাকিতেন তবে এই কাজে আমাদিগকে সাহায্য করিতেন কেন? কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, ইহা মাদাদুন হইতে বাহির হইয়াছে। কেননা যদি ইহা মাদুন হইতে নিষ্পন্ন হইত তবে يمدهم 'ইয়া মুদ্দুলাহুম' হইত। তফছীরে কবীরে আছে– কোরআনে কারীমে মাদাদুন শার-এর জন্যে এবং يمداد এমদাদুন খায়ের এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় আছে
و نمد له من العذاب به এবং অপর এক জায়গায় আছে–
فى طغيانهم وامدنا كم الى যেহেতু এই জায়গায় নাফরমানী ও গোমরাহীর কথা বলা হইয়াছে। এইজন্যে মাদ্দা বলা হইয়াছে।
فى طغيانهم ফিতুগ্‌ইয়ানিহিম। তুগ্‌ইয়ানিহিমের আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এইজন্যে স্রোতধারাকে তুগ্‌ইয়ানি বলা হয়। কেননা, ইহাও সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এক্ষণে, ইহার ব্যবহার কুফুরী ও নাফরমানীর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করার ব্যাপারে। এইস্থানেও এ অর্থই প্রযোজ্য যে, মুনাফিক সম্প্রদায় নিজেদের নাফরমানীতে সীমালঙ্ঘনকরিয়াছে। يعمهون ইয়ামাহুন عمه আমহুন হইতে নিষ্পন্ন যাহার অর্থ দ্বীলের দ্বারা অন্ধ হইয়া যাওয়া। এইজায়গায় ইহাও বুঝায়। আবার হয়রান-পেরেশান হওয়াও বুঝায়। কেননা, অন্ধকে ময়দানে ছাড়িয়া দিলে সে হয়রান-পেরেশান গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এদিকে-ঐদিকে ঘুরা ফিরা করিতে থাকবে। আসল জায়গায় পৌঁছিতে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ, দুনিয়ার এ বিস্তৃর্ণ ময়দানে মুনাফিক দল অন্ধের ন্যায় ঘুরা-ফিরা করিতেছে, কেননা, এরা কোর্‌আনেপাক এবং ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশুদ্ধ অর্থে মানে নাই এইজন্যে ইহারা সঠিক গন্তব্যস্থল খুঁজিয়া পায় না। আর এ কারণেই, কোন সময় মুসলমানদের দিকে আবার কোন সময় কাফেরদের দিকে ঘুরাফিরা করিয়া থাকে।

খোলাছা তাফছীর ঃ মুনাফিক সম্প্রদায় নিজেরদেরকে বড়ই জ্ঞানী আর মুসলমানদিগকে অজ্ঞ ও বোকা মনে করিয়া বলিত– 'আমরাও তাহাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করি মাত্র।' আল্লাহ্পাক তাহাদের এ ধৃষ্ঠতাপূর্ণ প্রলাপোক্তির জওয়াব দিতে গিয়া বলিয়াছেন- ইহারা মুসলমানদিগকে কি হাসি-ঠাট্টা করিবে; মুসলমানদের প্রতিপালক স্বয়ং তাহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন, এবং করিতে থাকিবেন। এক্ষণে, যে আমাদের সহিত তাহাদের জাহেরী কিছু এবং বাতেনী অন্য কিছু, তদ্রূপ, আল্লাহ্পাকের মামেলাতেও দুনিয়ায় কিছু এবং পরকালে অন্যকিছু। আর দুনিয়ায়তো তাহাদের উপর সমস্ত ইসলামী আদেশজারী করা হইয়াছে। তাহাদের উপর জেহাদ নয়, বরং তাহাদের উপর জিজিয়া। তাহাদের মসজিদে আসিতে বাধা নাই। এবং যাবতীয় ইসলামী কাজকর্মে শরীক হইতেও নিষেধ নাই। মৃত্যুর পর কাফন-দাফন ইত্যাদি সমস্ত আহ্কাম তাহাদের উপর জারী রহিয়াছে। যার ফলে, ইহারা বুঝিয়া লইতে পারে যে, মুসলমানদিগের উপর ইহাদের চালবাজী খুবই কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু যেই কবরে যাইবে তখনই বুঝিতে পারিবে যে ইহার পরিণাম কত ভয়াবহ। তখন অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে আর ক্রন্দন করিতে করিতে বলিবে– হায়! আমরা বড়ই ধোকায় পড়িয়াছি। আমরা বুঝিয়াছিলাম কিছু আর লাভ হইয়াছে অন্যকিছু। আবার তাহাদের অবস্থা এইযে, যখন ইসলামের দলীল শ্রবণ করে তখন মনে করে 'ইসলাম হয়ত সত্য হইলেও হইতে পারে।' আর যখন কাফেরদের ধন-সম্পদ, তাদের আরাম-আয়েশ তথা জাঁক-জমকপূর্ণ চাল-চলন ইত্যাদি এবং মুসলমানদের দরিদ্রতাপূর্ণ ফকিরী জিন্দেগীর প্রতি লক্ষ্য করে তখন স্বভাবতই এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, আল্লাহ্পাক যদি সত্যিই কাফেরদের প্রতি নারাজ থাকিত তবে তাহাদের এত সম্পদ ও ঐশ্বর্য কেনইবা দিলেন? আর মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতেন তবে তাহারাই বা এমন দরিদ্র হালে জীবনযাপন করিতেছেন কেন? তাহাদের মতে, কাফেররাই সৎপথে রহিয়াছেন এবং মাআজাল্লাহ্! ইসলাম মিথ্যা। সারকথা, মুনাফিকরা এতদূর হয়রান ও পেরেশান থাকিবে যে, ইহারা কোন অবস্থাতেই সঠিক মীমাংসা খুঁজিয়া পাইবে না, পক্ষান্তরে মুসলমানগণ যখন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িতেন, তাহারা মুছিবতের সম্মুখীন হইতো তখন তাহারা ছবর এখতিয়ার করিতেন– ধৈর্য ধারণ করিতেন তখন তাহাদের মর্যাদা বাড়িয়া যাইত। আবার যখন তাহারা নিয়ামত প্রাপ্ত হইতেন তখন তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করিতেন। ফলে, তাহারা আল্লাহ্র মকবুল বান্দা বা প্রিয়পাত্র হইয়া যাইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, দুনিয়ার মুছিবত ও শান্তি উভয়ই মুসলমানের জন্যে আল্লাহ্র নিয়ামত বা অনুগ্রহ স্বরূপ।

উপকারিতা ঃ এই আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়দা বা উপকার লাভ হয়।

(১) ঈমানের বদৌলতে দ্বীলের শান্তি লাভ হয়। এবং কুফর দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি হয়। মুমিন বান্দা এমন একটি মজবুত বৃক্ষের ন্যায় যাহা খুবই শক্ত যে, উহা

ঝড়ের মুখেও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, মুমিনবান্দা কোন বিপদাপদে ঘাবড়ায় না। সুখ শান্তিতেও লম্ফ-ঝম্ফ করে না। কাফেরদের দৃষ্টান্ত কাঁচা শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় যাহা বাতাসে নষ্ট হয়। ইহারা বিপদাপদে ঘাবড়াইয়া যায় এবং সুখ-শান্তিতে অহংকারী হইয়া পড়ে।

(২) বস্তুতঃ বান্দাগণের উচিত এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতে অধিক মাল-দৌলত এবং আওলাদের উপর যেন গৌরব না আর ইহার দরুন যেন ধোকা না খায়। এই কারণে দুনিয়ায় বহুবার আজাব নাযিল হইয়াছে। কাফেরদের জন্যে ঐ জিনিস বেশী পরিমাণে হওয়া বেশী পরিমাণে আজাবের কারণই হইয়া থাকে। কাফেরদের দুনিয়ার সম্পদ বেশী হওয়া পরকালে বেশী অনিষ্টের কারণ। আর খাঁটি মুসলমানদের জন্যে এই সমস্ত সম্পদ বেশী হওয়া ছওয়াবের কারণ। অর্থাৎ, এই জন্যে দুনিয়ায় পরিমাণ মত মাল আর পরকালে পরিমাণ মত ছায়া পাওয়া যায়। অনেক বুজুর্গানে দ্বীন ইহকালে বেশী শান্তিলাভের কারণে পেরেশান ও বিচলিত হইতেন এই ভাবিয়া যে 'এহেন দুনিয়াভী শান্তি-সুখ তাহাদের নেকআমলের বিনিময় হইয়া যায় নাকি।'

(৩) দুনিয়ার শান্তি ও উন্নতির উপর নির্ভর করা যায় না কেননা উহা ভরসার যোগ্যও নহে। উহার দৃষ্টান্ত ঐ ঘুড়ির ন্যায়– যাহা এতদূর উচ্চে উঠে যে, দেখিতে অবাক লাগে। কিন্তু উহার সুতা ঘুড়িওয়ালার হাতে থাকে। যখন সুতায় টান দেওয়া হয় তখন ঘুড়ি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে, মানুষ দুনিয়ার উন্নতি সাধন করিতে করিতে দুনিয়ায় বাদশাহী লাভ করিতে পারে। কিন্তু একটানে পরাক্রমশালী শাহেন্‌শাহ্ বাদশাহ্ বালাখানা ছাড়িয়া কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়।

(৪) আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের প্রতি এমন দরদী ও দয়াবান যে, কেহ তাহাদিগকে কষ্ট দিলে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক তাহার পক্ষে প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

(৫) কেহ নিজস্ব ব্যাপারে কাহারও বদলা না লয় তখন আল্লাহ্‌পাক তাহার বদলা লইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজেই বদলা লইতে প্রস্তুত হয় তখন তাহার সে দরজা লাভ হয়না। অতএব, মুসলমানদের উচিৎ যে নিজস্ব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা স্থাপন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। আর ধর্মীয় ব্যাপারে কাহাকেও ক্ষমা না করা। কিন্তু আফ্‌ছুছের বিষয়! আমাদের নীতি ইহার বিপরীত ইহয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার নিজস্ব কোন ক্ষতি কাহারও দ্বারা ঘটিয়া যায় তখন সে ঐ ব্যক্তিকে পাকা দুষমন বলিয়া গণ্য করিয়া লয়। আবার কতক বদমজহাবী বদআকীদা দ্বারা দ্বীনের অজস্র ক্ষতি সাধিত করিতেছে; অথচ তাহাকে বহুলোক এমন রহিয়াছে যাহারা ভ্রাতা কিন্তু বন্ধুরূপেগণ্য করিয়া থাকে।

ছুফিয়ানা তাফছীর ঃ- তাছাওয়োফের অর্থাৎ তরিকতের শেষ দরজা ফানাফিল্লাহ্ যাহার মধ্যে পৌঁছিয়া বান্দা এতদূর ফানা বা আত্মবিলোপ সাধন

করিয়া দেয় যে, তাহার মধ্যে কেবল কালেব বা দেহই অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সমস্ত কার্যকলাপ তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সমাধা হইয়া থাকে। এমন ব্যক্তির সহিত যে বন্ধুত্ব করে সে যেন আল্লাহ্‌র সঙ্গেই বন্ধুত্ব করিল। তাহার সহিত ঝগড়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সঙ্গেই ঝগড়া। তাহার কথা-বার্তা, আদেশ-নিষেধ সবকিছুই আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কয়লা অগ্নিতে পৌঁছিয়া এতদূর ফানা হইয়া যায় যে, ইহার দেহও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।; কিন্তু ছুরত, নাম ও কাম সবই অগ্নির মতই হইয়া থাকে। যেহেতু, হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া ছাল্লামের ছাহাবায়ে কেরামগণ ফানাফিল্লাহ্‌র দরজায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইহেতু, তাহাদিগকে ধোকা দেওয়া কিংবা তাহাদিগকে উপহাস করা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই ধোকা দেওয়া বা উপহাস করারই নামান্তর। এইজন্য আল্লাহ্‌পাক মুনাফিকদের বদলা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ রশি যতই লম্বা বেশী হয়, ঝট্‌কা ততই বেশী লাগে। চাক্কী যত ধীরে ধীরে চলে আটা ততই বেশী মিহি হইয়া থাকে। এইজন্যে এই সময় অত্যন্ত ভয়াবহ। এইজন্যে প্রত্যেক দেওয়ানা বা মজ্জুব প্রকৃতির লোককে পাগল ভাবিয়া উপেক্ষা করিতে নাই, কেননা তাহাদের মধ্যে কতিপয় এমনও রহিয়াছেন যাহারা বহু ভেদ-তত্ত্ব অবগত রহিয়াছেন।

১নং প্রশ্ন ঃ- কোরআনে পাক আল্লাহ্‌পাককে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। কেননা, কোরআন দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক ধোকা দেন।

উত্তর ঃ নাউজু বিল্লাহ! ইহা কোন প্রশ্নই নহে। কোর্‌আনে কারীমের একই শব্দ একজায়গায় এক অর্থ আর অন্য জায়গায় অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বান্দার বেলায় এক অর্থ আর স্রষ্টার বেলায় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বান্দার বেলায় যাহা ধোকা আল্লাহ্‌র বেলায় তাহা শাস্তি প্রদান। আল্লাহ্‌পাকের ধোকা দেওয়া উপহাস করা মানে ধোকাবাজদিগকে শাস্তি প্রদান করা। এক ছটাক পরিমাণ এলেম হইলে বুঝিবার জন্যে একমণ আক্কেলের (বুদ্ধির) প্রয়োজন হয়।

১৬ নং আয়াত ঃ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ . وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ .

অর্থ ঃ ঐ সমস্ত লোক যাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করিয়া লইয়াছে। অতঃপর তাহাদের এই ব্যবসায় তাহাদিগকে লাভবান করিল না এবং তাহারা পথের সন্ধানও পাইল না।

সম্পর্ক ঃ ইতিঃপূর্বে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টুমি বয়ান করা হইয়াছে। এবং তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই সমস্ত অজ্ঞলোক সকল নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে জ্ঞান মনে করিত। এক্ষণে, উহাকে একটি উত্তম উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইতেছে। যাহা দ্বারা তাহাদের অবস্থা সকলেই উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়। অথবা পূর্বের আয়াতসমূহের মুনাফিকদের কতক দোষ বয়ান করা হইয়াছে।

এক্ষণে, এই জায়গায় তাহাদের দোষসমূহের ফলাফল বয়ান করা হইয়াছে। যেমন– কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসার ভুলকে বয়ান করিয়া অবশেষে বলে যে, ইহার পরিণাম খারাপ হইয়াছে এবং তাহার আসল পুঁজিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শানে নযুল ঃ এই আয়াত হয়ত ঐলোকের বিষয়ে নাযিল হইয়াছে যাহারা খাঁটি মুমিন হওয়ার পর কাফের হইয়াছে। অথবা ঐ ইহুদীর বিষয়ে নাযিল হইয়াছে যে, পূর্ব হইতেই শেষ জমানার নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর ঈমান রাখিত। কিন্তু যখন হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তশরীফ আনয়ন করিলেন তখন তাহাকে অস্বীকার পূর্বক কতক লোক মোজাহের কাফের হইয়াছে আর কতক মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। অথবা ঐ সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ্পাক 'আক্বেলে ছালিম' দিয়াছিলেন। এবং তাহাদের সামনে দলিল প্রমাণাদি কায়েম করতঃ হেদায়াতের সরল পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা আক্বল ও ইন্ছাফের দ্বারা কাজ করে নাই, বরং জিদ ও হিংসার বশবর্তী হইয়া কাফের হইয়া গিয়াছে (তাফছীর খাযায়েনুল এরফান)

তাফছীর ঃ اولئك উলায়েকা ইছমে ইশারা। কেননা, মুনাফিকদের গুণ এইভাবে বয়ান করা হইয়াছে যে, তাহারা অন্যান্য লোকজন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আর প্রত্যেকের নিকটে তাহাদের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। যে জিনিস খেয়ালে মওজুদ থাকে সেইদিকেও ইহার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়। এইজন্যে এই জায়গায় তাহাদের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু, মুসলমানদের চাইতে ইহারা সম্মানে বহুদূরে ছিল এইহেতু এই ইশারা বাঈদ বা দূরবর্তীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। اشتروا

'ইশ্তারাউ' ইশতারাউন হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ খরিদ করা অর্থাৎ মূল্য দ্বারা আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করা। কিন্তু এই জায়গায়, এই অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, নিজের জিনিসের বিনিময়ে অন্যের জিনিস গ্রহণ করা এবং

اشتراء ইশতারাউন এক জিনিসের খাহেশ নাই, এবং অন্য জিনিসের লোভ করাকে বলা হয়। কেননা, সত্য রাস্তায় চলা এবং ঈমান গ্রহণ প্রত্যেক মুসলমানদের আসল ফরজ। আবার যখন কাফের ও মুনাফিক শয়তানের নিকট গোমরাহী শিখিয়া ঐ ফরজকে নষ্ট করিয়াছে। আর ঐ লোকদের হেদায়াত ছাড়িয়া দেওয়া এবং গোমরাহী খরিদ করার বিষয়টি বয়ান করা হইয়াছে। الضللة

'আদ্দালালাতু' এই শব্দের কয়েকটি অর্থ জুলুম করা, মধ্যম অবস্থা হইতে সড়িয়া কম-বেশীর মধ্যে পড়িয়া যাওয়া, হেদায়াতের সরল পথ হারাইয়া ফেলা ইত্যাদি। এই জায়গায় ধর্ম ছাড়িয়া বেদ্বীনি গ্রহণ করা বুঝায়। যাহার অর্থ– গোম্‌রাহী। কিন্তু ضللة দালালাত শব্দটি যে স্থানে নবীগণের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে উহা হয়রান-পেরেশান বা আত্মহারা ইত্যাদি অর্থে। সুতরাং যে ব্যক্তি

দালালাত শব্দ হইতে ধোকা খাইয়া নবীগণকে পথহারা, গোমরাহ্ ইত্যাদি ধারণা করে সে পাক্কা বেদ্বীন ও বদ্‌বখ্‌ত। এই মাছআলার বিশদ ব্যাখ্যা জানিতে হইলে আমার রচিত 'আছমতে আম্বিয়া ঈমান ভাণ্ডার বিংশ খণ্ড পাঠ করুন।

بالهدى বিলহুদা– আরবী ভাষায় লেন-দেনের ব্যাপারে 'বা' ঐ জিনিসের সহিত প্রয়োগ হয় যাহা ছাড়িয়া দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য। তখন আয়াতের অর্থ হইবে– তাহারা (মুনাফিকরা) হেদায়াতকে ছাড়িয়া দিয়া গোমারাহী গ্রহণ করিয়াছে। হেদায়াতের তাৎপর্য ও উহার প্রকারভেদ ছুরায়ে ফাতেহার তাফ্‌ছীরে বিস্তরিত বর্ণিত হইয়াছে।

فماربحت . ফামারাবিহাত রাবহুন হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– লাভ। ব্যবসার ক্ষেত্রের আসল পুঁজি ব্যতীত যাহা পাওয়া যায় উহাই লাভ বা মুনাফা যাহাকে রিবহ্ বলা হয়। تِجَارَة তেজারাতুন অর্থ– ব্যবসা যাহা বেচা-কেনার কারবার বলিয়া কথিত হয়। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি এ কারবারের সহিত জড়িত হয় কিংবা এ কারবার সম্পন্ন করে থাকে বলা হয় তাজের বা ব্যবসাদার কিংবা ব্যাপারী। যে ব্যক্তি কোন সময় কোন জিনিস বিক্রি করে উহাকে বায় বলা হয় তাজের নহে। وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدُوْنَ অমা কানু মুহ্তাদীন ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। (১) পূর্ব হইতেই ঐ ব্যবসা সম্পর্কে না-ওয়াকেফ বা অবগতি ছিল না। এইহেতু লাভতো হয় নাই বটে, আসল পুঁজিও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। (২) ঐ ব্যবসাতে হেদায়াত বা সুপথের সন্ধান লাভের যোগ্যতা ছিলনা। অর্থাৎ, অন্যান্য ব্যবসায় তো বড়ই সতর্কতার সহিত কাজ করা হয়। কিন্তু এই ব্যবসাতে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা এতই বোকা যে কোথায় মুনাফা অর্জন করিবে নিজের পুজি মূলধন পর্যন্ত খোয়াইয়া বসিয়াছে।

খোলাসা তাফছীর ঃ- সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক দেওয়া হয়। আবার ভাল-মন্দ দুইটি রাস্তাও তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেওয়া হয়। মানুষ যেন নিজ জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভাল ও সঠিক রাস্তাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং খারাপ ও ভ্রান্ত পথ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ঐ মুনাফিকদল নিজেদের মধ্যে চরিত্রের খারাপ গুণগুলি জাগ্রত করতঃ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জ্ঞানের প্রদীপকে নির্বাপিত করিয়া দেয়। এবং চিরকালের জন্যে বিপদাপদকে খরিদ করিয়া লয়। ইহারা কলেমায়ে তৌহিদ– এর মূল্য ইহাই বুঝিল যে, ইহার দ্বারা দুনিয়ার ভাল অর্জন করিয়া নিল। অথচ আখেরাতের নিয়ামতের তুলনায় এই লাভের কোনই মূল্য নাই। ঐ অজ্ঞ মুনাফিক সম্প্রদায় নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কালেমায়ে তৌহিদকে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছে। আবার তাহাতে খুশীও হইয়াছে। ইহার উদাহরণ এই যে, কোন বেকুফ লোক মতির দ্বারা মাটির খেলনা খরিদ করিয়া লয় অথবা খাঁটি স্বর্ণের

পরিবর্তে বিলাতী নকল স্বর্ণ গ্রহণ করে মনে মনে বড় আনন্দিত হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সমস্ত লোকজন বহুৎ লোকসান দিয়া থাকে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে বস্তুতঃ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকজন আক্বল, মাল, জান ও আওলাদ খরচ করিয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া সত্যিকার ঈমান গ্রহণ করে। আর সেই জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী অস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে চিরস্থায়ী ও চিরসুখময় আখেরাত গ্রহণ করে।

ফায়দা ঃ- এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বাইয়ে তাআতী জায়েজ অর্থাৎ মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত কেবল লেন-দেনের মধ্যে দ্রব্যাদি খরিদ করা। কেননা, মুনাফিকরা কখনও মুখে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করে নাই। কেবল হেদায়াতকে ছাড়িয়া গোমরাহী করিয়াছিল মাত্র। ইহাকে কোরাআনে কারীমে খরিদ বলা হইয়াছে। অতএব, জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি মূল্য দিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করে এবং বিক্রয়কারী ইহাতে সম্মত থাকে তবে বায় বা ক্রয়-বিক্রয় হইয়া যাইবে, এবং ইহা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার খুব বড় বড় লাভ ও উন্নতি ছাড়িয়া দিয়া ধর্মীয় সামান্য লাভ অর্জন করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিই বড় ও উন্নত ব্যবসায়ী। আর ইহার বিপরীত উপায়ে লাভবান হইতে যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত্য হইবে সে নিরেট বোকা। কেননা, সমস্ত লাভ ও সমৃদ্ধি পরকালের সামান্য লাভ ও সমৃদ্ধির তুলনায় কিছুই নহে। ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, কোন ব্যক্তি কোন ধর্মীয় কাজ রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে পালন করিয়া থাকে তবে সে নিতান্তই বোকা। কেননা, সেও মুনাফিকদের মত যারা কেবল মুসলমানদিগকে রাজী কারার মানসেই কলেমা পাঠ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, ধর্মীয় কাজের মূল্য আল্লাহ ও রাছুলের সন্তুষ্টি। ইহাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নফল বন্দেগী করে এবং ফরজ ওয়াজিবের মধ্যে আলস্য করে সে ব্যক্তি বেকুফ। কতিপয় বেশী পরিমাণে ওজিফা পাঠ করে কিন্তু ফরজ নামাজ, যাকাত এবং রোজার মধ্যে ত্রুটি করে, পাবন্দি করে না সেও নিতান্ত আহ্‌মক এবং ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। মনে রাখিবেন ফরজ নামাজ আসল পুঁজি আর সকল উহার লাভ স্বরূপ। আসল পুঁজি বা মূলধন নষ্ট করিয়া সামান্য লাভের পিছনে ছুটিয়া যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? (তফছীরে রুহুল বয়ান শরীফ)। ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, দুর্বলচিত্তে অপারগতার সহিত নেক কাজ করিলে উহাতে কোন ছওয়াব নাই। ঐ কাজেই কেবল ছওয়াব রহিয়াছে যাহা দ্বীলের টানে ও সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করা হয়। কেননা, মুনাফিকরা কেবল অপারগ অবস্থায় কলেমা ও নামাজ পড়িত। এইহেতু তাহাদের উহাতে কোনও ফায়দা লাভ হয় নাই। দ্বীলের আকর্ষণ বা মনের উৎসাহ্ এবাদতের প্রাণ স্বরূপ। মজবুরী বশতঃ কিংবা বাধ্য হইয়া তো চন্দ্র-সূর্য ও আপন কক্ষপথে ঘুরিতেছে। কিন্তু এই কাজের মধ্যে কোন ফায়দা নাই।

ছুফীয়ানা তাফছীর ঃ- মানুষের জন্যে দুই প্রকারের হেদায়াত প্রয়োজন (১) ফিত্‌রী হেদায়াত অর্থাৎ স্বভাবগত হেদায়াত যাহা আলমে আরওয়াহের বা

রূহের জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত। যাহার উপর প্রত্যেক নবজাত শিশুর জন্মলাভ হয়। (২) কাছবী হেদায়াত অর্থাৎ চেষ্টা বা সাধনালব্ধ হেদায়াত যাহা আল্লাহ্ ওয়ালাগণের সংশ্রবের ফলে হাছেল হয়। যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকার হেদায়াত প্রাপ্ত হয় সে বড়ই সৌভাগ্যবান সে নূরুন আলা নূর। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় হেদায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে তাহার প্রথম হেদায়াত নিষ্ফল ও অর্থহীন হইয়া যাইবে। যেমন– সূর্য এবং চক্ষুর নূর (জ্যোতিঃ) উভয়ে মিলিয়া ফায়দা লাভের উপযোগী হয়। যদি সূর্যই আলো দিতে থাকে আর চোখে কোন আলো না থাকে তবে মানুষ কিছুই দেখিতে পাইত না। পক্ষান্তরে, যদি চোখে আলো থাকে এবং সূর্যের আলো না থাকে তবে, মানুষ অন্ধকারে দেখা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। ঐ মুনাফিকদের প্রথম নূর অর্থাৎ হেদায়াত ফিতরা বা স্বাভাব ধর্মী হেদায়াত হাছেল ছিল; কিন্তু নূরে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইতে পৃথক রহিয়াছে। আর ঐ স্বভাবগত হেদায়াতকে ছাড়িয়া গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হইয়াছে। আর ঐ ব্যবসায় তাহারা সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

একটি হেকায়াত ঃ- মছনবী শরীফে এই বিষয়ে বড়ই সুন্দর একটি হেকায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, এক শিকারী তাহার তিরকাশ বা তীরদান পূর্ণ করতঃ তীর ধনুসহ শিকারে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক বাজপাখী বাতাসে তখন উড়ন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল যাহার ছায়া মাটিতে পড়িয়াছে। শিকারী তখন ঐ বাজপাখীর ছায়া লক্ষ্য করিয়া পর পর উহাতে তীর ছুড়িতে শুরু করিল। অবশেষে, তাহার তিরকাশ খালি হইয়া সমস্ত তীরই চলিয়া গেল। কিন্তু বাজপাখি শিকারীর হস্তগত হইল না। অতঃপর শিকারী যখন ফিরিয়া আসে তখন সে তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বলিতে লাগিল যে, "আমি ঠিক ঠিকই নিশানার উপর তীর মারিয়াছি; অথচ বাজপাখি মরিল না ইহার কি কারণ কিছুই বুঝিতে পরিলাম না।" তাহারা বলিল, "ওহে বোকা! তুমি যাহা নিশানা বানাইয়াছ উহাতো বাজপাখি ছিল না, উহা ছিল ঐ পাখির ছায়া মাত্র। আসল বাজপাখি ছিল উপরে আকাশে যেথায় তোমার দৃষ্টি যায় নাই।" তদ্রূপ, মুনাফিক সম্প্রদায় তাহাদের অন্তঃকরণের তীরকাশ হইতে সমস্ত তীর দুনিয়ার জন্যে ব্যয় করিয়াছে। এইহেতু, ধর্ম তাহাদের হাতে আসে নাই। মূল্যবান তীরও বরবাদ করিয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ- যখন ঐ মুনাফিকদের নিকট হেদায়াতই ছিল না, তখন তাহারা বিনিময়ে গোমরাহী কিরূপে খরিদ করিল?

উত্তর ঃ ইহার উত্তর আলেমানা এবং ছুফিয়ানা তাফছীরের দ্বারাই প্রদান করা হইয়াছে। উহা এই যে, তাহারা ফিত্‌রী বা স্বভাবগত হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করিয়াছে। অথবা হেদায়াত হাছিল করিবার সময় পায় নাই। কিন্তু উহাকে ছাড়িয়া গোমরাহীকে হাছিল করিয়াছে। অথবা তাহারা কালেমায়ে তাইয়্যেবা মুখে মুখে পাঠ করিয়াছে; নামাজ-রোজা আদায় করিয়াছে। যদি

তাহারা ইচ্ছা করিত তবে ঐ আমলসমূহের দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা দুনিয়া অর্জন করিয়াছে। কাজেই, ক্রয় বিক্রয়ের অর্থ তাহাদের উপর ঠিকই রহিল।

১৭নং আয়াত ঃ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَاراً ج فَلَمَّا
اَضَاءَتْ مَا حَوْلَه ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ ۰

অর্থ ঃ তাহাদের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির মত যেই ব্যক্তি কোথায়ও আগুন জ্বালাইল। অতঃপর উহা যখন চারিপার্শ্বের সবকিছু আলোকিত করিল, এমন সময় আল্লাহ্‌পাক সেই আলো নির্বাপিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে এমন অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন যেন ইহারা কিছুই দেখিতে না পায়।

সম্পর্ক ঃ ইতিঃপূর্বে মুনাফিকদের দোষের বয়ান করা হইয়াছে। এক্ষণে, উহা অধিকতর প্রকাশের জন্যে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। কেননা, উদাহরণ দ্বারা অনেক জটিল বিষয়ও সহজবোধ্য হইয়া যায়। মিছাল বা উদাহরণ দুই প্রকারঃ– (১) মুফরাদ বা একক বস্তু একক বস্তুর সহিত। যথা– জায়েদকে বাঘের সহিত তুলনা দেওয়া। (২) একটি কাহিনী অপর একটি কাহিনীর সহিত প্রকারগত তুলনা দেওয়া। দ্বিতীয় প্রকারকে মিছাল বলা হয়।

তাফছীর ঃ مثلهم মাছালুহুম- মিছালের আভিধানিক অর্থ হইল– মত বা সদৃশ কিন্তু পারিভাষিক অর্থে বুঝায় এমন মশহুর কথা যাহা কোন আশ্চর্যজনক বস্তু বা বিষয়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কখনও বিপদে পতিত হয় নাই। সে কিরূপে বিপদগ্রস্ত লোকের দুঃখ বুঝিবে? এইস্থানে মিছালের এই অর্থই বুঝায়। কেননা, দলীলের দ্বারা কেবল জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারেন। কিন্তু মিছাল বা উদাহারণ দ্বারা কোন বোকা বা অজ্ঞ লোকরাও সহজে বুঝিতে পারে। এইহেতু কোরআনুল কারীমে হাদীছ শরীফে অগণিত মিছাল বা উদাহরণ বর্ণনা রহিয়াছে। তৌরিত ও ইঞ্জিল কিতাবে তো মিছালের পূর্ণ ছুরাই ছিল যাহার নাম– ছুরাতুল্‌ আম্‌ছাল। كمثل কামাছালে– ইহাতে কাফ জায়েদাহ্‌ কেননা, কাফ-এর অর্থও মিছাল। যখন মিছালের উপর আসিয়াছে তাহার অর্থ কিছুই না। যেমন– এই জায়গায় মিছালের অর্থ অবস্থা এবং কাফ তাহার নিজের অর্থে বহাল থাকে, অতএব, আয়াতে কারীমার ভাবার্থ এই হইল যে, মুনাফিকদের আজব অবস্থা ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থার মত الذى 'আল্লাজি' এই শব্দটি দৃশ্যতঃ একবচন কিন্তু মর্মানুসারে বহুবচন। ইহার পূর্বে مثلهم মাছালুহুম এবং পরেও بنورهم বিনুরিহিম বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ জমাতের দিকে যেমন কোরআনে কারীমে আসিয়াছে و خضتم كا الذى শেষ পর্যন্ত।

التوقد ইছ্তাওক্বাদা ওয়াকুদুন হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ অগ্নি জ্বালান। এবং অগ্নি হইতে আলোক রশ্মি বাহির করা। লাকড়ীকেও এইজন্যে وقود ওয়কুদুন বলে। যার ফলে ইহা হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং আয়াতের মর্মানুযায়ী ইহারা খুব তেজদার অগ্নি জ্বলিয়াছিল এবং উহাকে প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। نارا নারান শব্দ নূর হইতে আসিয়াছে। যাহার অর্থ ধড়ফড় করা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করা। কেননা, অগ্নির মধ্যেও চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার প্রকাশ হইয়া থাকে। এইহেতু, উহাকে 'নার' বলা হয়। আবার যেহেতু, অগ্নিতে আলোকরশ্মিও রহিয়াছে এইহেতু এই আলোকে 'নূর' বলা হয়। আবার মিনারাকেও এইজন্যে মিনারা বলা হয় যে, উহাতে আযান দেওয়া হয় এবং ইহাকে দূর হইতে দেখিয়া লোকজন জায়গার পরিচয় পাওয়া যায়। মোটকথা, নূর দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- (১) চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং (২) রোশ্নী, আলোক রশ্মি বা জ্যোতিঃ।

فلما اضاءت ফালাম্মা আদাআত্- আদাআত্ ضوء দুউন হইতে আসিয়াছে। যাহার অর্থ- তেজদার আলো। নূর এবং দুউন-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নূর হাল্কা রোশ্নীকেও বলা হয়; কিন্তু দুউন তেজদার আলোক বা তীব্র আলোক রশ্মীকে বলে। এইজন্যে কোরআনে কারীমে সূর্যকে দিয়ায়ে এবং চন্দ্রকে নূর বলা হইয়াছে। অনুরূপভাবে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে এবং কোরআনে কারীমকেও এইহেতু নূর বলা হইয়াছে। যার ফলে, ইহাতে সকলেই ফায়েজ গ্রহণ করিতে পারে। আর এই নূরের ফায়েজ সূর্যরশ্মির ন্যায় জালালী বা তীব্র নহে, যাহা চক্ষুকে ঝল্সিয়া দেয়। ما حَوله মাহাওলাহু হাওলের অর্থ- ঘূর্ণন বা আবর্তন। এইজন্যে বর্ষকেও হাওল বলা হয়। কেননা ইহার আবর্তনের ফলে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ذهبَ الله আরবী ভাষায় ذهبَ به এবং একই অর্থবোধক। অর্থাৎ, নিয়া গিয়াছে।

بنورهم বিনুরিহিম এর অর্থ আলোক যাহা নিজেই প্রকাশিত হয় এবং অন্যকেও প্রকাশ করে। ইহার বিপরীত জুলমাত বা অন্ধকার وتركهم ওয়াতারাকাহুম এইজন্যে বলা হইয়াছে যেন, একথা জানা থাকে যে, তাহাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে একেবারে সম্পূর্ণই নির্বাপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহার ফলে মুনাফিকরা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আছে। فى ظلمت ফিজুলুমাতিন–জুলুমাতুনের বহু বচন। ইহার আভিধানিক অর্থ– কম হওয়া। বরফকে এইজন্যেই জুলুম বলা হয় যে, উহা খুব তাড়াতাড়ি কমিয়া যায়। অত্যাচারকে এই জন্যেই জুলুম বলা হয় যে, উহার কারণে জালেমের নেক আমলসমূহ বরবাদ হইতে হইতে একদম কমিয়া যায়। মুনাফিকদের জন্যে শুধু একটিমাত্র অন্ধকার ছিল না; বহু প্রকারের অন্ধকার তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। যথা– (১) কুফুরীর অন্ধকার, (২)

মক্কর ও ফেরববাজির অন্ধকার, (৩) মিথ্যাচারের অন্ধকার, (৪) মুসলমানদিগকে উপহাসজনিত অন্ধকার, (৫) অজ্ঞতার অন্ধকার এবং (৬) গোনাহ্ ও শাহ্ওয়াত তথা নফ্ছের পাইরুবীজনিত অন্ধকার, ইত্যাদি ইত্যাদি। لا يُبْصِرُوْنَ লা-ইব্ছিরুনের মধ্যে অন্ধকারেরই বয়ান রহিয়াছে। অর্থাৎ, মুনাফিকদিগকে অন্ধকারের মধ্যে এইরূপভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা এই বিষয়ে চিন্তা করেনা কিংবা উপলব্ধিও করে না।

খোলাছা তাফছীরঃ মদিনা শরীফের লোকজন প্রথমতঃ হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার আগমনে খুশী হইয়াছিল এবং বহুলোক কালেমা পাঠ করতঃ মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাহাদের মধ্যে হইতে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার স্বার্থ ও প্রলোভনে পড়িয়া মুনাফিকি আরম্ভ করিল। কাজেই, তাহাদের এই আবস্থাকে এমন একটি দলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে যাহারা ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত গভীর জঙ্গলে পতিত হইয়াছে। অতঃপর, তাহারা আলো ও তাপ পাইবার বন্য জন্তু হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে তথায় আগুন জ্বালিল; যখন অগ্নি খুবই প্রজ্জ্বলিত হইল তাহারা তাপ ও আলো পাইয়া খুবই আশ্বস্ত হইল এবং ভাবিল যে, এ অগ্নি কখনও নির্বাপিত হইবে না, আর আমরাও ইহার ফায়দা হইতে বঞ্চিত হইব না। তাহারা যখন এই ধারণায় ছিল তখন সে অগ্নি হঠাৎ নিভিয়া গেল এবং উহাতে কিছুমাত্র অগ্নিশিখা কিংবা উহার লেসমাত্র- ও অবশিষ্ট রহিল না; যাহা দ্বারা পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা যাইতে পারে। আল্লাহ্পাক মুসলমানদিগকে কালেমায়ে তাইয়্যেবার উপর জিন্দেগী, মৃত্যু, এবং কবর হাশর পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রাখুন।

১৮ নং আয়াত- صم بكم عمىٌ فُهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ ·

অর্থঃ- তাহারা শ্রবণশক্তিহীন, বোবা এবং অন্ধ। সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিবে না।

সম্পর্ক ঃ পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুনাফিকরা ঐ সমস্ত লোকের মত যাহারা বিশেষ উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে অথচ তাহাদের অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া যায়। এক্ষণে, বয়ান করা হইতেছে যে, দুনিয়ার অগ্নি নিভিয়া গেলে আলোকের অভাবে শুধু চক্ষুই অচল হইয়া যায়, কান বা শ্রবণশক্তি কিংবা জবানের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু মুনাফিকদের অগ্নি এমনভাবে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার পরিণামে তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও অন্তঃকরণ সবই বেকার ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।

তাফছীর ঃ صم ছুম্মুন صمم ছামামুন হইতে নিষ্পন্ন। যাহার অর্থ– কানের বোঝা, এবং ইহা দুই প্রকারঃ– (১) যাহা হইতে মানুষের শ্রবণশক্তিও যাইতে থাকে। (২) যাহার দ্বারা উচ্চ শ্রবণও হইতে থাকে।

بكم বুকমুন এক প্রকার জবান বা রসনার ব্যাধি যাহার ফলে শব্দ উচ্চারিত হয় না। ইহাও দুই প্রকারঃ- (১) শব্দ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যাহাকে তোত্‌লামী বলা হয়। আরবীতে উহাকে 'উক্‌দায়ে লেছান' বলা হয়। (২) যাহার ফলে শব্দ উচ্চারণ একেবারেই অসম্ভব। এমন লোককে বলা হয় বোবা। এইস্থানে এই দ্বিতীয় অর্থই বুঝায়। عمى উময়ুন এক প্রকার চক্ষুর ব্যাধি যাহার ফলে দৃষ্টিশক্তি একদম চলিয়া যাইতে থাকে। যাহাকে অন্ধতা বলা হয়। ইহা দুই প্রকার (১) জন্মগত অন্ধ যাহাকে আরবীতে كمه কুম্‌হ বলে। (২) যাহার প্রথমতঃ চক্ষু ছিল, পরে অন্ধ হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থই এখানে বুঝাইতেছে। ইহার আবার দুইটি স্বরূপ। যথা- (১) যাহার মাথায় চক্ষু নাই; আরবীতে যাহাকে طمس তামছুন বলা হয়। (২) যাহার মাথায় চক্ষু আছে বটে, কিন্তু উহাতে আলোক বা দৃষ্টিশক্তি নাই। এখানে শেষোক্ত অর্থই বুঝায়। জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, ঐ বিমার বা ব্যাধি চার প্রকার-

عمى - كمه - طمس - عمى

উময়ুন, তামছুন, কামহুন, ও আমহুন। যাহার অর্থ দ্বীল বা অন্তঃকরণের দিক হইতে অন্ধ হওয়া। يعمهون ইয়ামাহুন ইহা হইতেই আসিয়াছে। এই জায়গায় عمى উময়ুন এর দ্বারা বুঝায় দ্বীল ও চক্ষু উভয় হইতেই অন্ধ। অর্থাৎ, মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিবার তিনটি পন্থা থাকিতে পারে। যথা- (১) তাহার নজর ঠিক থাকিবে। যাহা দ্বারা সে রাস্তা দেখিতে পারে। (২) তাহার বাক-শক্তি ঠিক থাকে যেন সে কাহাকেও আহ্বান করতঃ তাহার সাহায্য লইয়া সঠিক রাস্তায় চলিতে সক্ষম হয়। (৩) তাহার শ্রবণশক্তি ঠিক থাকে যার ফলে সে পথ প্রদর্শকের নির্দেশ শ্রবণপূর্বক সঠিক পথে অগ্রসর হইতে পারে। যখন মুনাফিক সম্প্রদায় এহেন তিনটি শক্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন তাহাদের কুফুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই।

খোলাছা তাফছীর ঃ আয়াতে কারীমার সারমর্ম এই যে, মুসলমানগণ এ আশা পোষণ করিতেন যে, হয়ত বা মুনাফিকরা এক সময় হেদায়াতের পথে ফিরিয়াও আসিতে পারে। এই কারণে মুসলমানগণ বিভিন্ন সময়ে তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে আনিতে চেষ্টাও করিতেন। আবার ইহাতে অসমর্থ হইয়া তাহারা মনে মনে দুঃখিতও হইত। আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদিগের এ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণার্থে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন হে মুসলিমবৃন্দ! ইহাদের ঈমান না আনিবার কারণ এই যে, ইহারা শ্রবণশক্তিহীন বধির, বাকশক্তিহীন বোবা এবং দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধ। সুতরাং তোমরা ইহাদের ঈমান না আনায় দুঃখিত কিংবা ঈমান আনার ব্যাপারে আশা পোষণ মোটেও করিতে পার না। তাহারা তাহার এবংবিধ দুর্নীতি কখনও বর্জন করিবে না। কেননা, নিরাশাও এক ধরনের শাস্তি স্বরূপ।

এ আয়াতে কারীমায় কয়েক প্রকারের ফায়দা পাওয়া যায়। যথা–

(১) আল্লাহ্পাকের নিকট বান্দার ঐ অঙ্গ কাজের বলিয়া প্রমাণিত হয় যাহা উহার উদ্দেশ্যকে পূরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহাতে ঐ গুণ বিদ্যমান থাকে না উহা বেকার বা নিরর্থক। যথা– মুখ দিয়াছেন সত্য কথা বলার জন্যে, কোন সত্য কথা শ্রবণ করার জন্যে, এবং চক্ষু সত্য ও সঠিক বস্তু দেখিবার জন্যে দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়ার কাজ যাহাই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা করা যায় সবই ইহাদের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি তখন উহাদের স্বজনের উদ্দেশ্য মোতাবেক আসল কাজ করিতে ব্যর্থ হয় তখনই উহাদিগকে বেকার বা নিরর্থক বলিয়া দেওয়া হয়। আওলিয়া ও শহীদগণ যদিও জাহেরী অবস্থায় পরলোক গমণ করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআনে কারীমের ঘোষণা অনুযায়ী তাহারা জীবিত। কেননা, তাহাদের নিজেদের জিন্দেগীর মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেমন– সরকার উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সরকারের কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আর তাহাদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা যথাক্রমে উচ্চহারে বেতন-ভাতা, উত্তম বাসস্থান এবং উন্নত ধরনের যানবাহন ইত্যাদির সুব্যবস্থা সরকারের পক্ষ হইতেই নির্ধারিত থাকে। আসল উদ্দেশ্য হইল চাকুরী– সরকারের কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদন। কিন্তু যে ব্যক্তি চাকুরীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে বরং সরকার প্রদত্ত আরাম আয়েশের উপকরণের মধ্যে নিমগ্ন থাকে সে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হয় উপরন্তু বেতন-ভাতা হইতে বঞ্চিত হইয়া চাকুরীও হারাইয়া থাকে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে তাঁহার দায়িত্ব পালন করে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া গেলেও সে অবসর ভাতা পাইতে থাকে। মুনাফিক ও কাফেরদের দশা তথাকথিত কর্মচারীদের ন্যায়। ওফাতপ্রাপ্ত আওলিয়ায়ে কেরামগণের দৃষ্টান্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাগণের ন্যায়।

(২) যাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হয় তাহারা আল্লাহ্র দরবারে যথেষ্ট ইজ্জৎ সম্মান পাইয়া থাকে। ইহকালে জিন্দেগীর অবসান হইলে অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় তাহাদিগকে আহ্বান করা হয়– "হে অবিরাম শান্তিলাভকারী পবিত্র আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে ফিরিয়া আস। তুমিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।" অতএব, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেনা তাহার অন্তিম পরিণতি ভাল নহে। তাহাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়– অর্থাৎ, এবং আমি তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ নিম্নগামী করিয়া অন্ধ, বোবা ও বধির রূপে উঠাইব।

ছুফীয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন– তিনটি জিনিস মানুষের অন্তর চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়। যথা– (১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়সমূহকে পাপকাজে লিপ্ত রাখা, (২) রিয়ার সহিত এবাদত করা অর্থাৎ লোক-দেখানো বন্দেগী করা, এবং (৩) খালেক বা স্রষ্টাকে ছাড়িয়া মখলুক বা সৃষ্টির উপর ভরসা করা। ইহা জঘন্য ও

মারাত্মক ব্যাধি, প্রথমতঃ খুবই হাল্কা কিংবা কিছুই মনে হয় না; কিন্তু অবশেষে ইহা উভয়কালের জন্যেই খুবই ভয়ানক ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, পরিণামে জাহান্নামের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। আল্লাহ্‌পাক হেদায়াত নছীব করুন।

১৯ নং আয়াত- يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ.

অর্থঃ- অথবা (তাহাদের দৃষ্টান্ত) আকাশের সেই বৃষ্টির মত যাহাতে ঘন অন্ধকার, গুরু-গর্জন (বজ্রধ্বনি) ও বিদ্যুৎ চমক রহিয়াছে। ঘন ঘন বজ্র-ধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে তাহারা নিজ নিজ কানে আঙ্গুল দিতেছে। এইরূপে আল্লাহ্‌তায়ালা কাফেরদিগকে অবশ্য ঘিরিয়া রাখিয়াছেন।

সম্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে এক কথার আলোচনা ছিল; এক্ষণে, অন্যকথার বয়ান হইতেছে। উভয় আলোচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত বর্ণনায় তাহাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আলো পাওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আর এই জায়গায় বিজলী হইতে আলো পাওয়ার কথা বর্ণিত হইতেছে। ঐ স্থানে সাধারণ ভয়-ভীতির উল্লেখ ছিল আর এইস্থানে মারাত্মক ভয় ও পেরেশানির কথা বর্ণিত হইতেছে। এইহেতু, এইকথা প্রথমোক্ত আলোচনার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোটকথা আসল জিনিস আলোচনার গুরুত্বানুসারে সকলেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

শানে নযুল ঃ- একবার মুনাফিকদের মধ্যে দুই ব্যক্তি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যাইবার সময় রাস্তায় প্রবল বৃষ্টি আসিল– যাহার বিবরণ এই আয়াতে কারীমায় রহিয়াছে। উহাতে ভয়ানক বজ্র-ধ্বনি ও বিজলী চমকিতে ছিল। আর ইহাদের দশা এইরূপ হইল যে, যখন গর্জন হইত তখন তাহারা নিজ কানে আঙ্গুল গুঁজিয়া দিত এই ভয়ে যে, না জানি তাহাদের কানের পর্দা ফাঁটিয়া যায়। আবার যখন বিজলী চমকাইত তখন তাহারা সম্মুখের দিকে চলিতে থাকিত; যখন অন্ধকার নামিত তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইত। এবং পরস্পরের মধ্যে বলা বলি করিত "হয়ত বা গোনাহের কারণে আমাদের মাঝে এই ভয়াবহ মুছিবত আসিয়াছে।" "আল্লাহ্‌পাক মঙ্গলের সহিত রাত্রির অবসান ঘটাইয়া প্রাতঃকাল দান করিলে আমরা হুজুরের দরবারে গিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইব; তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিব।" আল্লাহ্‌পাক অতঃপর তাহাদের প্রতি সদয় হইলেন, তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেন। তাহারাও প্রতিজ্ঞানুযায়ী কাজ করিল– পরদিন হুজুরে পাকের দরবারে গিয়া সত্যিকার মুসলমান হইয়া গেল। এবং ইসলামের উপর তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ্‌পাক তাহাদের এই ঘটনাকে অন্যান্য মুনাফিকদের জন্যে উদাহরণ সাব্যস্থ করিলেন। আর এই

ঘটনা তাহাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ হইয়া রহিল (তাফছীরে খাজায়েনুল এরফান)।

কতিপয় মুনাফিক তাহাদের নেফাক বা কপটতার মধ্যে খুব দৃঢ় ও অটল ছিল, যাহাদের ঈমানের কোন আশাই ছিল না। তাহাদের ব্যাপারে প্রথমোক্ত উদাহরণ প্রযোজ্য। এইহেতু এস্থানে ইরশাদ ইহয়াছে– যাহারা শ্রবণশক্তিহীন, বোবা এবং অন্ধ তাহারা কখনও হেদায়াতের পথে ফিরিয়া আসিবে না। আবার কতক মুনাফিক নেফাকের মধ্যে দুর্বল ছিল; যাহাদের ঈমানের আশাও বিদ্যমান ছিল। তাহাদের জন্যে দ্বিতীয় উদাহরণ। এইহেতু এ আয়াতে ঘোষিত হইয়াছে– বিজলী তাহাদের চক্ষু চমকিত করিয়া দিয়াছে।

তাফছীর ঃ ....او...... আও আরবী ভাষায় সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় كصيب কাছাইয়্যেবিন্. صيب ছাইয়্যেবুন صوب ছাওবুন হইতে আসিয়াছে। অর্থ– অবতীর্ণ হওয়া। ঝুঁকা এবং ধারণা করা। মাথা ঝুকানকে تصويب الراس বলা হয়। কিন্তু এই জায়গায় صيب ছাইয়্যের দ্বারা বুঝায় ঘন বৃষ্টি। কেননা, উহাও উপর হইতে বর্ষিত হয়। অথবা মেঘ যাহা উপর দিক হইতে বর্ষিত হয়

من السماء মিনাচ্ছামায়ে سماء ছামায়ে سمو ছামউন্ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– উচ্চ, উন্নত। আছমানকে ছামা এইজন্যে বলা হয় যে, উহা উচ্চ বা উর্ধ্বে স্থাপিত। আবার, বাদল বা মেঘকে ছামা বলা হয়। এইস্থানে আছমান ও বাদল দুই-ই বুঝাইতেছে। যদিও বৃষ্টি উপর দিক হইতেই বর্ষিত হয়। কিন্তু তবু من السماء মিনাচ্ছামায়ে বলায় কয়েকটি ফায়দা হাছেল হইয়াছে। যথা– (১) দর্শন ও বিজ্ঞান মতে বৃষ্টি সমুদ্র ও নদ-নদীর পানি তাপের ফলে বাষ্পরূপে উপরে উঠিয়া যায়। আবার উপরে ঠাণ্ডা হইয়া বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়। এ আয়াতে কারীমায় এ যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। বৃষ্টি আছমান হইতে জমিন হইতে নহে। কেননা, বহু সময় তাপমাত্রা খুব বাড়িয়া যায়, কিন্তু বৃষ্টি হয় না আবার অনেক সময় খুব ঠাণ্ডার সময় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। যদি ঐ যুক্তি মানিয়াও লওয়া হয় তবে ইহারই-বা কি কারণ যে, কখনও কখনও প্রবল বৃষ্টিপাত হয় আর কখনও কখনও হাল্কা বৃষ্টি বর্ষিত হয়? আবার কেনইবা সময় সময় মাঝারী বৃষ্টিপাত হয়? তথাপিও যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, বৃষ্টি সমুদ্র হইতে আসে তবে জিজ্ঞাস্য যে, সমুদ্রে পানি কোথা হইতে আসে? উত্তর হইবে নিশ্চয়ই আকাশ হইতে। আমরা ব্যাংক হইতে টাকা পাইয়া থাকি কিন্তু টাকা ব্যাংকে আসে টাকশাল হইতে। সুতরাং আয়াতে কারীমায় বৃষ্টির উৎস যাহা উহারই আলোচনা হইয়াছে। তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, আরশে আজীমের নীচে একটি সাগর রহিয়াছে, যেথা হইতে সমস্ত প্রাণীর রিযিক অবতীর্ণ

করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালার মার্জি অনুসারে সমস্ত রিযিক উর্ধ্ব আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে। অতঃপর বৃষ্টির দ্বারা চালনীর ন্যায় পানি আকাশ হইতে আসে। এবং উহা হইতে বাছিয়া জমীনে পড়ে। বৃষ্টির পানির প্রত্যেক ফোঁটা একেকজন ফেরেশতা নিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে জমীনে রাখিয়া যায়।

(২) من السماء মিনাচ্ছামায়ে বলা ঐ দিকে ইশারা হয় যে, এই বৃষ্টিপাত সমগ্র দুনিয়া ব্যাপী ছিল। ইহা নহে যে, দুনিয়ার কিয়দংশে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, কিয়দংশে হয় নাই।

(৩) বিজ্ঞান মতে: বৃষ্টি যদি জমীনের পানি অর্থাৎ নদী-নালা, খাল-বিল সাগর-মহাসাগর ইত্যাদির পানি হইতে হয়। কিন্তু ইহার কার্যকারণ সম্পর্ক আকাশেরই সহিত নিহিত থাকে। কেননা, সূর্যের তাপে নদী-নালা সমুদ্র ইত্যাদির পানি বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া যায়। এবং সেথায় ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসিয়া মেঘে পরিণত হয়। অতএব, বৃষ্টিপাত আকাশের দ্বারাই সংঘটিত হয়। বিজ্ঞানীদের কথায়, পানি তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হয়। এবং জমীনে ধোঁয়া, জ্বালানী দ্বারা উৎপাদিত ধোঁয়া এবং ডেকসীর উত্তপ্ত পানি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। জমীনের এই ধোঁয়া যখন বাতাসের কার্যকারিতায় আরও উন্নত ও অগ্রগামী হয় তখন উহা অগ্নিস্ফুলিংগের রূপলাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে তথায় উহা হইতে আলোর উদ্ভাবন ঘটে। কোন সময় কয়েকদিন যাবৎ সে আলো বিদ্যমান থাকে। এবং ধুম্র নক্ষত্র বা ধুমকেতু যাহা তীরের ছুরতে প্রকাশ পায়। কোন সময় আলোকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যায়। ইহাকে শাহাব বলে। নক্ষত্র নিভিয়া যাওয়া :- কোন সময় আলো হয় না বরং জ্বলিয়া যায়। এবং আকাশে লাল রং ও কাল রং হইয়া প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে, বাষ্প জমীন হইতে উপরে উঠিয়া কয়েকটি রূপ ধারণ করে। (১) উর্ধ্বে উঠিয়া জমিয়া যায়, এবং ফোঁটা ফোঁটা হইয়া জমিনে পড়ে। ঐ জমাটবদ্ধ বাষ্পকে বাদল এবং ফোঁটাসমূহকে বৃষ্টি বলা হয়। আবার কোন সময় বাষ্প বেশী উপরে উঠেনা বরং জমিনের কাছাকাছি অবস্থানে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে জমিয়া নীচে নামিয়া আসে। উহাকে শবনম বা কুয়াশা বলা হয়। এবং কোন সময় শক্ত ঠাণ্ডার ফলে উক্ত বাষ্প উপরে উঠিবার সময় রাস্তায় জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। উহাকে শিলা বলা হয়। জমীনে পতিত হওয়ার সময় উহাকে শিলাবৃষ্টি আখ্যায়িত করা হয় বাষ্প এবং ধোঁয়া উর্ধ্বে উঠিয়া পৃথক পৃথক ইহয়া যায়, আবার পুনরায় উল্টা পথে ফিরিয়া আসে ইহাই ঘূর্ণিবায়ুর রূপ ধারণ করে। আবার বাষ্প ও ধোঁয়া যখন ঠাণ্ডার চরম সীমায় পৌঁছে অর্থাৎ অত্যধিক শীতল হয় তখন মেঘের আকার ধারণ করে, ধোঁয়া তখন উহাকে ভেদ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। ফলে, উভয়ের সংঘর্ষে বিকট আওয়াজের সৃষ্টি হয়। ঐ আওয়াজের নাম গুরু-গর্জন। আরবীতে উহাকে বলা হয় রাআদ। আবার কোন সময় এ ধোঁয়া তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিদ্যুৎ বা বিজলীর রূপলাভ করে। আরবীতে

যাহাকে বরক্বুন বলা হয়। আবার কোন সময় অত্যধিক ঠাণ্ডার কারণে এই ধোঁয়াও ক্রমশঃ জমিয়া পুনরায় জীমনে ফিরিয়া আসে। তখন এই জমাটবদ্ধ ধোঁয়া মেঘমালা ভেদ করিয়া নীচে আসিবার সময় বিকট আওয়াজের জন্ম দেয়। ইহাতে জমীনের কোন অংশ জ্বলিয়া যায়।

فيه ظلمت ফিহে জুলুমাতুন فيه

ফিহের জমীর صيب ছাইয়্যেবুন-এর দিকে ফিরিয়া যায়। যদি ইহার অর্থ বাদল হয় তবে আয়াতের তরজমা এই হইবে যে, এই বাদলের মধ্যে বহুৎ অন্ধকার রহিয়াছে। আর যদি ইহার অর্থ বৃষ্টি হয় তবে মর্মার্থ এই হইবে যে, এই বৃষ্টিতে বহু অন্ধকার রহিয়াছে। উভয় অর্থই শুদ্ধ। এক্ষণে, ঐ কয়েকটি অন্ধকার নিম্নে বর্ণিত হইলঃ- (১) মেঘের অন্ধকার, (২) ঘন বৃষ্টির অন্ধকার, (৩) রাত্রির অন্ধকার, (৪) জ্যোৎস্না না থাকার অন্ধকার। ورعد و برق

ওয়ারাআদু ওয়াবারকু রাআদ হইল বাদলের আওয়াজ। এবং বারকু উহার চমককে বলা হয়। যদি বলা হয় যে, এই সকল জিনিস বৃষ্টি হইতে, তবু ইহা বিশুদ্ধ। কেননা, এতদুভয় বৃষ্টির সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর এ উভয়টি বাদল হইতে সরাসরি প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিরমিজি শরীফে আছে– একবার ইহুদীরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, রাআদ এবং বরক্ কোন জিনিস। হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন– রাআদ একজন ফেরেশতার নাম যিনি বাদলের জন্যে নিযুক্ত। এবং এ আওয়াজ ঐ ফেরেশতার যিনি বাদলকে পরিচালনা করেন। এবং বারক তাহার হাতে অগ্নির কোড়া যাহা দ্বারা ঐ ফেরেশতা বাদলকে হাঁকাইয়া থাকেন। তাফছীরে রুহুল বয়ানে আছে– ঐ ফেরেশতা আকারে মৌমাছির মত দেখিতে কিন্তু তাহার শক্তি সামর্থের অবস্থা এই যে, কতক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, ঐ বিকট আওয়াজ যাহা বজ্রের গর্জন তাহাই ঐ ফেরেশতার তছবীহ্ পাঠ। এইহেতু, ঐ আওয়াজ শ্রবণমাত্রই তছবীহ্ পাঠ করা কর্তব্য। ছাইয়্যেদেনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন– যে ব্যক্তি বাদলের আওয়াজ শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ বজ্রের গর্জন শুনিয়া নিম্নের তছবীহ্ পাঠ করিবে তবে নিশ্চয়ই সে বিজলীর হাত হইতে রক্ষা পাইবে ইন্‌শাআল্লাহ। তাহা এই سبحان الّذى يسبح الرعد بحمده وَالْملئكَة منْ خيْفَة وَهُوَ عَلى كُلّ شَىْ قَديْرٌ ·

"ছোব্‌হানাল্লাজি ইউছাব্বিহুররা'দু বিহাম্‌দিহি ওয়াল্‌মালায়েকাতু মিন্ খিফাতে ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদির।" তিনি আরও ফরমাইয়াছেন যে, "যদি তাহার উপর বিজলী পড়ে তবে আমি ইহার জন্যে দায়ী হইব।" এ আমল খুবই পরীক্ষিত। اصابعهم আছাবিয়াহুম– মানুষ গর্জন শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিত। পুরাপুরি আঙ্গুল নহে। কিন্তু এই জায়গায় উল্লেখ হইতেছে যে, পুরাপুরি আঙ্গুল অথবা আঙ্গুলের দ্বারা পরদা বুঝায়। অথবা ইহার মতলব এই যে,

তাহারা ভীত হইয়া সমস্ত আঙ্গুল কানে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিত।

مِن الصواعقِ মিনাচ্ছাওয়ায়েকে ছায়েকার বহুবচন। ছায়েকা ঐ বিজলীকে বলা হয় যাহা কোন বস্তুর উপর পড়িয়া উহাকে জ্বালাইয়া দেয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকের বিজলীর ভয়ে নিজেদের কানে অঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া কান বন্ধ করিয়া দিত। حذر الْموت، হাজারাল মাউত-হাজারের ভয় এবং পরহেজ করা বা বাঁচিয়া থাকা। এই জায়গায় উভয় অর্থই হইতে পারে। অর্থাৎ, মৃত্যুর ভয়ে, কিংবা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে।

وَ اللهُ مُحِيطٌ ওয়াল্লাহু মুহিতুন ইহার শাব্দিক অর্থ আল্লাহ্পাক কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। কেননা, 'মুহিত' 'এহাতা' হইতে বাহির হইয়াছে যাহার অর্থ কোন জিনিসের চারিদিকে এমনভাবে বেষ্টন করিয়া রাখা যাহাতে ঐ জিনিস একেবারে মাঝখানে পড়িয়া থাকে। এই গুণ আল্লাহ্র জন্যে নহে, এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেও সম্ভবপর নহে। কেননা, আল্লাহ্পাক স্থান ও কাল হইতে পবিত্র। অতএব, মুহিত শব্দের ভাবার্থ হইতেছে আল্লাহ্পাক স্বীয় এল্ম্ ও কুদ্রতের দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ, সবকিছুই আল্লাহ্র এল্ম্ ও কুদ্রতের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার এল্মত ও কুদ্রতের বাহিরে কিছুই নহে।

দেওবন্দী ফেরকা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত করিতে চায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার জাত সব জায়গায় মওজুদ রহিয়াছে। এই হেতু, হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সব জায়গায় হাজির ও নাজির মানা শিরিক বলিয়া প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। এই অজ্ঞ লোকদের এতটুকু বোধশক্তি নাই যে, সব জায়গায় সে সত্ত্বাই বিদ্যমান থাকিতে পারেন যিনি শরীর বিশিষ্ট। এবং সব জায়গায় আল্লাহ্পাক ছোব্হানাহু তায়ালা এ উভয় গুণ হইতেই পবিত্র। সব জায়গায় সৃষ্টিই থাকিতে পারে স্রষ্টা নহে। যেমন– মালাকুল মউত, মুনকার-নাকীর কেরামুন কাতেবীন অর্থাৎ তকদীর লেখার ফেরেশ্তা এবং চন্দ্র-সূর্য এই সবের দৃষ্টির নূর এমনই ধরনের যে, সর্বক্ষণ সর্বস্থানে মওজুদ থাকে। এই বিষয়টি অর্থাৎ হাজির-নাজির সম্পর্কে উত্তরূপে এবং বিস্তারিত অবগত হইতে চাহিলে হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফ্তী আহমদ এয়ার খাঁন নঈমী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) প্রণীত 'জাআল্হক' কিতাব পাঠ করুন।

بِالْكفرين 'বিল্কাফেরীন'-এর দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, আল্লাহ্পাকের এলেম শুধু কাফেরদিগকেই বেষ্টন করিয়া আছে; মুসলমানদিগকে নহে। মূলতঃ আল্লাহ্পাকের এলেম সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করিয়া রখিয়াছে। কিন্তু যেহেতু, এই জায়গায় বিশেষভাবে কাফেরদের আলোচনা রহিয়াছে; এইহেতু তাহাদের প্রসংগই উল্লেখ করা হইয়াছে।

খোলাছা তাফছীর ঃ মুনাফিকদের আবস্থাকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ও সুন্দর বিবরণীর মাধ্যমে উত্তমরূপে বুঝান হইতেছে যে, তাহাদের অবস্থা ঐ সমস্ত লোকদের মত যাহারা অন্ধকার রাত্রিতে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতেছে। এমন সময় আকস্মাৎ দূর্যোগপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ফলে, তাহারা গভীর অন্ধকারে পতিত হইল। উপরন্তু, প্রবল বৃষ্টিপাতসহ বিজলীর চমক এবং গুরু-গর্জন। বজ্রের ঐ গর্জন শ্রবণপূর্বক তাহারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াছে। যে কারণে তাহারা নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া যাহাতে তাহাদের কানের পর্দা ফাঁটিয়া না যায়। আর তাহারা বিজলীর আলো পাইয়া সম্মুখে চলিতে থাকে। পুনরায় অন্ধকার হইয়া গেলে দাঁড়াইয়া থাকে। মোটকথা, মুনাফিকরা আশ্চার্য ধরনের বিপদে পড়িয়াছে এবং তাহারা এমতাবস্থায় অত্যন্ত হয়রান ও পেরেশানগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং তাহারা কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। অতএব, মুনাফিকদের জিন্দেগীর অন্ধকার রজনীতে তাহারা দুনিয়ার নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিতেছে। হঠাৎ তাহাদের শহরে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তশরীফ আনয়ন করিলেন। যিনি আল্লাহ্‌র রহমতের খুবই শক্ত বাদল স্বরূপ। আর তাহার উপর কোরআনে কারীম নাযিল হইতে লাগিল। যাহা ঘন কাল বৃষ্টির মতন। যেরূপ বৃষ্টিতে সমস্ত জমীন সুজলা-সুফলা হইয়া ওঠে, বাগান ও শস্যক্ষেত্র ফলে-ফুলে ভরিয়া উঠে। তদ্রূপ, কোরআনে কারীমের বৃষ্টিধারা যে দ্বীলের জমি ঈমানের বাগানকে সুসজ্জিত করিয়াছে এবং এ বাগানে তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর ফুল ফুটিয়াছে। কিন্তু এই কোরআনে শরীয়তের আদেশ অন্যায়ের শক্ত শাস্তি এবং দুনিয়ার সহিত ভালবাসা রাখার আদেশ ও যাহা গর্জনের মত এবং বিজলীর মত। এই মুনাফিকরা তাহাদের কানে আঙ্গুল এইজন্যে দিত যে, না জানি এই কালাম তাহাদের উপর আছর বা প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। যার ফলে, তাহাদের দুনিয়ার আরাম-আয়েশ উঠিয়া যায়। মালের জাকাত দিতে হয়। জেহাদে যোগদানপূর্বক জান কোরবান করিতে হয়। কেননা, মুনাফিদের নিকট এই জিনিস মৃত্যুতূল্য। পক্ষান্তরে, কোন সময় তাহাদের মাল ও আওলাদের মধ্যে যখন বরকত দেখা দিত অথবা গনিমতের মাল এবং জাকাতের মাল তাহাদের হস্তগত হইত তখন তাহারা আনন্দিত হইয়া বিজলীর চমকের ন্যায় চলিত, আর বলিত– 'ইসলাম সত্যধর্মই বটে।' এবং এ ধারণা পোষণ করিত যে, 'যখন জাহেরী কালেমা পাঠ করিয়াছি, আমাদের ঘরে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত রহিয়াছে।' আবার যখন তাহাদের উপর কোন মছিবত আসিত অর্থাৎ ইহারা বিপদাপদের সম্মুখীন হইত; যেমন–আওলাদ ও মাল ইত্যাদির মধ্যে ঘাটতি কিংবা কমতি দেখা দিত তখন তাহারা হতাশাগ্রস্ত ও দূর্যোগময় মুহূর্তে অন্ধ কুঠুরীতে আবদ্ধ লোকদের মত বলিতে থাকে– 'আমরা যখন হইতে জাহেরী কালেমা পাঠ করিয়াছি তখন হইতেই এই ধরণের বিপদাপদে গ্রেপ্তার হইয়াছি। এ ধর্ম সত্য

নহে।' এ উক্তি করতঃ মুনাফিকদল ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন– ইহারা কুফুরী করিয়া আমার কুদ্রত বা মহাশক্তির বাহিরে যাইতে সমর্থ হইবে না। কেননা, সকল সৃষ্টি বিশেষতঃ কাফের মুশরিকদের উপর আমার মহা কুদ্রতের পূর্ণ আবেষ্টনী রহিয়াছে। কেহ কোথাও পলায়ণ করিয়া যাইতে পারিবে না। এবং কাহার কি শক্তি রহিয়াছে যে, নিজের চেষ্টায় আমার কুদ্রতী হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে? চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন ব্যতীত রোগমুক্তির আশা যেমন দুরাশা। তদ্রূপ, শরীয়তের পাবন্দি ছাড়া নিজেদের মনগড়া ও ভ্রান্ত পথে চলিয়া নাজাতের আশা করা আহ্মকী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নোটঃ- এই আয়াতের ফায়দাসমূহ পরবর্তী আয়াতের পরে বর্ণনা করা হইবে। কেননা, এখনও আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

২০ নং আয়াত– يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ
لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ لا وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

অর্থঃ- মনে হয় এই বুঝি বিদ্যুৎ ঝলক তাহাদের চোখ ঝলসাইয়া দৃষ্টিশক্তি হরণ করিবার উপক্রম করিল। যখন বিদ্যুৎ চমকায় এবং উহাতে তাহাদের জন্যে আলোক দান করে তখন তাহারা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয় তখন তাহারা থম্কিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তিকে ছিনিয়া লইতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্পাক সকল বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।

সম্পর্ক ঃ- এ আয়াতের বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর অবশিষ্টাংশ। কেননা, উহাতে দূর্যোগপূর্ণ ঝড়-বাদলের কবলে পতিত লোকদের বিপর্যস্ত হওয়ার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কানে আঙ্গুল গুঁজিয়া দেওয়া ইহাদের বাকী অংশের আলোচনা এক্ষণে, করা হইতেছে। কিন্তু যেহেতু, সংকটের সময় মানুষ ঐ সমস্ত ব্যাপারই সর্বপ্রথম সম্পাদন করে; তৎপর চলাফেরা করে থাকে। এইহেতু, প্রথমে কান বন্ধ করিবার প্রসংগ উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে, তাহাদের চলাচল সম্পর্কে বয়ান করা হইতেছে।

তাফছীর ঃ- يكاد ইয়াকাদু كود কাওদুন হইতে নিষ্পন্ন যাহার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। আর ইহা ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেথায় কাজ হউক না হউক। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। এইস্থানে ইহাই বলা হইতেছে যে, বিদ্যুৎ চমক তাহাদের অন্ধ করে নাই বটে, তবে উহাতে দারুণ ভয়ের জন্ম দিয়াছে। يخطف ইয়াখতাফু خطف খাতফুন হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ– আকস্মাৎ ছিনিয়া লওয়া। بصارهُم।আব্ছারাহুম- .... بصَار। আবছার বাছারের বহুবচন। যাহার অর্থ– চোখের আলোক।

যদিও ইহা একই ইহয়া থাকে; কিন্তু যেহেতু এইস্থানে বহুলোকের আলোচনা করা হইয়াছে। এইহেতু, চোখের আলোও বহুজনের বহু। তবে ক্বায়দা এই যে, তেজধার আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু বেকার বা অচল হইয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে। সূর্য ও গ্যাসের আলোতে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কেননা, বিজলীর আলোও খুব তেজস্কর হইয়া থাকে। এইজন্যেই তাহাদের অন্ধ হইবার আশংকা। كلمّا কুল্লামা এবং اذا ইজা উভয়ই সময় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুল্লামার মধ্যে বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহার অর্থ– যখন কোন সময় এবং اذا ইজার অর্থ– যখন। যদিও ঐ বিজলীর চমকান ও নিভিয়া যাওয়া উভয়ই বারংবার ঘটিতেছে। কিন্তু যেহেতু ঐ লোকেরা বিজলী চমকের প্রতি সন্তুষ্ট এবং উহার নির্বাপিত হওয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট। এইজন্য চমককে কুল্লামার দ্বারা এবং নিভিয়া যাওয়াকে ইজার দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। . اَضَاء আদ্বোয়াআ-ইহা লাজেমও হইতে পারে এবং মু'তাদিও হইতে পারে। অর্থাৎ হয়ত ইহার অর্থ এই হইবে যে, যখন কোন সময় তাহাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকায়; এবং হয়ত এই হইবে যে যখন কোন সময় উহা রাস্তাকে চমকায়। مشوفيه মাশাওফিহে مشو মাশাও

مشى মাশায়ন হইতে আসিয়াছে যাহার অর্থ– আস্তে আস্তে চলা লাফ দিয়া চলাকে আরবীতে خبث খাবাছ বলা হয়; এবং দৌড়ানকে আরবীতে هروله হারওয়ালা বলা হয়। মতলব এই যে, ঐ লোকসকল আলোতেও আস্তে আস্তে কদম উঠাইত। আর ধীরে ধীরে পথ চলিত। অর্থাৎ, তাহারা এতদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে ভাগিয়া যাইবার শক্তিটুকু আর অবশিষ্ট ছিল না। ফিহের জমীর হয়ত আদ্বাআর দিকে অথবা রাস্তার দিকে। অর্থাৎ, তাহারা ঐ আলোতে চলিত অথবা রাস্তার দিকে।

اظلم ..আজলামার মধ্যে ও লাজেম মু'তাদি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অর্থাৎ, যখন ঐ বিজলী নিভিয়া যাইত কিংবা রাস্তা অন্ধকার হইয়া যাইত। قَامُوْا ক্বামু ক্বিয়ামা হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়াইয়া যাওয়া এবং দাঁড়াইয়া থাকা। বসা অবস্থা হইতে উঠিয়া পড়াকে দাঁড়ান বলা হয়। আবার চলিতে চলিতে থামিয়া যাওয়াকে থম্‌কিয়া দাঁড়ান বলা হয়। আর এই জায়গায় দ্বিতীয় অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ঐ বেকুফ লোকসকল এতদূর জ্ঞানশূন্য ছিল যে, অন্ধকারে প্রথম চমকিত রাস্তায় কিছুটা অগ্রসর হইত তৎপর বরং বিজলী নিভিয়া বা চলিয়া যাইতেই থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত।

ولو شَاءَ اللهُ ওয়ালাওশাল্লাহ্- দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, তাহাদের এই চেষ্টা একদম বৃথা। আল্লাহ্‌পাকের দয়ায় তাহাদের চক্ষু এবং কান ঠিক রহিয়াছে। অন্যথায়, তাহাদের চক্ষু-কর্ণ, বজ্রের গর্জন ও বিজলী চমকের দ্বারা সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া যাইত।

سمع ছামউন শুনিবার শক্তিকে বলা যাইতে পারে, এবং কানের

ঐ পরদাকেও বলা হয় যাহার মধ্যে এই শক্তি রহিয়াছে। এই জায়গায় উভয় অর্থই হইতে পারে। তদ্রূপ, اَبصَارُ আবছার বাছারের বহুবচন। ইহাতেও দুইটি ধারণা রহিয়াছে যে, হয়ত দেখিবার শক্তিকে বুঝায় অথবা চোখের মনি যাহাতে দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে। আবার উভয় কানের সংযোগ একই স্থানে এবং উভয় চোখের মনি ভিন্ন ভিন্ন। এইজন্যে ছাময়ুনকে একবচন, আবছারকে বহুবচন রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাজেই, আয়াতের অর্থ হইবে– যদি আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি রহিত করিয়া দিতেন। অথবা তহাদের কানের পরদা ফাটিয়া যাইত এবং চোখের মনি নষ্ট হইয়া যাইত।

اِنَّ اللهَ ইন্নাল্লাহা প্রথম ইরশাদ হইয়াছে। اِن

ইন্না ঐস্থানে ব্যবহৃত হয় যেথায় কালামের মুনকির বা অস্বীকারকারী থাকে, অথবা যেখানে এন্কার বা অস্বীকারের সম্ভাবনা থাকে। কেননা, আরবের মুশরিক ও কাফেররা আল্লাহ্র কুদ্রত কালেমার মুনকির ছিল, এবং ভবিষ্যতে ইসলামেরও মুনকির জন্ম হইবে। এইজন্যে, এইখানে ইন্না ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, মুশরিকরা কয়েকজন মা'বুদ মানিত। এইজন্যে তাহারা আল্লাহ্কে প্রত্যেক জিনিসের উপর কাদের মানিত না। কেননা, দুর্বলই নিজের কাজে কোন সাহায্যকারীকে নিজের অংশীদার বানাইয়া থাকে। আর যিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর কাদের বা শক্তিমান তাহার আবার সাহায্যের কি প্রয়োজন? তদ্রূপ, ইহুদী ইছায়ীরা আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে সন্তান প্রমাণ করিয়াছে। দুর্বলচেতাই সন্তানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, সর্বশক্তিমান নহে। তদ্রূপ, আরিয়া সমাজ আল্লাহ্র জন্যে রূহে মাদ্দার মুখাপেক্ষী মানিয়াছে। মোতাজেলা ফেরকার বান্দাকেই তাহার কাজের স্রষ্টারূপে গণ্য করিয়া থাকে। মোটকথা, বহু ফেরকা বা দল-উপদল কুদ্রতে এলাহীর মুনকির সাজিয়াছে। এইহেতু, এইস্থানে اِنَّ ইন্না প্রয়োগ হইয়াছে।

على كل شئ আলা-কুল্লিশাইয়িন شئ শাইয়িন্-এর আভিধানিক অর্থ চাওয়া আর পারিভাষিক অর্থে– উহাই বুঝায় যাহার সম্পর্ক চাওয়ার সহিত। যাহার উর্দু তরজমা বস্তু বা জিনিস। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইবে আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। কোরআন শরীফে شئ শাইয়ুন চারিটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– (১) সম্ভাবনা মওজুদ; যেমন-- খালেক কুল্লি শাইয়িন। কেননা, মখলুক মওজুদই বটে, গায়েব মওজুদ নহে। (২) সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকুক বা না-ই থাকুক। যেমন– এ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে কেননা, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান যাহা আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা বা ধারণায় আসে। এবং ইহা সম্ভাবনার মধ্যেই। এইজন্যে ওয়াজিব ও মহান খোদা তায়ালার ধারণায় আসিতেই পারে না। এইহেতু, ইহা কুদ্রতের শামিলও নহে। আল্লাহ্পাক নিজের শরীক বানাইতে পারেন না। কেননা, ইহা মহাল বিজ্জাত অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্ত্বার পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ্পাক কোন দোষের কাজও করিতে

পারেন না। ইহাও মহাল বিজ্জাত। আর তিনি স্বয়ং নিজের জাত ও ছিফাতের (সত্ত্বা ও গুণাবলীর) উপর ক্বাদের বা ক্ষমতাবান নহেন। কেননা, উহা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। অতএব, شَىْءٌ শাইয়ুন হইতে মহাল ও ওয়াজিব উভয়ই খারিজ বা বহির্ভূত। (৩) অবগত হওয়া। যেমন- এই জায়গায় শাইয়িন এর মধ্যে ওয়াজিব, মহাল, মমকিন অর্থাৎ অপরিহার্য কিংবা সম্ভব সবই শামিল রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ্‌পাক এই সমস্ত কিছুই অবগত রহিয়াছেন। (৪) মওজুদ ওয়াজিব হউক অথবা মমকিন যেমন- خالق كل شَىْءٌ তদ্রূপ, আল্লাহ্‌পাকের ইরশাদ- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا এই উভয় আয়াতে শাইয়ুনের মওজুদ আল্লাহ্‌পাকও ইহাতে শামিল। যদি শাইয়ুনের এই অর্থে পার্থক্য করা যায় তবে কিন্তু দেওবন্দীরা এই আয়াতের দ্বারা বুঝিয়া নিয়াছে যে, আল্লাহ্‌পাক মিথ্যাও বলিতে পারেন। কেননা, মিথ্যাও জিনিস এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর আল্লাহ্ কাদের বা শক্তিমান। বিষয়টির পর্যালোচনা এ আয়াতের শেষে করা হইবে ইন্‌শাআল্লাহ। قدير কাদিরুন قدر কাদরুন হইতে বাহির হইয়াছে যাহার অর্থ পরিমাণকরা এবং কাদের বা শক্তিমান হওয়া। এইস্থানে উভয় অর্থই হইতে পারে। এইজন্যে আল্লাহ্‌পাক প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণমত সৃষ্টি করিয়াছেন। কমও নহে বেশীও নহে। কেননা, আল্লাহ্‌পাক যাবতীয় কিছুর পরিমাণ নির্ধারণকারী। এবং কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি আপারগ নহেন। যেহেতু, আল্লাহ্‌পাক প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের উপর কুদ্‌রত বা ক্ষমতা প্রয়োগকারী। দ্বিতীয় অর্থ এইস্থানে খুবই প্রযোজ্য। যদিও রুহুল বয়ান শরীফে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে।

قدير কাদিরুন এবং قادر কাদের- এর মধ্যে পার্থক্য এইযে, قادر কাদের ইছ্‌মে ফায়েল এবং قدير কাদির ছিফতে মোসাব্বাহ্। এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইছ্‌মে ফায়েলে ছিগা উহাকে বলে যাহার ফেয়েল প্রকাশ হয়। আর ছিফতে মুশাব্বাহ্ এইজন্যে বলা হয়। যাহার মধ্যে ফেইলের ছিফত থাকে। বর্তমানে করুক বা না করুক। যেমন- ছামে উহাকে বলা হয় যে বর্তমানে কিছু শ্রবণ করে। কিন্তু سميع ছামী উহাকে বলে যাহার মধ্যে শ্রবণশক্তি বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমানে শ্রবণ করুক বা না করুক। ছামীর বিপরীত বহেরা বা বধির। এই ধরনেরই متكلم মুতাকাল্লিম যে বর্তমানে বলিতেছে। ইহার বিপরীত ساقت ছাকেত বা নিশ্চুপ। কিন্তু কালিম যাহার মধ্যে বাকশক্তি রহিয়াছে তাহার বিপরীতে গুঙ্গা বা বোবা। যেহেতু, আল্লাহ্‌পাক সর্বক্ষণ কাদির চাহে মাক্বদুরাত অর্থাৎ আলম মওজুদ থাকুক কিংবা না থাকুক।

খোলাছা তাফছীর ঃ এই আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা- প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বিজলীর

চমকের ফলে তাহাদের চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইত এবং ইহার আলোতে মুছাফির কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করিত। আবার অন্ধকার হইলে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। এমতাবস্থায় তাহারা অত্যন্ত হয়রান-পেরেশান থাকিত। বরং গন্তব্যস্থানেও পৌছিতে পারিত না এবং তথা হইতে ফিরতেও পরিত না। তদ্রূপ, এই মুনাফিক লোকেরা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার প্রকাশ্য মুজেজা এবং কোরআনে কারীমের আয়াত প্রত্যক্ষ করিত যাহা আচমকা বিজলীর মতই প্রতিভাত হইত। তখন অপারগ অবস্থায় অন্তর দিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। যেমন- ঐ মুছাফিরদের বিজলীর আলোতে কিছুটা পথ চলার ন্যায়। যেমন- আবার যখন সন্দেহের ঘন অন্ধকার তাহাদের অন্তরকে কালিমাযুক্ত করিয়া দিত তখন ঐ মুছাফিরের অন্ধকার রাত্রিতে বিজলী চমকের পরক্ষণে থমকিয়া দাঁড়াইবার মতন থামিয়া যাইত। যেহেতু, তাহাদের অন্তরে শান্তির লেসমাত্রও ছিলনা, কাজেই তাহাদের অন্তরে চির অশান্তি বিরাজ করিত। বরং এই ভাবিয়া হয়রান হইত যে, ইসলামকে মানিবে কিনা।

অনুরূপভাবে কোরআনে কারীমের বিজলী সদৃশ আলোক দ্বারা চক্ষু বন্ধ করা এবং উহা অস্বীকার করা অর্থহীন। কেননা, প্রথমতঃ তাহাদের দেখিবার শক্তি বিলোপ হয় নাই। আবার, আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিতে পারেন। আজকাল এমন বহু লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয় বটে; কিন্তু তাহাদের অন্তরে আবার এমন ধরনের সন্দেহ বিরাজ করে যার ফলে ইহারা খুবই হতাশার মধ্যে পতিত হয়, হয়রান পেরেশন থাকে। ইহার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ইহাও হইতে পারে যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, আয়েশ ও আরাম লাভ করতঃ ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। পক্ষান্তরে, কোন বিপদাপদে পতিত হইলে পুনরায় অস্বীকার করিয়া বসে। জানা আবশ্যক যে, ঝড়-বাদলের ফলে নির্জন জঙ্গলের পথে মুছাফির ঘাবরাইয়া যায় এবং লোকালয়ে বাড়ীঘরে অবস্থিত লোকজন শান্ত ও ভাবনাহীন থাকে। অর্থাৎ, আশ্রয়দাতাদের জন্যে বাদল রহমত স্বরূপ আর আশ্রিতদের জন্য উহা আজাব স্বরূপ।

অতএব, মদীনার জমীনে ছাহাবাগণ মাহবুবে খোদার আশ্রয়ে আমানে ছিল। আর মুনাফিক সম্প্রদায় ছিল আশ্রয়হীন ও পথহারা। হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নবুওতের আকাশ স্বরূপ; এবং কোরআন কারীম ঐ আকাশের বাদল বা মেঘ। কোরআনের আহ্‌কাম বৃষ্টির তুল্য এবং আজাবের আয়াত গুরু-গর্জন। দুনিয়াভী শাস্তির আয়াত যেমন- বিজলী যাহার দ্বারা মুসলমান তথা ছাহাবাগণ সন্তুষ্ট। আর মুনাফিকদল হয়রান ও পেরেশান। এই অবস্থার পরিবর্তন কিয়ামত অবধি চালিতে থাকিবে। মানুষের জন্যে জিছমানী ও রুহানী উভয় প্রকার ছায়ারই সর্বদা প্রয়োজন। গরম, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে বাঁচিবার জন্যে মানুষ ছায়া বা কোন প্রকার আশ্রয়স্থলের মুখাপেক্ষী যেমন-

শিশুরা মতা-পিতার মুখাপেক্ষী, প্রজা বাদশাহর মুখাপেক্ষী এবং ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। তদ্রূপ, উম্মতগণ রাছুলেপাকের আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী যথা– কবরে, হাশরে মিযানে ও পুলছেরাতে উম্মতবৃন্দ রাছুলে খোদার অনুপম রহমতের মুখাপেক্ষী।

আয়াতে কারীমার ফায়দা বা উপকারিতাসমূহঃ- এ আয়াতের দ্বারা কতিপয় উপকারিতা লাভ হয়। যথা– (১) যে কোন বস্তু বা বিষয়ের তাছির বা আকর্ষণ আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা না হয় তবে কিছুতেই কোন জিনিস হইতে পারে না। (২) আল্লাহ্পাকের এরাদা বা ইচ্ছা কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী নহে। আল্লাহ্পাক যাহা ইচ্ছা করেন তাহা বিনা কারণে সংঘটিত করিতে বা সম্পন্ন করিতে পারেন। কেননা, এ আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে যে, বিজলী, গুরুগর্জন খুবই তেজক্রিয় ছিল; অথচ মুনাফিকদের চক্ষু-কর্ণ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বহাল রহিল। কেননা, আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির করিতে ইচ্ছুক নহেন। যদি আল্লাহ্পাক তাহা ইচ্ছা করিতেন তবে সকল কারণ ব্যতীত করিতে পরিতেন। বর্তমান সময়েও যাহারা দুনিয়ার শান্তির আশায় আল্লাহ্র বন্দেগী করিয়া থাকে তাহারা মস্তবড় ভুলের জগতে বাস করিতেছে। কিছু কিছু লোক এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কোন মছিবতের কবলে পড়িতেই নামাজ ছাড়িয়া দেয় এবং বলিতে থাকে– 'নামাজে কোন ফল নাই, যদি থাকিত তবে আমার এ অনিষ্ট কেন হইল? এই সমস্ত অজ্ঞ লোকদের এই আয়াতের শিক্ষা হইতে নছিহত বা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। যদিও নেক কাজ বা সৎকর্মের দ্বারা বহু বালা-মছিবত কাটিয়া যায়। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কখনও এই নহে যে, নেককার লোকের উপর কোন প্রকার মছিবত আসিবে না। যদি তাহাই হইত তবে ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ হজরত ইমাম হোছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর কারবালার মছিবত তথা কোন দুঃখ কষ্টই আসিত না। বরং ছুফিয়ানে কেরাম বলেন যে, নিজের কোন উপকারের প্রতি ধারণা রাখিয়া এবাদত করা ভাল নহে। কজেই কেবল বেহেশতের আশায় নামাজ রোজা করা উচিৎ নহে। বেহেশ্ত আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে লাভ হইবে। নামাজ-রোজা তো শুধু আল্লাহ্পাককে রাজী করার উদ্দেশেই। অর্থাৎ, আল্লাহ্পাকের রেজামন্দি বা সন্তুষ্টির জন্যেই এবাদত বন্দেগী। কাজেই, 'আল্লাহ্পাকের দরবারে ব্যবসায়ী সাজিয়া আসিও না, বরং ভিখারী সাজিয়া আস।' অর্থাৎ, এই কথা বলিওনা– 'হে খোদা! আমার আমল তথা নামাজ রোজা ইত্যাদির বদলা বা বিনিময়ে দান কর।' বরং এই প্রার্থনা কর- 'হে খোদা! তোমার অপার করুণার দ্বারা আমার গোনাহ্ মাফ কর।' (৪) ঈমান 'এত্মিনানে ক্বালব্ বা দ্বীলের প্রশান্তি দ্বারা লাভ হয়। অনুরূপভাবে খাঁটি ঈমান হুজুর সারোয়ারে ক্বায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে যথাযথভাবে মানার নাম। তাঁহাকে শুধু জানার নাম ঈমান নহে। মুশরিকরাও তাঁহাকে জানিত ও চিনিত যেমন– তাহাদের নিজ নিজ সন্তানাদিকে

চিনিত ও জানিত। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে- 'ইয়ারেফুনাহু কামা ইয়ারেফুনা আব্নায়াহুম।' হুজুরে পাককে জানা ও মানার পার্থক্য ইন্শাআল্লাহ্ এই আয়াতের প্রসঙ্গে বয়ান করা হইবে।

তাফছীরে ছুফীয়ানাঃ ছুফিয়ানে কেরাম ফরমাইয়াছেন- তরিকতের মুছাফির অর্থাৎ আল্লাহ্র পথের পথিকের সামনেও মছিবত আসিয়া থাকে। যেরূপ মছিবতের কথা এইস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, যে ব্যক্তি এই রাস্তায় চলাচল করে এবং কিছু মেহনত করে; অতঃপর কিছুটা নূরের ঝলক দর্শন করে তখন আনন্দিত মনে আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্যে কোশেশ করিতে থাকে ইতিমধ্যে একসময় হঠাৎ ঐ নূরের তাজাল্লি কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হইয়া যায়। তখন ঐ আল্লাহ্র পথের পথিক অত্যন্ত হয়রান পেরেশান হইয়া পড়ে এবং উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায় যদি মেজাজ ঠিক থাকে তবে এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পুনরায় চেষ্টা চালাইয়া যায়। অন্যথায় ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। আর এভাবে ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া পড়া ঠিক নহে। তালেবে মাওলার জন্যে করণীয় যে, এই সমস্ত অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাজ চালাইয়া যাওয়া রিয়াজত ও মোজাহাদায় আত্মনিয়োগ করা। প্রিয় পাঠক ! মনে রাখিবেন, এ রাস্তা অত্যন্ত দুরূহ ও সংকটাপন্ন। মনজিল অত্যন্ত কঠিন। এই অতল সমুদ্রে হাজরো নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। শয়তানী ডাকাত লুণ্ঠন করিয়াছে। দুনিয়ার চাকচিক্য ও প্রলোভন শয়তানী খিয়ালাত ও তাকাব্বুরী ইত্যাদি এ সুদীর্ঘ ছফরের মছিবত। ইহাও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, ছুফী এবং ওলী সব সময় একই অবস্থায় থাকে না। কোন সময় দুনিয়ার খবর রাখেন, কোন সময় রাখেন না। এমনকি নিজেকে ভুলিয়া যান। ওলির উপর ফয়েজ কোন সময় বেশী কোন সময় কম এবং কোন সময় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর ওহি সব সময় আসিত না। কোন সময় কিছু দিনের জন্যে ওহি বন্ধ থাকিত। অতএব, এই রাস্তায় বিপদাপদ অনিবার্যরূপে আসিয়া থাকে। এই সমস্তের পরওয়ানা করিতে নাই।

প্রশ্নোত্তর মাছায়েলে ইম্কানে কিজ্ব

যেহেতু এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বর্তমান যুগের দেওবন্দী ফেরকা আল্লাহ্পাকের শানে আজমতের মধ্যে মিথ্যার দোষ আরোপ করিয়া উহা দৃঢ়তার সহিত মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যে এ বিষয়ে কিছুটা পর্যালোচনা আবশ্যক মনে করি। এ উদ্দেশে বিষয়টির উপর একটি ভূমিকা ও দুইটি পরিচ্ছেদ রচনা করতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকবর্গের উপর সুবিচারের ভার ন্যস্ত করতঃ রাব্বুলএজ্জাতের দরবারে কবুলিয়াতের প্রার্থনা জানাইতেছি।

ভূমিকা ঃ মিথ্যা সমস্ত দোষসমূহ হইতে একটি জঘন্যতম দোষ। ইহার কতিপয় কারণ রহিয়াছে। যথা- (১) মানুষ মিথ্যার সাহায্য ব্যতীত কোনও গুনাহ্

বা অপরাধের কাজ করিতে পারে না। যদি কোন লোক সত্য কথা বলার জন্যে অঙ্গীকার করে যে, সে আর মিথ্যা বলিবে না, তবে আল্লাহ্ চাহেত নিজে নিজেই গোনাহ্ হইতে তওবা করিয়া পবিত্র হইবে। লক্ষ্যণীয় যে, চোর-ডাকাত, শরাবখোর ও জেনাকারী প্রভৃতি এই সমস্ত পাপকার্য তখনই করিতে পারে যখন ঐ সমস্ত লোকেরা পূর্ব হইতেই মিথ্যাচারে অভ্যস্ত থাকে। আর মনে মনে এ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, যখনই ধরা পড়িবে তখন পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বসিবে। যদি ইহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই সত্য বলার অভ্যাস কিংবা অঙ্গীকার থাকিত তবে কখনও এই সমস্ত গোনাহের কাজে সাহস পাইত না। (২) কোনও গোনাহের কাজই কুফুরী নহে; কিন্তু মিথ্যা কুফর ও শিরকের সীমারেখায় পৌছাইয়া দেয়। যেমন– মুশরেকরা বলিয়া থাকে– স্রষ্টা দুইজন। ইহা মিথ্যা ও কুফুরী। ঈছায়ীরা বলে– হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহ্র পুত্র। ইহা জঘন্য মিথ্যা ও কুফুরী। শরাবখোর এ জুয়ারী জুয়া খেলা ও শরাব খাওয়াকে হারাম জানিয়াও উক্ত গোনাহের কর্ম করিয়া থাকে। তাহারা কাফের হয় না। কেননা, এখনও মিথ্যা বলে নাই। কিন্তু যেইমাত্র বলিতে শুরু করিবে যে, জুয়া খেলা ও শরাব খাওয়া হালাল তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে। সুতরাং মানিতে হইবে যে, পাপকাজ যত বড়ই হউক কুফুরী নহে; কিন্তু মিথ্যা অধিকাংশই কুফুরী। শরীয়ত যে কর্মকে কুফুরী সাব্যস্থ করিয়াছে, যেমন– পৈতা বাঁধা, টিকি রাখা, ইত্যাদিও কুফুরী। এইজন্যে যে, এই সমস্ত কাজ মিথ্যা ধর্মের রীতি ও আলামত হওয়ার কারণে। ইহাতেও মিথ্যা কুফুরী এবং মিথ্যাবাদী কাফের প্রমাণিত হইল। (৩) কোরআনে কারীমে অন্যকোনও গোনাহ্র জন্যে গোনাহ্গারকে লা'নত বা অভিসম্পাত দেওয়া হয় নাই। একমাত্র মিথ্যা ব্যতীত। যেমন– ইরশাদ হইয়াছে–

لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাজেবীন। অর্থাৎ, 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। জানা দরকার যে, কোরআনে পাকে যেখানে কাফের ও জালেমের উপর লা'নত হইয়াছে উহাও মিথ্যারই কারণে।। কেননা, কুফুর ও শির্কের মধ্যে সুনিশ্চিতরূপে মিথ্যা রহিয়াছে। আর জালেমের জুলুম দ্বারাও মিথ্যা বুঝায়। অতএব, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, মিথ্যা ব্যতীত কেহ লা'নতের যোগ্য হইতে পারে না। (৪) মিথ্যাবাদী লোক কমিন হইয়া থাকে, আর কমিন লোক কখনো হুকুমতের যোগ্য হয় না। ফলকথা, মিথ্যা সর্ব অবস্থায় যাবতীয় গোনাহ্ বা দোষসমূহ হইতে নিকৃষ্টতর গোনাহ্। স্মরণ রাখা উচিত যে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্পাক মিথ্যা হইতে পবিত্র।

১ম দলিল : যেহেতু মিথ্যা আয়েব বা দোষ এবং যাবতীয় দোষের কাজ হইতে জঘন্য দোষ এবং আল্লাহ্পাক সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র। কাজেই, আল্লাহ্পাক মিথ্যা হইতেও পবিত্র। সুতরাং জানা উচিৎ যে, অন্যান্য দোষের কাজ

যেরূপ আল্লাহ্র জন্যে সম্ভব নহে যেমন চুরি, জিনা ইত্যাদি এবং আল্লাহ্পাকের জন্যে মহাল বিজ্জাত, আল্লাহ্পাকের জাত বা সত্ত্বার জন্য অসম্ভব। তদ্রূপ, মিথ্যাও আল্লাহ্র জন্যে মহাল বিজ্জাত স্বয়ং আল্লাহ্র জন্যে অসম্ভব।

২য় দলিল : যখন কোন কুল্লি বা জিনিসের দুইটি বিষয় থাকে তখন প্রত্যেকটির আদেশ দ্বিতীয় বিষয়ের অনুযায়ী হইয়া থাকে। খবর দুই প্রকার– সত্য অথবা মিথ্যা। যদি আল্লাহ্র খবরের মধ্যে মিথ্যা সুযোগ থাকে তবে আল্লাহ্পাকের সত্য হওয়া ওয়াজিব থাকে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্য হওয়া জরুরী থাকে না। মিথ্যার সম্ভাবনা দ্বারা সত্য হওয়া বিষয়টি গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে।

৩য় দলিল : আল্লাহ্র সমস্ত গুণাবলী ওয়াজিব। যদি মিথ্যাও সম্ভব হয় তখন এই প্রশ্ন হইবে যে, ঐ মিথ্যা ও আল্লাহ্র গুণ হইবে কিনা। যদি মিথ্যা আল্লাহ্র গুণরূপে স্থিরিকৃত হয় তবে উহা আল্লাহ্র জন্যে ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর যদি মিথ্যা বলা আল্লাহ্র গুণ না হয় তবে মিথ্যার সম্ভাবনা কিরূপে থাকে? আর এ সম্ভাবনার অর্থই বা কি?

৪র্থ দলিল : কথা সত্য হওয়া আল্লাহ্র গুণ। যখন আল্লাহ্র জন্যে মিথ্যা বলা সম্ভব হইল, তখন আল্লাহ্র কালাম বা বাণী সত্য হওয়া আর ওয়াজিব বা অপরিহার্য রহিল না। যাঁহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী সম্ভাবনাময়।

৫ম দলিল : মিথ্যা বলার পিছনে তিনটি কারণ নিহিত থাকে। যথা– (১) মূর্খতা, (২) অপারগতা, ও (৩) দুষ্টামি। যেমন– কোন ব্যক্তি যদি ভুল খবর পাইয়া লোকজনের নিকট তাহাই প্রচার করিতে থাকে– ইহা তাহার মূর্খতার কারণেই। অর্থাৎ, এ খবর সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতাই তাহাকে মিথ্যা বলিতে বা মিথ্যা প্রচারে বাধ্য করিয়াছে। অপর এক ব্যক্তি জায়েদ কাহারও সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছে যে, সে এক মাসের মধ্যে করজ পরিশোধ করিবে। কিন্তু, এক মাসের মধ্যে সেই কর্জ পরিশোধের কোন ব্যবস্থাই তাহার হাতে আসিল না। ফলে, তাহার ওয়াদা মিথ্যা হইয়া গেল। এ মিথ্যা তাহার অপারগতার কারণে। তদ্রূপ, আরেক ব্যক্তি মিথ্যা বলায় এক রকম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বিনা কারণেও মিথ্যা বলিতে থাকে এই মিথ্যা তাহার স্বভাবগত দুষ্টামির কারণে। কিন্তু আল্লাহ্পাক জাল্লা শানুহু এই তিন প্রকার দোষ হইতেও পবিত্র। অতএব, মিথ্যা হইতেও আল্লাহ্পাক সুনিশ্চিতভাবে পবিত্র।

৬ষ্ঠ দলিল : কোন জিনিস খোদা তায়ালার সমতুল্য হইতে পারে না। খোদার শান বা মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। নবীগণের জন্যে মিথ্যা বলা 'মম্‌কিন বিজ্জাত এবং 'মহাল বিল গায়ের,। যদি আল্লাহ্র শানে ঐভাবে মিথ্যা আরোপ করা হয় তবে মাআজাল্লাহ্ ঐ গুণের মধ্যে নবীগণ আল্লাহ্র সমতুল্য হইয়া যায়।

৭ম দলিল : যে কথায় মিথ্যা সন্দেহ কিংবা সংমিশ্রণ থাকে শ্রবণকারী

উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। যদি আল্লাহ্র খবরের মধ্যে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে তবে আল্লাহ্র প্রদত্ত কোন খবরই আর বিশ্বাসযোগ্য থাকে না। আর বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান হাছেল হয় না। অতএব, কোন দেওবন্দী 'ইম্কানে কিজ্ব-এর মাছআলা মানিয়া মুমিন হইতে পারে না। কেননা, তাহারা খোদা তায়ালার প্রতি খবরের মধ্যেই মিথ্যার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিবে। পরিণামে ঐ একিন বা বিশ্বাস যাহা ঈমানের জন্য একান্ত জরুরী উহা তাহাদের হাছেল হইবে না।

৮ম দলিল : যেমন অন্যান্য দোষ আল্লাহ্পাকের শানের খেলাফ, তদ্রূপ, মিথ্যা ও আল্লাহ্র শানের খেলাফ। তাফছীরে কবীর এবং তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফ ও অপরাপর এল্মে কালাম সংক্রান্ত কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।

৯ম দলিল : কতিপয় বিষয় যাহা বান্দার জন্যে কামাল বা পরিপূর্ণতার জন্যে অপরিহার্য তাহাই আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে আয়েব বা দূষণীয়। যথা– পানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা এবং এবাদত বন্দেগী প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্পাকের সুমহান শানের জন্যে মহাল বিজ্জাত। সুতরাং মিথ্যা বলা যাহা বান্দার জন্যে প্রথম নম্বরের জঘন্য দোষ ও অপরাধের কাজ তাহাই আবার মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্পাকের শানে আজমতের জন্যে কেমন করিয়া প্রয়োগ করা যায়? ধিক! শতধিক! দেওবন্দী ওহাবীদের মূর্খতা ও অজ্ঞতায়।

১০ম দলিল : দেওবন্দীদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক মান্তেক জাননেওয়ালা আলেম রহিয়াছেন যাহারা এই মাছআলার সমর্থক নহেন। বস্তুত: সমস্ত যুক্তি শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পন্ন উলামাগণ, বিশেষত: মাওলানা আবদুল্লাহ্ টুন্কী এবং আল্লামা শাহ্ ফজলুল হক খায়রাবাদী এহেন মাছআলা ইমকানে কিজব্-এর প্রতিবাদে স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন। এমনকি দেওবন্দীদের গৌরব মান্তেকী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাম্বলী সাহেব ইহাই বলিতেন– আমাদের মুরুব্বীগণ এই মাছ্আলায় শক্ত ভুল করিয়াছেন। যাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই মাছআলা খুবই অনর্থক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রশ্নোত্তরে মাছায়েলে ইমকানে কিজ্ব।

১ম প্রশ্ন : যদি আল্লাহ্র মিথ্যা বলার শক্তি না থাকে তবে আল্লাহ্ অপারগ প্রমাণিত হয়, এবং অপারগতা আল্লাহ্র জাতের খেলাফ।

উত্তর : অপারগতা উহাকেই বলা হয়, যেথায় কর্মের মধ্যে তাছির গ্রহণের যোগ্যতা থাকে; কিন্তু কর্তার মধ্যে তাছিরের শক্তি না থাকে এবং কর্ম নিজেই যদি তাছির গ্রহণে অসমর্থ হয়; তবে এ অন্যায় কর্মের কর্তার নহে যদি কেহ আলোকের মধ্যে নিকটের জিনিস না দেখে তবে সে অন্ধ। কিন্তু যদি অন্ধকারে কিংবা অনেক দূরবর্তী জিনিস দেখিতে না পায় তবে সে ব্যক্তি অন্ধ নহে। কেননা, এমতাবস্থায়, তাহার চোখের অপরাধ নহে, বরং ঐ জিনিস যাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য হইবার যোগ্য নহে। কাজেই যাবতীয় দোষের কাজ এমন যোগ্যতাসম্পন্ন নহে যাহা

কুদ্‌রতের মধ্যে শামিল হইতে পারে। এইজন্যে, ত্রুটি ঐ দোষসমূহের, কুদ্‌রতের নহে। যদি ইহার নাম অপারগ হয় তবে বিরুদ্ধবাদীদের মতেও আল্লাহ্‌পাক বহু দোষের উপর শক্তি রাখে। যেমন– মৃত্যুবরণ ইত্যাদি।

২য় প্রশ্ন : মিথ্যাও একটি জিনিস, আর প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর : আল্লাহ্‌র মিথ্যা কোন জিনিস নহে; কেননা, উহা মহাল সম্পূর্ণ অসম্ভব মানুষের জন্যে মিথ্যা বলা নিশ্চয়ই জিনিস। আল্লাহ্‌পাক মিথ্যা সৃষ্টির জন্যে কাদের বা শক্তিমান। কিন্তু নিজে এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্যে নহে। কেননা, আল্লাহ্‌পাক সমস্ত দোষেরই স্রষ্টা, অথচ আল্লাহ্‌পাক যাবতীয় দোষ হইতেই পবিত্র। দোষকে জন্ম দেওয়া এবং দোষ জানা দোষ দূষণীয় নহে; বরং দোষের কাজ করাই দূষণীয়।

৩য় প্রশ্ন : আল্লাহ্‌র খবর ও খবর এবং খবর উহাকেই বলা হয় যাহার মধ্যে মিথ্যারও সম্ভাবনা থাকে। মিথ্যার সম্ভাবনা না থাকিলে সত্যের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই, আল্লাহ্‌র খবরকে খবর মানার জন্যে মিথ্যাকেও মানা হয়। কিন্তু যেহেতু ইহা আল্লাহ্‌র খবর, এইজন্যে মিথ্যা হইবে না। আর ঐ খবর মিথ্যা হওয়া মমকিন বিজ্জাত মহাল বিল গায়ের।

উত্তর : মতলক্ব খবর 'জিন্‌ছ এবং আল্লাহ্‌র খবর নূ অর্থাৎ প্রকার এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রকারের ইশারা করা ফছলের ন্যায়। ফছলের দ্বারা প্রকারের যে হুকুম জারী করা হয় ঐ সমস্ত জাত হয়। হ্যাঁ, জিন্‌ছের আরেজী যেমন নাতেকের হুকুম মানুষের জন্য জাতি এবং হায়ওয়ানের জন্যে আরেজী যখন আল্লাহ্‌র নিছবত মিথ্যা হওয়া অসম্ভব করিয়াছেন; তবে অসম্ভব হওয়া আল্লাহ্‌র খবরের জন্যে বিজ্জাত এবং মতলক্ব খবরের জন্যে বিল আরজ হইল। আমার এই বর্ণনায় আল্লাহ্‌র ফজলে উভয় প্রশ্নই অবান্তর হইয়া গেল।

৪র্থ প্রশ্ন : আল্লাহ্ সত্য হওয়ার তারিফ তখনই করা যাইবে যখন মিথ্যা বলার শক্তি রাখে কিন্তু বলে না। যদি মিথ্যার উপর শক্তি না রাখে তবে সত্য হওয়ার মধ্যে কামাল বা পূর্ণতা কিরূপে? যেমন দেওয়ালের জন্যে মিথ্যা বলার ক্ষমতা নাই– কেননা ইহার তো বাক-শক্তিই নাই। (এই প্রশ্ন হিন্দুস্থানী ওহাবীদের ইমাম মৌঃ ইছমাঈল দেহলুভীর চিন্তার ফসল)।

উত্তর : মাশআল্লাহ্! কী সুন্দর কায়দা বা কৌশল ওহাবীদের। আল্লাহ্ পাকের ফানা না হইবার তারিফ বা পরিচয়, চুরি না করার পরিচয় সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র হইবার পরিচয় করা হইতেছে যে যাবতীয় দোষ আল্লাহ্‌র জন্য সম্ভব। কেননা সম্ভাবনা ব্যতীত খোদার পরিচয় অসম্ভব। ওহাবী মোল্লাদের বলিব আল্লাহ্‌র পরিচয় এভাবে নহে। তাঁহার পরিচয় বা প্রশংসা এইরূপে করা উচিত যে, বারেগাহে ইলাহীতে যেন কোন প্রকার আয়েব বা ত্রুটি-বিচ্যুতির লেসমাত্রও

পৌছিতে না পারে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দেওয়ালের মিথ্যা বলার ক্ষমতা মহাল বিল গায়ের নহে বরং মহাল বিল্ আদিই। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের সহিত পাথরও কথা বলিয়াছে। আর পরবর্তী সময়েও বলিবে। এক্ষণে, মৌ: ইছমাঈলের এই অপকৌশল, অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার মিথ্যা বলা মহাল বিল্ গায়ের তো বটেই, মহাল বিল আদীও নহে, যে তাহার তারিফ করা যায়।

৫ম প্রশ্ন : এই সমস্ত কথা মানা যায় যে, আল্লাহ্র ওয়াদার বিপরীত হইতে পারে। যেমন– আল্লাহ্পাক ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুসলমানকে যে ব্যক্তি অত্যাচারপূর্বক কাতল করিবে, তাহার শাস্তি জাহান্নাম। কিন্তু সমস্ত মুসলমানের আকীদা এই যে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহাকেও বেহেশতে দাখিল করিতে পারেন। আর ইহাই তো মিথ্যা।

উত্তর : মাআজাল্লাহ্! মিথ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? প্রথমত: আল্লাহ্র সমস্ত ওয়াদা তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন। কোরআনে কারীমে আছে– وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ আয়াতে শির্ক ব্যতীত সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অতএব, গোনাহ্গার তখনই ক্ষমা লাভ করিবে যখন সেই বিষয় প্রকাশ পাইবে। দ্বিতীয়ত: মাফ করিয়া দেওয়া আল্লাহ্র দয়া বা অনুগ্রহ; ইহা মিথ্যা নহে এবং মিথ্যা হইতেছে আয়েব বা দোষ। তৃতীয়ত: এই প্রশ্ন বিরুদ্ধবাদীদের উপরও বর্তায়। কেননা, আল্লাহ্র মিথ্যাকে ইহারাও মহাল বিল গায়ের মানিয়া থাকে এবং ওয়াদার বিপরীত বলিয়া থাকে। যদি ইহা মিথ্যা হইয়া থাকে তবে তাহারাও মানে যে, খোদার মিথ্যা মহাল বিল গায়ের।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন : আল্লাহ্পাক ফরমাইয়াছেন–

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ·

অর্থাৎ, 'হে নবী! ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। আপনার উপস্থিত থাকাকালীন আমি মক্কার কুফ্ফারদের প্রতি আজাব নাযিল করিব না। আল্লাহ্ স্বয়ং অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন–

قُلِ اللّٰهُ قَادِرٌ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ·

অর্থাৎ, হে মক্কার কাফের সকল! আল্লাহ্ এতদূর শক্তিশালী যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক হইতে অথবা নীচের দিক হইতে আজাব নাযিল করিতে সক্ষম। দেখুন, এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের উপর আজাব দিবার ওয়াদা ঘোষণা দিয়াছেন। আবার পরের আয়াতে আজাব দিবার শক্তিরও প্রমাণ দিয়াছেন। যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করিতে সক্ষম। আর ইহাই মিথ্যা বা ইমকানে কিজ্ব্। এই প্রশ্ন দেওবন্দী মাজহাবের সারকথা, যাহা মৌলুভী খলিল আহমদ আম্বটী ও মৌলুভী রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী সব জায়গায়

বয়ান করিয়াছে।

উত্তর : সৃষ্টির মাঝে প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্ব লাভ হওয়া আল্লাহ্- পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্পাক ফরমান– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

আরও ফরমান --- عَلٰى مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ

। মক্কার কাফেরদের উপর আজাব নাযিল হওয়া তাহা একপ্রকার জিনিস যাহা সমম্ভব এবং আল্লাহ্পাক ইহাতে কাদির বা ক্ষমতাবান। কিন্তু যখন সৃষ্টির কোন জিনিস আল্লাহ্র ইচ্ছার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া যায় তখন তাহার খেলাফ হওয়া মহাল বিজ্জাত। ইহার বয়ান প্রথমেই করা হইয়াছে এবং সারকথা, এই মক্কার কাফেরদের উপর আজাব আসা নিজের ইচ্ছা অনুসারে উভয় সম্ভব, কিন্তু আজাব না আসার ব্যাপারে আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়াছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার খেলাফ হওয়া মহাল বিজ্জাত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– জায়েদ দাঁড়াইবার এবং বসিবার উভয়ের উপরই শক্তি রাখে। কিন্তু যখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে তখন দাঁড়ান অবস্থায় বসা মহাল বিজ্জাত অর্থাৎ মোটেই সম্ভব নহে। কেননা, ইহা এজতেমায়ে জিদ্দাইন বা বিপরীত দুই অবস্থার একত্র সমাবেশ। তদ্রূপ আল্লাহ্পাক প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি ও ধ্বংস করার শক্তি রাখেন। কিন্তু যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করিলেন তখন সৃষ্টির অবস্থায় উহাকে ধ্বংস বা বিলোপ সাধন করা মহাল বিজ্জাত। অনুরূপভাবে, হ্যাঁ এবং না একই সঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না। কেননা, হ্যাঁ যখন না হয় তখন হ্যাঁ থাকে না। উভয় নফিজের বা বিপরীত বস্তুর মধ্যে এই অবস্থা যে, তন্মধ্য হইতে উভয়ই সম্ভব কিন্তু একটির বিদ্যমান থাকাকালে অপরটি মহাল বিজ্জাত। আরও একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করুন। কোন যুবতী মেয়েকে যে কোন মুসলমান বিবাহ্ করিতে পারে। অর্থাৎ বদলিয়াতের ত্বরিকায় যে কোন মুসলমানের সহিত ঐ মেয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যখন কোন একজনের বিবাহ্ হইয়া যায় তখন এই অবস্থায় অপর কাহারও সহিত বিবাহ্ শরীয়ত অনুযায়ী মহাল বিজ্জাত বা মোটেও সম্ভব নহে। পুনরায়, একটি উদাহরণ দিতেছি জায়েদ জন্মগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক মানুষ বদলিয়াতের সূত্রে পিতা হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে বকরের ঔরষে অর্থাৎ তাহার নুতফায় জন্মলাভ করিল তখন বকর তাহার পিতা হইয়াছে তবে এমতাবস্থায় অন্য কেহ তাহার পিতা হওয়া মহাল বিজ্জাত। কাজেই আল্লাহ্পাক অন্য কাহাকেও জায়েদের পিতা বানাইবার জন্যে কাদের বা শক্তিমান নহেন। মিথ্যা তখন হইত যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর আজাবের কাদির হইত। জনাব, তাআদ্দাদ এবং ইমকান ভিন্ন জিনিস এবং ইমকান ও তাআদ্দাদ ভিন্ন জিনিস। অতএব, ঐ আজাবের মধ্যে ইমকান তাআদ্দাদ রহিয়াছে। তাআদ্দাদের ইমকান নহে। কোরআনে পাক বুঝিবার জন্যে আক্বল ও এল্ম্ এবং দ্বীনের প্রয়োজন। কিন্তু

দেওবন্দীদের নিকট এই তিনটি জিনিসই গুরুত্বহীন। দেওবন্দীদের চূড়ান্ত প্রশ্ন যাহা ছিল আল্লাহ্‌র ফজলে তাহা টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এখনও পর্যন্ত দেওবন্দী ফেরকার অনুসারীরা ইমকানে কিজ্‌বের অর্থই বুঝিতে পারে নাই। কে বলে যে, আলমের মধ্যে কতক জিনিস মমকিন বা সম্ভব আর কতক জিনিস নামমকিন বা অসম্ভব? নাকি জাইনে জিদ্দাইন প্রত্যেকটি মমকিন বা সম্ভব। কিন্তু ইহাদের একত্র সমাবেশ হওয়া মহাল বিজ্জাত। তদ্রূপ, আল্লাহ্‌র খবরের মধ্যে খেলাফ বা অন্যথা হওয়া মহাল বিজ্জাত। ইহারই নাম ইমকানে কিজব। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

এর মধ্যে আলমের জাহেরী আজাব বুঝায়। যেমন– ছুরত পরিবর্তন কিংবা এবং পাথর বর্ষণ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় আয়াত– قُلْ اللّٰهُ قَادِرٌ

এর মধ্যে বাতেনী আজাব বুঝায়; অর্থাৎ, যুদ্ধে পরাজয়, দুর্ভিক্ষ, মারাত্মক ব্যাধি ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা জাহেরী আজাব খাছ। যেমন– হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে– কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কতক কওম বা জাতির ছুরত (আকার) পরিবর্তন হইয়া যাইবে। জমীন নীচের দিকে ডাবিয়া যাইবে। হুজুরে পাক ছরকারে দো-আলমের দুনিয়ায় আগমনের খাতিরে সাধারণভাবে আজাব আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য আজাব আসা বন্ধ হয় নাই।

আয়াত– مَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ

এর দ্বারা মক্কার কাফেরদের দোয়া বর্ণিত হইয়াছে– فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ জায়গায় এই আজাব বঝায়। জানিয়া রাখুন, কিজ্‌ব্ এবং ছিদ্‌ক্ খবরের ছিফাত যে মুখবের আনহুর। সুতরাং ইহা মহাল বিজ্জাত যে আল্লাহ্‌পাক ঐ ঘটনার খেলাফ খবর দিবেন ইহাই এমতেনায়ে কিজ্‌ব এর অর্থ যাহাকে বেহেশতী হইবার খবর দিয়াছেন যদিও সে দোজখে যাইতে পারে। তবে এ খবর মহাল বিজ্জাত হইত।

৭ম প্রশ্ন : সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, مقدور العبد مقدور الله

অর্থাৎ, যে কাজের উপর আল্লাহ্‌পাক শক্তি রাখেন, বান্দাও সেই কাজের উপর শক্তি রাখে, অর্থাৎ, মানুষ যাহা করিতে পারে আল্লাহ্‌ও তাহা করিতে পারে। তবে মিথ্যা বলার শক্তি আল্লাহ্‌র আছে এবং বান্দারও আছে।

উত্তর : এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা যে কাজ করিবার শক্তি রাখে, ঐ কাজই আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করিবার জন্যে শক্তি রাখেন। কেননা, ইহা সম্ভব হইবে এবং আল্লাহ্‌পাক ঐ কাজ করিবার জন্যে কাদের হন নাই। যদি ইহাই হইত তবে জিনা, চুরি প্রভৃতিরও সম্ভাবনা প্রকাশ পাইত। তাহা হইলে, আল্লাহ্‌পাক এইসব দোষ করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস রাখা যায়?

৮ম প্রশ্ন : আল্লাহ্‌পাক হাজারো মুহাম্মদ বানাইবার শক্তি রাখেন। আহ্‌লে

ছুন্নত বলে যে, এখন নূতন নবী আসা মহাল বিজ্জাত ইহা ভুল তদ্রূপ, আহলে ছুন্নত আরও বলে হুজুরের মিছাল বা মত হওয়া অসম্ভব– ইহাও ভুল। যিনি এক মুহাম্মদ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি লাখো মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সৃষ্টি করিতে পারেন না ? মৌ: ইছমাইল দেহলুভী রচিত তাকাভিয়াতুল ঈমান দ্রষ্টব্য)।

উত্তর : দেওবন্দী ফৌজ থামে কোথায় আর গঙ্গার ঢেউ জমে কোথায়? এই মাছআলা ইমকানে নজীরের। ইহাও ইমকানে কিজবেরই একটি শাখা মাত্র। ইহাতে দুইটি কথা রহিয়াছে– (এক) হুজুর পোরণূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার পরে নূতন কোন নবী আসার সম্ভাবনা এবং হুজুরে পাকের সমতূল্য হইতে পারা। প্রথমোক্ত মাছআলার তাহ্কিকাত বা বিশুদ্ধতার পর্যালোচনা পূর্বে ২য় প্রশ্নের উত্তরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক এই বিষয়ে কাদের বা ক্ষমতাবান ছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে লাখো ব্যক্তির মাঝে এক জনকে শেষনবী বানাইতে পারিতেন। কিন্তু যখন হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে শেষনবী বানাইয়াছেন তখন আর কাহারো শেষ নবী হওয়া মহাল বিজ্জাত বা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাহার খুবই সুন্দর উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রত্যেক মানুষ এক বাদীর স্বামী এবং জায়েদের পিতা হইতে পারে। কিন্তু যখন একজন নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছেন তখন দ্বিতীয় আরেকজন হওয়া মহাল বা অসম্ভব। যখন জায়েদের জন্যে দ্বিতীয় বাপ হইতে পারে না তখন আবার দ্বিতীয় শেষনবী কিরূপে হইতে পারে? দ্বিতীয় মাছআলার বিস্তারিত জানার জন্যে 'ইমতিনাউন্নাজীর যাহার মুছান্নিফ আল্লামা শাহ্ ফজলুল হক খায়রাবাদী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে তাহা পাঠ করুন। আমি এই স্থানে সামান্য বয়ান করিতেছি। উপরিবর্ণিত বিষয়ের আলোকে প্রমাণিত হইতেছে যে, দুইটি বিপরীত জিনিস একত্র হওয়া মোটেও সম্ভব নহে। হুজুর ছাল্লালাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নজীর মানায় দুইটি বিষয় একসঙ্গে মানা জরুরী হইয়া পড়ে। যেমন– হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আখেরী নবী, তাঁহার দ্বীন আখেরী এবং তাঁহার কিতাব আখেরী কিতাব। এক্ষণে, যদি কোন ব্যক্তিকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সমকক্ষ মানা যায় এবং উভয়ে এই সমস্ত আখেরী হন তখন হুজুরে পাক আর আখেরী থাকেন না। আবার হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আখেরী হইলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আখেরী থাকে না। অনুরূপভাবে, হুজুরে পাক সর্বপ্রথম শাফাআত করিবেন, সর্বপ্রথম আল্লাহর সহিত কালাম করিবেন এবং সর্বপ্রথম পুলছিরাত পার হইবেন, সর্বপ্রথম বেহেশতে কদম মোবারক রাখিবেন। আবার সর্বপ্রথম তাঁহার রওজায়ে আনোয়ার উন্মুক্ত করা হইবে। সর্বপ্রথম তাঁহারই নূর জন্মলাভ করিয়াছে মিছাকের দিন সর্বপ্রথম তিনিই 'বালা বা হাঁ বলিয়াছিলেন। মোটকথা এতসব বিষয়ে হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সমস্ত সৃষ্টিকুলের আওয়্যাল বা সর্বপ্রথম যে কেহ যদি হুজুরের সমতুল্য হয় ইহাতে প্রথম পদটি একত্রীকরণ সম্ভবপর হইবে কি? যদি হয় তবে উহা কোন যুক্তির বলে? এবং হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে সৃষ্টির আওয়্যাল বা সর্বপ্রথম মানা যাইবে কি? অন্যথায়, দুইটি নাকিজাইন বা বিপরীত জিনিস একত্রীভূত হইয়া যাইবে। আর যদি তাহা না হয় তবে হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু

ওয়াচ্ছালামের নজীর কিংবা মিছাল বা সমকক্ষ কিরূপে সম্ভব?

তৃতীয়ত: হুজুর ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সমস্ত আদম সন্তানের সরদার। সমস্ত মানুষ কিয়ামতের দিন তাঁহারই ঝাণ্ডার ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সমস্ত মানুষের তিনি একমাত্র ভাষ্যকার হইবেন। সমস্ত রোদনকারীকে তিনি হাসাইবেন এবং সমস্ত দুঃখীকে তিনিই সান্ত্বনা দিবেন। সমস্ত ব্যাথিতের ব্যথা তিনিই দূর করিবেন। ঐদিন যে সমস্ত লোক হয়রান-পেরেশন হইয়া ছুটাছুটি করিবে তাহাদিগকে তিনি সান্ত্বনা দিবেন। সমস্ত চক্ষু হুজুর ছারোয়ারে কায়েনাতের নূরানী মুখপানে চাহিয়া থাকিবে। সমস্ত হাত হুজুরে পাকে দামান মুবারকের দিকে বাড়াইয়া দিবে। ঐদিন সমস্ত মানুষের সমাবেশে হুজুর পোরনূর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম 'মাক্বামে মাহ্ মুদ'দান করা হইবে। সমস্ত মানুষের মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বেহেস্তের 'ওছিলা নামক উচ্চস্থানে উন্নীত করা হইবে। সমস্ত মানুষের জন্যে হুজুরে পাক আল্লাহ্‌র নবী। কোরআনে আছে– رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

এক্ষণে, যদি কেহ তাঁহার মতন হয় তবে বলুন ঐ ব্যক্তির মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী থাকিবে কি? নিঃসন্দেহে ইহার উত্তর হইবে মোটেও নহে। যদি হয় তবে তাহা হইবে এজতেমায়ে নাকিজাইন। আর যদি না হয় তবে আবার তাঁহার মত বলার কি অর্থ? অতএব, হককথা এই আল্লাহ্‌পাক স্রষ্টা হিসাবে 'ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু' অর্থাৎ, একক এবং হুজুর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম স্বীয় গুণাবলীর মধ্যে ওয়াহদাহু লা-শারিক। যেমন দুই খোদা হওয়া মহাল বা অসম্ভব তেমনি দুই মোস্তফা হওয়াও মহাল বা অসম্ভব।

৯ম প্রশ্ন : আল্লাহ্‌পাক এ শক্তি রাখেন যে, এই আলমের মতে দ্বিতীয় আলম বানাইতে পারেন। এবং ঐ দ্বিতীয় আলমের এই আলমের মত সমস্ত জিনিস হওয়া দরকার তাহা না হইলে এই আলমের মত না। সুতরাং এই আলমে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার মত হাস্তিরও প্রয়োজন হইবে; তাহা না হইলে এই আলমের মত হইবে না।

উত্তর : ইহার দুইটি উত্তর (এক). আল্লাহ্‌পাক এই আলমের মত দ্বিতীয় আলম বানাইবার শক্তি রাখেন বটে এবং আলম আল্লাহ্ ব্যতীত প্রত্যেক সম্ভাব্য জিনিসকেই বলা হয়। যেহেতু, হুজুর পোরণুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার নজীর বা তুলনা সম্ভাব্য নহে; এইহেতু, উহা আলম হইতে খারেজ বা পৃথক। (দুই). আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত কিছুকেই আলম বলা হয়। যখন আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত কিছুই আলমের মধ্যে শামিল হইয়াছে তখন দ্বিতীয় আলম প্রমাণিত অসম্ভব। অতঃপর এই ফরজী আলমে যে জিনিস মানা যাইবে ঐ জিনিস প্রথমোক্ত ফরজী আলমের অংশ হইবে।